সমাজ সমীক্ষা :
অপরাধ ও অনাচার

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পরিবেষক :

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামাপদ ঘোষ
লাইব্রেরি রোড, মেদিনীপুর

দ্বিতীয় মুদ্রণ
দাম সাত টাকা

মুদ্রাকর :
ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

সমাজের যে অংশটুকুতে আমাদের জন্ম, জীবনের বেশীর ভাগ সময় আমাদের চলা-ফেরা যে গণ্ডীটুকুর মধ্যে, তার বাইরে আমাদের অনেকরই দৃষ্টি খুব ঝাপ্সা। আমাদের জানা-শোনার বাইরের এই দুনিয়া থেকে হঠাৎ কোন দুর্বিপাক এসে আমাদের দুয়ারে যখন ঘা দেয়, কিংবা অসতর্ক ভাবে চলতে চলতে যখন আমরা এই অন্ধকারের মুল্লুকে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ি, তখন অনিবার্য ভাবেই আমরা হই বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত। অনেক সৎ ও সুন্দর জীবন এই ভাবে নিছক অজ্ঞানতার বিপাকেই খোয়া যায়। সংসারের সুখ-শান্তি যায় রসাতলে।

এই জন্যেই সমাজের সত্যিকার চেহারাটা চেনা দরকার আমাদের। সমাজ-জীবনের যে স্তরটিকে আমরা বলি মধ্যবিত্ত, তার ওপর তলায় আছেন যে বিত্ত ও ক্ষমতার অধিপতি মানুষরা, আর নীচুতলায় আছেন যে বঞ্চিত অবহেলিত মানুষরা, তাঁদের দু-পক্ষেরই গতি-বিধি আমাদের জানা থাকা চাই। কারণ মাঝের এই স্তরটার মাথায় ওপর-নীচু দু-তলা থেকেই প্রতিনিয়ত চাপ আসছে। এক তরফে বিপুল অর্থ ও সামর্থ্য-প্রমত্ততায় অন্যায়-অনাচার প্রশ্রয় পেয়ে দুর্নিবার হয়ে উঠছে। অন্য তরফে রিক্ততা ও তিক্ততা ডেকে আনছে ঘৃণা, আক্রোশ এবং তা-ও পাপকে করছে আত্ম-প্রকাশের বাহন। সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উভয়ের দ্বারাই।

ফলে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ, অন্যায়, অনাচার এসে জমা হচ্ছে। দৃশ্য-অদৃশ্য হাজার হাজার হাতে তা মানুষের গলা টিপে ধরছে। সেই অলক্ষিত দুনিয়ার প্রকৃত চেহারাটা কি ও কেমন, তা আমি এই বইয়ে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছি। বেশীর ভাগ তথ্যই আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান-লব্ধ। পুলিশ রিপোর্ট, আইন-আদালতের রিপোর্ট এবং চিকিৎসকের বিবরণী থেকেও কিছু-কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। অনেক কিছুই এখনো অজানা ও অবোঝা রয়ে গেল, সেই জন্যেই রয়ে গেল অনালোচিত। আসলে অধিকতর সময় ও সুযোগের অধিকারী কোন গবেষকের অপেক্ষাতেই রয়েছে এই অনাবিষ্কৃত বৃহৎ মহাদেশটি। আমি শুধু দিলাম তার পূর্বাভাস।

সমাজ-বিজ্ঞানের এই বিভাগটি নিয়ে যখন আমি প্রথম আলোচনা সুরু করি অনেক বছর আগে অধুনালুপ্ত নতুন জীবন পত্রিকায়, তখন বহুজন স্বতপ্রণোদিত হয়ে আমাকে অনেক তথ্য, উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। বহুজন আবার সমাজের অনুদ্ঘাটিত অন্তর্লোক দেখে বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে ধিক্কারও দিয়েছিলেন। অবশ্য সমর্থক সংখ্যাই ছিল অধিক এবং তাঁদের কাছ থেকে অনুরোধ এসেছিল নিবন্ধগুলি বই-আকারে গ্রথিত করার। বই একটি প্রকাশিতও হয়। কয়েকটি সংস্করণ পার হওয়ার পর আমিই তার প্রকাশ বন্ধ রাখি, আগাগোড়া বিষয়টি আবার নতুন করে পর্যালোচনা করব বলে। সেই কাজ এত দিনে সম্ভব হল, এজন্যে যাঁদের কাছে আমি ঋণী, তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও মনোজ বসুর নাম এখানে উল্লেখ করা রইল।

যে সমাজে আমাদের বাস, তার বাস্তব সংস্থিতিটা কেমন, কেমন তার ভেতরের চেহারাটা, সে বিষয়ে সকলকে সজাগ করাই আমার এই বই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য। আমার লক্ষ্য তাই দেশের শাসক, নায়ক, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইন ব্যবসায়ী ও দায়িত্বশীল গৃহস্থ নর-নারীর দিকে। যে-কোন ব্যক্তি নির্বিচারে এ বই পড়বেন, তা আদৌ আমার অভিপ্রায় নয়। বিষয় ভেদে অধিকারভেদ ঘটে, এই আমার ধারণা।

যুগান্তর সম্পাদকীয় দপ্তর
মহালয়া, ১৩৬৮

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সূচী

গোড়ার কথা

আদিম অবস্থায় মানুষের বুদ্ধি ছিল সীমাবদ্ধ। বিশ্ব-ব্যাপারের সমস্ত রহস্যই ছিল তার কাছে অনাবিষ্কৃত। খাদ্য সংগ্রহ, বাসস্থান সন্ধান, বংশ-বৃদ্ধি ও বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে যুদ্ধ, এই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য এবং এ দিক থেকে পশুর সঙ্গে তার বিশেষ কোন তফাৎ ছিল না। ধীরে ধীরে তার ভেতর বুদ্ধির বিস্তার ও জ্ঞানের বিকাশ হল। বাইরে থেকে যেখানেই সে পেল সজোর ধাক্কা, সেখানেই মনন শক্তি প্রয়োগ করে সে আত্ম-রক্ষার পথ খুঁজতে লাগল। এই ভাবেই এল ঘর-বাড়ী তৈরী, দুর্গ-পরিখা নির্মাণ, ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির নিত্য নূতন আবিষ্কার। ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠল সমাজ। বিবাহ এল, আচার অনুষ্ঠান এল, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, অনেক কিছু এসে, আদিম মানুষের সরল জীবন যাত্রাকে জটিল করে তুলল। এ দিক থেকে সভ্যতার স্পষ্ট যে অর্থটি আমরা বুঝি, তা হল ধাপে ধাপে আদিম বর্বরতার অবস্থা ছাড়িয়ে ওঠা। অর্থাৎ সভ্যতা জিনিষটা একটা চলমান ক্রমোন্নতির স্রোতের মতো। আদি যুগ থেকে মধ্য যুগে, তা থেকে আধুনিক যুগে মানুষের ইতিহাস এই স্রোত-বেগেই ক্রম-বিকশিত হয়ে চলেছে। এক যুগের অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা করেছে অপর যুগকে পথ-নির্দেশ, সে-যুগের প্রয়াস-প্রচেষ্টার বর্গফল আবার দিয়েছে তার পরবর্তী যুগকে প্রেরণা।

যে সোপান-পরম্পরার সাহায্যে এই ভাবে মানুষ আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতার অবস্থায় উন্নীত হয়েছে, তার প্রত্যেকটাই হল সভ্যতার এক-একটি স্তর। এই স্তরগুলো মানুষ অতিক্রম করেছে, তার অন্তর্নিহিত মনন শক্তির প্রভাবে। বাইরে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ও বিপদের আশঙ্কাই দিয়েছে তার আভ্যন্তরীণ বৃত্তিগুলিকে মুহুর্মুহু বিকশিত হয়ে ওঠার তাগিদ। দৈবাগত ফল-মূল ও জীব-জন্তুর ওপর খাদ্যের জন্যে এবং যদৃচ্ছালব্ধ গুহা-গহ্বরে, অরণ্য ও পর্বত-প্রান্তরের ওপর বসবাসের জন্যে নির্ভর করার অনিশ্চয়তাই আদিম মানুষকে দিয়েছিল বিধি-বদ্ধ প্রণালীতে শস্য উৎপাদন, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদির প্রেরণা। এই ভাবেই এসেছে অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ, দুর্গ-গঠন, আরো বিবিধ উপায়ে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার শিক্ষা। এসেছে ব্যাধি থেকে

মুক্তি লাভের জন্যে ঔষধ, শীতাতপ নিবারণের জন্যে পরিচ্ছদ, জলপথ অতিক্রম করার জন্যে নৌকা, ভার বহন ও দূরবর্তী স্থানে গমনাগমনের জন্যে শকট, কৃষি-কাজের জন্যে, আরোহণ ও খাদ্যাহরণের জন্যে পশু-পালন, অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণেব জন্যে ধাতুর ব্যবহার। অন্ধকার বিতাড়ন, শীত নিবারণ, রন্ধন ইত্যাদির জন্যে আগুনের এবং স্নান, পান ও শস্যোৎপাদনের জন্যে জলের ব্যবহার। অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনের যে-সমস্ত উপায় ও উপকরণ আজ আমরা অনায়াসে আয়ত্ত করে নিয়েছি, দিনের পর দিন করে চলেছে যে-সবের উন্নতি বিধান, একদিন মানুষকে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে অন্ধের মতো মাথা ঠোকাঠুকি করেই তার প্রত্যেকটি বের করতে হয়েছে।

এ হল মানব সভ্যতার ব্যবহারিক দিক। এ দিকটার বিকাশ, বিস্তার ও উৎকর্ষ হয়েছে প্রতিকূল বহিঃসংস্থানের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে মানুষের মানসিক শক্তি চরম ভাবে মন্থন করার চেষ্টা থেকে। কিন্তু এই খানেই যদি মানুষের শক্তির শেষ হত এবং একক ভাবে নিজেকে ও সমগ্র ভাবে গোষ্ঠীকে নিরাপদ স্বাচ্ছন্দ্যে এবং ক্রমবর্ধমান শান্তিতে রাখাই যদি হত মানুষের একমাত্র ইতিহাস, তাহলে সভ্যতার সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করার কিছু থাকত না। সৌভাগ্য বশত মানুষের মননশীলতায় উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিকশিত হয়েছে অলঙ্করণীশক্তি, যা দিয়েছে তার সমস্ত সৃষ্টিকে শ্রী ও সুষমা। তার অতিরিক্ত আর একটা জিনিষও দিয়েছে, সে হল প্রাত্যহিক প্রয়োজনের গণ্ডী ছাপিয়ে জীবনকে বড় করে দেখার প্রেরণা। যেমন-তেমন একটা ঘর হলেই মানুষের থাকা এবং যা-তা একটা আহার্য হলেই মানুষের খাওয়া চলত। এমনি চলত সব বিষয়েই। কিন্তু মানুষ তা পর্যাপ্ত মনে করেনি। তাই সে ঘর-বাড়ী, যান-বাহন, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয়, সব কিছুকেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য দিয়ে সুন্দর করে গড়েছে। এই যে বাহুল্যটুকু দিয়ে অপরিহার্যের সীমাকে প্রসারিত করে নেওয়া, এখানেই হল সভ্যতার শোভা।

কিন্তু এ-ই সব নয়। প্রাত্যহিক জীবনকে বস্তু-সীমার বাইরে নিয়ে গিয়ে দেখবার প্রেরণাও দিয়েছিল এই অলঙ্করণী বুদ্ধিই। তাই মানুষ আকাশ-জল ও অরণ্য-পর্বতের পটভূমিতে নিবদ্ধ প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য দেখে, পাখীর গান, বাতাসের মর্মর ধ্বনি, জলের কলস্বর শুনে এবং একে অন্যের সঙ্গে প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে ভাষা-বিনিময় করেই সন্তুষ্ট থাকে নি। এই সমস্ত

শোভাকে সে অঙ্কনের মধ্যে দিয়ে, এই সমস্ত ধ্বনিকে সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে এবং এই সমস্ত ভাষাকে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে নূতন করে সৃষ্টি করেছে, যা থেকে এসেছে তার শিল্প ও সাহিত্য। বিশ্ব-ব্যাপারের বিবিধ বৈচিত্র্য, বিভিন্ন অবস্থান্তর, দিন-রাত্রির আনাগোনা, ঋতু-বিবর্তন, ফল-ফুলের আবির্ভাব-অন্তর্ধান, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, এ-সবও তাকে ভাবিয়েছে। এই আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ঘটনার মালা গ্রথিত করে, তার পেছনে সে এক ক্রিয়াশীল, মননশীল সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করেছে এবং তাকে কেন্দ্র করে আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কর্মের সুদীর্ঘ বিধি-বিধান সৃষ্টি করেছে। নিজের জন্ম, জাত-কর্ম, বিবাহ, বংশ-বৃদ্ধি থেকে সুরু করে ক্ষয়, অপচয়, মৃত্যু পর্যন্ত, সব কিছুকেই সে এক পরম বিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছে। এই ভাবেই এসেছে তার ধর্ম। খাওয়া-পরা, বাঁচা, বংশ-বৃদ্ধি করা এবং ব্যাধি-বিঘ্ন, উৎপাত-অপঘাতের হাত থেকে নিজেকে ও গোষ্ঠীকে নিরাপদ করার প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে সমাজ, রাষ্ট্র, আর নিজের অনুভূতি, চিন্তা ও কামনা-কল্পনাকে বিকশিত করার প্রয়াস গড়ে তুলেছে শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম। মানুষ যতটা অংশে জন্তু, তার জন্যে প্রথম এবং যে-অংশে সে জন্তুর অতীত, তার জন্যে দ্বিতীয় পর্যায়। এ দুইয়ের সমন্বয়েই তার সভ্যতা। একটা হল তার স্থূল রূপ, অন্যটা দিব্য রূপ।

দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পও সাহিত্য সমৃদ্ধ, রাজনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সমন্বিত আজকের যে জটিল অবস্থাকে আমরা সভ্যতা বলি, তা এই ভাবে দিনে-দিনে তিলে-তিলে বিকশিত, বিস্তারিত ও পল্লবিত হয়েছে। ইতিহাসের আদি থেকে বয়ে এসেছে এর ধারা এবং আজ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে এ বয়ে চলেছে। কোন জায়গায় থেমে দাঁড়ায় নি। তার কারণ ধাপে ধাপে মানুষ যতই এগিয়ে এসেছে, যতই প্রত্যক্ষ ও ভাব-জীবনের ওপর তার অধিকারের প্রসার হয়েছে, ততই সে পেয়েছে নূতনতর, বিচিত্রতর পথের সন্ধান। এই সন্ধান ও সংস্কার করতে করতেই আদি কালের সরল সভত্যা কালক্রমে জটিল হয়ে উঠেছে। তাতে এসেছে বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, বহু উপায়ন-উপকরণ, মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক বিধেয় রূপে যা আজ লক্ষ লক্ষ হাতে মানুষকে জড়িয়ে ধরেছে। এই জটিলতা ও সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যারা যতখানি এগোতে পেরেছে, তারা ততখানি সভ্য, তারাই ততখানি অগ্রবর্তী। কিন্তু সভ্যতার এই যেমন একটা দিক, তেমনি

আছে আর একটা দিকও, যেখানে মানুষ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছেও অনেক।

তা হল সভ্যতাজনিত অবদমনের ফল। আদিম মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলো ছিল সবলতর, তার চরিতার্থতার পথ এবং পদ্ধতিও ছিল প্রশস্ততর। যৌন ব্যাপারে ধর্ম, সমাজ, ও রাষ্ট্রের কাছে তার কোন জবাব-দিহি ছিল না। বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে তাকে কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিধি-ব্যবস্থার মুখ চাইতে হত না। যথেচ্ছ স্বাধীনতার অপরিমিত ব্যবহারে জীবন তার ছিল ষোল-আনা স্বপ্রতিষ্ঠ। সভ্যতার যতই প্রসার হয়েছে, ততই তার স্বাধীন প্রবৃত্তির মুখে পড়েছে বিবিধ বিধি নিষেধের লাগাম। শক্ত হতে হতে ক্রমেই তা আজ অনতিক্রমণীয় হয়ে উঠেছে। সভ্য মানুষের বহির্জীবনে তাই স্বাধীনতার সীমা এসেছে অতিশয় ছোট হয়ে। বাইরের এই ক্ষতিপূরণ করার তাগিদেই সভ্য মানুষের জীবন-ধারা তাই হয়েছে অত্যধিক অন্তর্মুখী এবং তার ফলও না ফলে যায় নি।

আদিম মানুষ তার প্রতিপক্ষকে যখন হাতে পেয়েছে, ছিঁড়ে কামড়ে তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে, নয় নিজে ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে। ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে করেছে হরণ, ধর্ষণ, হত্যা। সভ্য মানুষ তার বদলে শত্রুকে শিক্ষা দিতে নেয় আদালতের আশ্রয়। ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে করে আইন-সম্মত উপায়ে পাণিগ্রহণ। বলা বাহুল্য, বাইরে থেকে এতে বেশ একটু সুষমাই দেখা যায়। পশুর মতো প্রত্যক্ষ উপায়ের সাহায্য না নিয়ে, শালীনতার আবরণে মানুষ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করে এবং সেই ভাবে সমষ্টি-জীবনের শ্রী ও শৃঙ্খলা বাঁচিয়ে চলে। কিন্তু সত্যি সত্যি যে মানুষ তার আদিম পশুত্ব ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি, শুধু বাইরে তার ওপর একটা শিষ্টতার পর্দা টেনে দিয়ে ভেতরে-ভেতরে তাকেই সযত্নে লালন করে চলেছে, এটা বোঝা যায় একটু ভেবে দেখলেই। আজ সে দেশপ্রেমের নামে, কোন-না-কোন মতবাদের দোহাইয়ে, সে-ই হত্যা ও হানাহানিই করে। সমাজ-বহির্ভূত পতিতাদের সংসর্গে বা গুপ্ত নাইট-ক্লাবে সে-ই যথেচ্ছাচারই চালায়। শুধু সর্ব-সাধারণের দৃষ্টিতে সেটা ঢাকা দিয়ে রাখতে চায়, এই জন্যে যে সভ্যতার প্রভাবে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়-সেবা ও খুনোখুনিকে আমরা ঘৃণা করতে শিখেছি।

এই ভাবে চাপা দিয়ে চলবার বুদ্ধি ও তার অনুকূল উপাদান-উপকরণ

আবিষ্কারও তাই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। প্রকৃতির রহস্য-ভাণ্ডার তোলপাড় করে একদিকে মানুষ যেমন জলে, স্থলে, মহাশূন্যে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে, স্বাভাবিক ভাবে যেখানে ছিল তার যে বাধা, কৃত্রিম উপায়ে সেখানেই সে করেছে তার ক্ষতি পূরণ, অন্যদিকে তেমনি তার প্রচ্ছন্ন জান্তবতাকে বুদ্ধির পালিস লাগিয়ে মানানসই করে নেবার জন্যেও, করেছে লক্ষ লক্ষ উপায় উদ্ভাবন। ব্যভিচার করা এবং জন্ম-নিরোধকের সাহায্যে তার পরিণতি এড়ানোই হক, আর সরাসরি অস্ত্রাঘাত না করে শরীরে, রোগ-বীজাণু চালান করে শত্রু নিপাত করা এবং সেই ভাবে নিজেকে হত্যাপরাধ থেকে বাঁচানোই হক, সর্বত্র চলেছে তার অন্তর্নিহিত পশুত্বের ক্রিয়া। শুধু বিশেষত্ব এই টুকু যে ওপর থেকে কিছু ধারার উপায় নেই।

আদিম অবস্থায় মানুষের আচরণ ছিল নগ্নতর নৃশংসতর। কিন্তু তাকে আবৃত করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাকে দোষ বলে বোঝারই সামর্থ্য ছিল না তার। সভ্যতার প্রভাবে এগুলিকে আধুনিক মানুষ জানে দোষ বলে, তবু এ-সবের অনুষ্ঠান করে প্রবৃত্তি বশে। তাই প্রতি মুহূর্তে সে আপন পদ-চিহ্ন মুছে চলতে চায়। এই যে ভেতরের তাগিদ ও বাইরের প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে বিরাম-বিহীন সংঘাত, এর ভেতর দিয়ে সভ্য মানুষের জীবন চলে বলেই,সে জীবনে অবদমনের এত উৎপাত। ইচ্ছা মাত্রেই শত্রু-নিধন, উদ্রেক মাত্রেই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, আবশ্যক মাত্রেই শারীর ধর্ম পালন আমরা করতে পারি না। আইন-আদালত আছে, জন-সাধারণ আছে, পরলোক আছে। পদে পদে বাধা, পদে পদে বিধি-অদৃশ্য হাতে আমাদের গলা আঁকড়ে ধরেছে। অথচ এই সব জৈব-প্রবণতা আমরা জয়ও করতে পারি না। তাই লোকালয়ের বিবিধ-বিধানকে ফাঁকি দেবার প্রয়োজনে আমাদের বের করতে হয়েছে রকমারি কল-কৌশল। অবশ্য অনেক ব্যাপারে দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে আমাদের প্রবৃত্তি গুলোও এমন পোষ মেনে গেছে যে অর্থ না বুঝে, সার্থকতা না বিচার করেও, আমরা তাদের দাসত্ব করি এবং টেরও পাই না, জিনিষটা দাসত্ব।

অর্থাৎ মানব সভ্যতার একটা দিকে হল আহরণ, আর একটা দিকে অবদমন। এ দুইয়ের মধ্যে সমীকরণ বা সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে চলতেই, সভ্য মানুষের জীবন প্রকৃতির এলাকা থেকে আজ বহু দূরে এসে পড়েছে, এত দূরে যে প্রকৃতির সঙ্গে আজ আমাদের কোন যোগ নেই বললেই চলে।

প্রকৃতির আলো-বাতাস আজ আমরা পাই কৃত্রিম যন্ত্রের ভেতর দিয়ে। কৃত্রিম উপায়ে করি খাদ্য-পানীয় প্রস্তুত। পোষাক-পরিচ্ছদ ও গাড়ী-ঘোড়ার প্রভাবে খোলা হাওয়া, উন্মুক্ত আকাশ, অবারিত মৃত্তিকার সঙ্গে সংস্রবই গেছে আমাদের ছিন্ন হয়ে। প্রকৃতির যে-সমস্ত শক্তি জৈব স্বাস্থ্যের অনুকুল, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাই আমরা দৈহিক স্বাস্থ্য হারাচ্ছি এবং কৃত্রিম ওষুধ দিয়ে করছি তার ক্ষতি পূরণ। এই কৃত্রিমতার প্রভাব দেহের মতো আমাদের মনেও প্রভুত্ব বিস্তার করেছে অনিবার্য ভাবেই। ক্রমাগত দমিত করে চলার ফলে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি গুলো ভেতরে-ভেতরে অবিরাম তরঙ্গিত হতে হতে অনেক ক্ষেত্রে হয়ত নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধরছে বিকৃত রূপ। সভ্য সমাজে হিষ্টিরিয়া, উন্মাদনা, নিউরসথেনিয়া প্রভৃতির প্রসার কি জন্যে এত বেশী, তা আমরা সকলেই জানি। এত ব্যভিচার, দুর্নীতি ও অনাচার কেন, তা-ও জানি।

অবশ্য ভব্যতার পালিস লাগিয়ে আদিম বৃত্তির উদ্দামতাকে আমরা যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখারই চেষ্টা করেছি। আজো টবে গাছ লাগিয়ে, পশু-পক্ষী পুষে, নকল ঝর্ণা-ঝিল বানিয়ে, মানুষ ফিরিয়ে আনতে চায় তার অরণ্যক অতীতকে। নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের চর্চা থেকে সুরু করে, নর-নারীর মিশ্র-পার্টি ও পান-ভোজন পর্যন্ত, অনেক কিছুর মধ্যেই আজো চলেছে তার সেই পুরাতন যৌন-স্বাধীনতার প্রবাহ। আর চলেছে দেশপ্রেমের এবং মানবতা, ধর্ম ও সমাজ-রক্ষার নামে পরিচালিত যুদ্ধের ভেতর দিয়ে তার আদিম নৃশংসতা এবং গোষ্ঠী-জীবনের সংগ্রামশীলতারই অনুবৃত্তি। সভ্যতার চরম শিখরে উঠেও মানুষ বেশ্যা-বৃত্তিকে স্বীকার করেছে, যুদ্ধকে মেনে নিয়েছে, ব্যবসায়িক শঠতা ও সামাজিক কাপট্যকে পরিহার করতে পারে নি, এত প্রত্যক্ষ সত্য! তা সত্বেও ব্যাপক ভাবে এ-সবের অনুশীলন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং সে জন্যে বহিরঙ্গিক আইন-কানুন এবং বিধি-বিধানও যথেষ্ট তৈরি হয়েছে। সর্বোপরি সব-কিছুর সদর দরজায় দাঁড় করানো হয়েছে এমন এক অর্থনৈতিক প্রহরা, যা অতিক্রম করা অনেকের সাধ্যের বাইরে। কাজেই ব্যক্তি-জীবন সভ্যতার আওতায় বিকৃত না হয়ে পারেনি। যে হেতু সভ্যতা জিনিষটাই কৃত্রিম এবং কৃত্রিম মানেই স্বাভাবিকের ব্যতিক্রম।

॥ ২ ॥

উপনিষদে গল্প আছে, ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু একদিন দেখলেন, কয়েক জন ঋষি বলপূর্বক তাঁর জননীকে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। বিচলিত হয়ে তিনি তাঁর পিতাকে বিষয়টির প্রতি অবহিত করলেন। পিতা তাতে বললেন, ক্ষুব্ধ হয়ো না বৎস, মৃত্তিকা ও গাভীদের মতো বামাগণও সর্বজনভোগ্যা হবেন, এই হল চিরাগত প্রথা। শ্বেতকেতু পিতার এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি তখন থেকে নিয়ম করলেন যে পুরুষ মাত্রেই বৈধ উপায়ে গৃহীত নারীতে উপগত হবেন এবং পর-নারী গমন সমাজে গুরুতর অন্যায় রূপে গণ্য হবে। এর ফলেই সমাজে এল বিবাহ প্রথা, আর ব্যভিচার হল নিন্দিত।

গল্পটি আদিম অবস্থায় মানুষের যৌন জীবনের প্রকৃতি কি রকম ছিল এবং কি ধারায় ক্রম-বিকশিত হয়ে তা বিবাহে রূপান্তরিত হয়েছে, তা বোঝার সহায়ক। যে দাম্পত্য নিষ্ঠা ও পারিবারিক একাত্মতার ভিত্তি আশ্রয় করে, আজ আমরা সমাজ জীবন যাপন করি, তা একদিনেই আসে নি। বহু অনাচার, কদাচার ও ঠেঙাঠেঙির ভেতর দিয়ে যুগের পর যুগ পাড়ি দিতে দিতেই অবশেষে মানুষ এর উপযোগিতা অনুভব করেছে। আদিম অবস্থায় মানুষের তথাকথিত সমাজ-জীবন ছিল না। এক-একটি নদীতীর, অরণ্য বা পর্বতপ্রস্থ বেষ্টন করে এক-একটি মানব-গোষ্ঠী বাস করত যূথবদ্ধ পশুদের মতো। খাদ্য-বস্তু, পালিত পশু, যন্ত্র-পাতি যা-কিছু তাদের থাকত, থাকত দলের সাধারণ সম্পত্তি রূপে এবং দলস্থ যে-কোন পুরুষ যে-কোন নারীতে উপগত হত। সেই ভাবে সন্তান-সন্ততি জন্মাত এবং তারা দলের সৈনিক ও কর্মী-সংখ্যা পুষ্ট করত।

বলাই বাহুল্য, সম্পর্ক বলে কোন জিনিষ তখন ছিল না, ন্যায়-অন্যায়ের কোন বিচার-ভেদও তখন দেখা দেয়নি। কাজেই যে নারীর গর্ভে জন্মাত, বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পুরুষ তার সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করত এবং তা নিয়ে জন্মদাতার সঙ্গে তার হত মারামারি। যে নারী জন্মাত আপন ঔরসে, তাকে গ্রহণ করতে তার একটুকু বাধত না। সেই নারীর ওপর অন্য পুরুষের হস্তক্ষেপ নিয়ে হত প্রচণ্ড কাটাকাটি। একই দলের মধ্যে এই ভাবে চলত যথেচ্ছাচার এবং তা নিয়ে অবিশ্রাম হানাহানি। এ ছাড়া এক গোষ্ঠীর লোকেরা এসে

আক্রমণ করত অন্য গোষ্ঠীকে এবং দুই দলে যুদ্ধের পর যে পক্ষ জয়ী হত, তারা পরাজিত পক্ষদের ধরে নিয়ে গিয়ে করত ক্রীতদাস। পুরুষদের করত মজুর ও সিপাহী এবং নারীদের করত কর্মী ও জীবন-সঙ্গিনী।

বহু শত বৎসর ধরে মানুষের জীবন চলেছে এই ভাবে। এরপর মানুষ আস্তে আস্তে বুঝেছে, যৌনগত ঈর্ষ্যা জিনিষটাই অধিকাংশ মারামারির মূল এবং তা বুঝেই কতক গুলো বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করেছে। তার ফলে এসেছে সম্পর্ক ভেদ এবং যৌন ব্যাপারে কতক গুলি সম্পর্ক অনতিক্রম্য বলে বিবেচিত হয়েছে। তখনি মাতা, কন্যা এবং ভগিনী গমন নিষিদ্ধ হয়েছে। আর সেই নজীরে মাতা. কন্যা ও ভগিনী পদবাচ্যা অন্য নারীদের সঙ্গে সাহচর্যও নিষিদ্ধ হয়েছে। এই নিষেধের সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে পাপ-পুণ্য বোধ, তদুপরি এর ব্যতিক্রমের জন্যে কঠিন দণ্ড দানও ব্যবস্থিত হয়েছে। পরকালে নরকের এবং ইহকালে দণ্ডের ভয়ে নর-নারী অবাধ সম্মেলন পরিহার করেছে, অথবা সমাজ কর্তৃত্ব ফাঁকি দিয়ে গোপনে এর অনুশীলন করেছে। ক্রমে এই অভ্যাস নিরস্ত হয়েছে এবং প্রবৃত্তি হয়েছে সঙ্কুচিত, তৈরি হয়েছে নূতন সংস্কার। এরপর এসেছে বিবাহ।

স্ব-গোষ্ঠীর মধ্যে যা হয়েছে, পর-গোষ্ঠী সম্বন্ধে তা হতে দেরী লেগেছে। বিরুদ্ধ বা প্রতিপক্ষ দলের নারীদের ধরে এনে বন্দী করা এবং তাদের যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করা চলেছে বহু কাল। অবশেষে সদয় প্রতিবেশীত্ব বোধ জন্মেছে মানুষের। তখন পরের খাদ্য-শস্য ও গৃহ-পালিত পশু হরণের মতো নারী-হরণও মানুষ অন্যায় বলে বুঝেছে এবং তা না করাকেই মনুষ্যোচিত আচরণ বলে প্রচার করেছে। এই ভাবে ধীরে-ধীরে ধাপে-ধাপে মানুষের গৃহ-জীবনের আদর্শ গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিবাহ এবং পারিবারিক জীবনের ভিত্তিটি গড়ে উঠেছে। এটা এক দিনে হয়নি, এক জনেও করে নি। বহু সহস্র বৎসরের চিন্তা এবং বহু সহস্র নর-নারীর মিলিত চেষ্টাতেই সমাজ-বিন্যাসের এই কাঠামো তৈরি হয়েছে। আর এই ক্রম-বিকাশের ফলেই মানুষ তার আদিম পশুত্ব অতিক্রম করে, মানুষ নামের অধিকারী হতে পেরেছে। পশুদের অন্তশ্চেতনায় এই বিবর্তন হয় নি বলেই, তারা সেদিনও পশু ছিল, আজো পশুই আছে।

কিন্তু বিবাহ প্রথা যে রাতারাতি জন্মেছে এবং জন্মলাভ করা মাত্র যে সমাজে ঠিক আজকের আদর্শানুযায়ী শুচিতা এসেছে, তা নয়। স্ব-গোষ্ঠীভুক্ত

নারী ও পুরুষের যথেচ্ছাচার যখন নিষিদ্ধ হয়েছে, তখন তারা বাধ্য হয়েছে বাইরে নজর দিতে। এই ভাবে পুরুষের পর-নারী টেনে আনা এবং নারীদের অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া সুরু হয়েছে। এই টেনে আনা বা পালিয়ে যাওয়াকে প্রথম দিকে কেউ প্রসন্ন চিত্তে নেয়নি। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ, হৈ-হুল্লোড় হয়েছে। অবশেষে মানুষ জিনিষটা মেনে নিয়েছে সঙ্গত বলে। তখন এক গোষ্ঠীর কন্যাকে আর এক গোষ্ঠীর ছেলে নিয়ে যাবে এবং তার জন্যে সে গাভী, শস্য, নয়ত দৈহিক মেহনৎ মূল্য স্বরূপ দেবে, এই ঠিক হয়েছে। এই ভাবে হয়েছে বিরোধের নিষ্পত্তি। অর্থাৎ ভিন্ন গোত্র সমাবেশ এবং পণ প্রথা দিয়েই আদিম বিবাহের সূত্রপাত হয়েছে। ক্রমে হয়েছে তারি রূপান্তর, যা আজো চলছে।

মোটামুটি ভাবে ক্রম-বিকাশের এই ধারা ধরে মানুষ এগিয়ে এলেও, সর্বস্তরে সর্ব গোষ্ঠীতেই মানুষের বিকাশ কিন্তু ঠিক এক ভাবে হয় নি। তাই এক স্তরের মানুষ যেখানে বিশেষ-বিশেষ সম্বন্ধের সঙ্গে যৌনাচরণ নিষিদ্ধ বলে বুঝেছে, অন্য স্তরের মানুষ তাকে বৈধ বলে গ্রহণ ও প্রচার করেছে। আদিম সমাজে এমন গোষ্ঠী অনেক ছিল, যারা বৃদ্ধ পিতাকে অপসারিত করে মাতার সঙ্গে সংসার গঠনে প্রবৃত্ত হয়েছে, বা বাইরের প্রার্থী অপরাপর যুবকদের চেষ্টা প্রতিহত করে স্বয়ং তরুণী ভগিনীকে গ্রহণ করেছে। সভ্যতার উন্নত অবস্থাতেও দেখা যায়, বুদ্ধদেব যে বংশে জন্মেছিলেন, তাতে সহোদরা বিবাহ ছিল। ক্লিওপেট্রা তাঁর সহোদর টলেমিকে বিবাহ করেছিলেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'মানব সমাজ' বইয়ে মাতৃ-পানিগ্রহণের কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক নজীর উদ্ধৃত করেছেন। কাজেই সমাজে বিবাহ আসা মাত্র যে মানুষের জীবন এখানকার বিচারানুযায়ী পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে নি এ আশা করি আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। আদিম মানুষের যথেচ্ছাচারের অভ্যাস বিবাহ প্রথার মধ্যে দিয়েও আপন অস্তিত্ব রক্ষা করেছে নানা দেশে, নানা ভাবে এবং তা অনেক দিন।

সভ্যতার এই উন্নত অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে, আজকের এই রুচি, আদর্শ ও সামাজিক শ্রেয়-বোধের মাপকাঠি নিয়ে বিচার করে, এ কথা সহসা মেনে নিতে নিশ্চয় অনেকের বাধবে। কিন্তু সম্পর্ক, বিধি-নিষেধ ও সমাজাদর্শ যে অনেক পরে জন্মেছে, মানুষ যে জন্মেছে তার অনেক আগে এবং তার প্রাথমিক জীবন-ধারা যে পশু-জীবনের সমতুল্য ছিল, তা থেকেই আস্তে আস্তে তার

বিকাশ হয়েছে, এ ত সকলেরই সুবিদিত তথ্য। সেই আদিম পশুত্বের অবস্থা কোন-কোন মানব-গোষ্ঠীতে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, কোন কোন গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত আগে তা থেকে ছাড়িয়ে উঠেছে, এ যেমন সত্যি, অদ্যাবধি পশুত্বের জড় মানুষের মননশীলতার মধ্যে কোন-না-কোন ভাবে আত্ম-গোপন করে আছে, এ-ও যে তেমনি সত্যি, এ কথা আমাদের ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব এবং সামাজিক রীতি-নীতির ধারাগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়।

যাই হক, সমগ্র ভাবে মানব সমাজের একই ধারায় বিকাশ না হলেও এবং যৌনগত নীতি ও আদর্শ-নির্ধারণে সবাই ঠিক এক পথাবলম্বী না হলেও, মোটামুটি ভাবে মানব-সংসারে স্বজন-গমন, পর-নারী ধর্ষণ, ব্যভিচার ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার একদিন অনুচিত বলেই গৃহীত হয়েছে এবং গৃহ-জীবনের ব্যবস্থাপনা. বংশ-বৃদ্ধি ও সমাজ-রক্ষার দিক থেকে বিবাহই একমাত্র বৈধ সমাধান বলে স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু পুরুষের একপত্নীত্ব এবং দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা ও পারস্পরিক মর্যাদা বা স্বাধিকার স্বীকারের আদর্শ জন্মেছে আরো অনেক পরে। পুরুষের যথেচ্ছ সংখ্যায় বিবাহ করা এবং বিবাহিতা স্ত্রীদের কেবলমাত্র শ্রমের সহকারী ও সন্তানের জন্মদাত্রী রূপে ব্যবহার করাই ছিল বহু কালাবধি সমাজ-ব্যবস্থা। স্বামী বিদ্যমানে নারীর পদস্খলন ত কঠিন হস্তে দণ্ডিত হয়েছেই, স্বামী আসার প্রতীক্ষায় কৌমার্যের পবিত্রতা রক্ষা এবং স্বামী মারা যাবার পর হয় তাঁর অনুগমন, নয় তাঁর উদ্দেশে পবিত্রতা রক্ষাই নারীর একমাত্র কর্তব্য বলে বিহিত হয়েছে। পক্ষান্তরে পুরুষের ওপর কোন বিধি নিষেধই আরোপিত হয় নি।

এ ছিল প্রায় সমস্ত পুরানো সমাজ-গোষ্ঠীর আদর্শ। অল্প দু-একটা গোষ্ঠী শুধু নারীর বহু-পতিত্ব, কুমারীর অবাধ যৌনাচার এবং বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের অধিকার অনুমোদন করত। সে-সব গোষ্ঠীতে হয়ত নারীর প্রাধান্য ছিল, তাই একান্ত ভাবে পুরুষাত্মক সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি হতে পারেনি। অনেকে বলেন, আদিম সমাজই নাকি ছিল মাতৃতান্ত্রিক। হতে পারে, কিন্তু আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজ দুনিয়ার কোথাও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। পুরুষের প্রবলতর শক্তি নারীকে সভ্যতার সুরুতেই অধীনতা স্বীকার করিয়েছে এবং সামাজিক সুনীতির ব্যবস্থাপনায়, নারীর সকল অধিকার সঙ্কুচিত করে, নিজের অবাধ স্বাধীনতা বহাল করেছে। আমাদের আজকের সমাজ ও তার

অনুমোদিত বিবাহ-ব্যবস্থা এই পুরাতন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাই সমস্ত উদার নীতি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ সত্ত্বেও সতীত্ব অর্থাৎ একনিষ্ঠতা সর্বতোভাবে শুধু নারীর ধর্ম বলে স্বীকৃত। তার ব্যতিক্রমকারিণী যে, সে হল ভ্রষ্টা, সমাজে তার স্থান নেই।

॥ ৩ ॥

যৌন-বৃত্তির আদি লক্ষ্য অপত্য বিধান, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল সন্তান-সৃষ্টির জন্যেই নর-নারী পরস্পর মিলিত হয় না। নিজস্ব ভোগ-বাসনার তাগিদে তারা পরস্পরকে সন্ধান করে। আর প্রকৃতি এই সুযোগে তাদের দিয়ে আপন সৃষ্টির কাজ করিয়ে নেয়। এই ভোগ-উপভোগের ধারাও সকলের এক নয়। যৌনাচরণের ক্ষেত্রে তাই কোনটা স্বাভাবিক, কোনটা অস্বাভাবিক, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ ঘটে। মোটামুটি ভাবে এই টুকু ধরে নেওয়া হয় যে দুটি পূর্ণ বয়স্ক এবং বৈধ ভাবে সংযুক্ত নর-নারী যখন পরস্পরের অভিপ্রায় মতো মিলিত হয়, তখন সেটা হয় স্বাভাবিক আচরণ। আর তার বহির্ভূত আচরণ যা, তার সবই অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিতার আবার আছে দুটো পর্যায় : যেখানে বৈধ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন দুটি নর-নারী সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, সেখানে সেটা হয় ব্যভিচার, আর যেখানে প্রকৃতি ব্যবস্থিত রীতি পরিহার করে, মানুষ আপন খেয়ালের বশে বা প্রবৃত্তির তাগিদে রকমারি পাত্র ও পদ্ধতি আবিষ্কার করে নেয়, সেখানে তা হয় বিকৃতাচার।

দুটোই প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম, সে হিসাবে 'অস্বাভাবিক'। কিন্তু দুটোর প্রকৃতি দু-রকম। ব্যভিচার সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে গুরুতর অন্যায় হলেও, জৈব-প্রবণতা ও তার চরিতার্থতা হিসাবে স্বাভাবিকতার প্রতিকূল নয়। দেহ-বিজ্ঞান ও মানোবিজ্ঞানের আলোতে বিচার করলে, তা নর-নারীর স্বভাব-সম্মত আচরণ বলে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু বিকৃতাচার সাধারণ জৈব-প্রকৃতির প্রতিকূল, সেই কারণেই তা ষোল-আনা অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

হয়ত প্রশ্ন উঠবে, প্রকৃতি মানুষকে স্বাভাবিক যৌন-বৃত্তিই দিয়েছিল জীব-প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্যে, বিকৃতি ত দেয় নি, তবে বিকৃতি এল কেন এবং কি করে এল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হবে যে মানুষ নিজেই তার বুদ্ধি ও

মননশীলতা প্রভাবে সভ্যতার মতো একটি কৃত্রিম জিনিষ সৃষ্টি করেছে এবং নিজের সৃষ্ট সেই সভ্যতার রকমারি আইন-কানুনের হাতে এমন ভাবে নিজেকে বন্দী করে ফেলেছে যে আপন প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলার স্বাধীনতা নেই আজ কারু। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতার এই অস্বাভাবিক অবদমনই হল বিকৃতির কারণ। সকলকেই যৌন-বৃত্তি কোন না-কোন সময় দমিত করে চলতে হয়। কিন্তু প্রকৃতি তার পাওনা বুঝে নেবেই। তা সঙ্গত পথে না যদি জোটে, অসঙ্গত পথ বেছে নিতেও তার আপত্তি হবে না। শুধু মানুষ কেন, গৃহ-পালিত জীব-জন্তুদের মধ্যেও এমন সমস্ত অভ্যাসের বিকৃতি দেখা যায়, যা তাদের আরণ্যক অবস্থায় পাওয়া যাবে না দেখতে।

অর্থাৎ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে, উদ্ভট ও বিচিত্র উপায়ে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার নাম বিকৃতাচার, আর সামাজিক রীতি-ভঙ্গ থেকে জন্মায় ব্যভিচার। অবিবাহিত নর-নারী, বিপত্নীক পুরুষ, বিধবা বা পতি-পরিত্যক্তা নারী এবং গৃহ-পরিবার থেকে স্খলিত পুরুষ যে-সমাজে যত বেশী, সে-সমাজে ব্যভিচার তত ব্যাপক, এ আশা করি বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। ধারাবাহিক অতৃপ্তি পোষণ করতে করতে, এই শ্রেণীর নর-নারীরা এমন একটা স্নায়বিক অধীরতার স্তরে এসে পড়ে, যখন অণুমাত্র সুযোগেই তারা হয় পদস্খলিত এবং তখনি ঘটে ব্যভিচার। আমাদের সমাজে কিছু কাল আগেও পর-নারীর সঙ্গে পুরুষের মেলা-মেশার অবাধ সুযোগ ছিল না। তাই তখন ব্যভিচার ঘটত প্রধানত ঘরের মধ্যেই এবং রিপু-তাড়নায় অনেকে অনেক দুরতিক্রম্য সম্বন্ধের গণ্ডী অতিক্রম করে বসতেন। যখন থেকে সমাজে নর-নারীর মেলা-মেশা অনেকটা সহজ হয়েছে, তখন থেকে আন্তঃপুরিক ব্যভিচার কমেছে, পতিতাবৃত্তির স্রোতেও কিছুটা ভাঁটা পড়েছে এবং ব্যভিচারের হয়েছে রূপ বদল।

অবশ্য একটা কথা এই সূত্রে বলে রাখা দরকার যে কেবল মাত্র নর-নারীর বঞ্চিতাবস্থাই ব্যভিচারের একমাত্র কারণ নয়। মানুষের স্বভাব-জাত বহুগামিতার মনস্তত্ব, বিচিত্র ও বহুমুখী পথে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির লালসা, যা সে আদি কাল থেকে রক্তের মধ্যে বহন করে আসছে, তা-ও তাকে সমাজ-বিরুদ্ধ সম্পর্কের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং সেজন্যেও প্রভূত ব্যভিচার হয়। অবদমন জনিত বিকৃতির ফলে নর-নারীর মধ্যে যে-সমস্ত অস্বাভাবিক আসক্তি ও অভ্যাস দৃঢ়বদ্ধ হয়, তার চরিতার্থতার জন্যেও অনেকে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত হয়।

এই জন্যে বিবাহিত এবং স্বচ্ছন্দ যৌন-জীবনে প্রতিষ্ঠিত নর-নারীকেও অনেক সময় ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত দুষ্ট লালসা ও অসংবৃত আকাঙ্ক্ষা সমাজ-জীবনে বহু অনর্থের সৃষ্টি করেছে। এক দিকে এ করেছে পতিতাবৃত্তির মতো জঘন্য জিনিষের পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে মানুষের পারিবারিক স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে হেনেছে গুরুতর আঘাত। সেই কারণেই ব্যভিচার সামাজিক অপরাধ হিসাবে এত নিন্দনীয়, বিকৃতাচার এত ধিক্কারযোগ্য।

আসলে আমাদের অর্থনীতিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক আদর্শ ও নৈতিক শাসন-অনুশাসন অনিবার্য ভাবেই সমাজ-জীবনে এনেছে বাধ্যতামূলক নানা অবদমন, যার প্রতিক্রিয়া প্রসারিত হয়েছে রকমারি ব্যভিচার ও বিকৃতির মধ্যে দিয়ে। সমাজ-জীবনের যে-কোন পর্বে অনুসন্ধান চালালেই দেখা যায়, এ দুইয়ের ব্যাপ্তি কত বেশী, আর এই দুটি ব্যাপার পরস্পরের পরিপূরক রূপে কি ভাবে সমগ্র সমাজ-সৌধের তলা ধ্বসিয়ে দিচ্ছে! অবশ্য সাধারণ ভাবে সমাজ-জীবনের ওপর চোখ বুলিয়ে গেলে বিষয়টা টের পাওয়া যায় না। আর তা যায় না বলেই, অহেতুক সারল্যে অনেকে মনে করেন, বুঝি আমরা নিষ্কলুষ শান্তির আশ্রয়ে অক্ষত, অব্যাহত ও আবিকৃত জীবনেই প্রতিষ্ঠিত আছি!

বলা বাহুল্য অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের ধাক্কায় আধুনিক কালে জীবন-যাপনের আদর্শ দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ায় এবং নগর-বন্দর ও শিল্প কেন্দ্রের প্রয়োজনে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বহুল পরিমাণ নর ও নারীর হোষ্টেলে, মেসে, অস্থায়ী কোয়ার্টারে বসবাস ব্যাপ্তি লাভ করায়, ধর্ম-সঙ্ঘে, রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে অজস্র প্রাপ্তবয়স্ক ও অবিবাহিত নর-নারীর বাধ্যতামূলক অবস্থিতিতে এবং আরো নানা সুবিদিত কারণে এ কালে বিকৃতি ও বৈকল্য ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে এটা ঠিক। কিন্তু বিকৃতি সে-কালেও বাংলা দেশে ছিল। তার কারণ যৌনাবদমন সে-কালেও প্রবল ছিল। বাল্য বিবাহ, অকাল বৈধব্য, নারীর সপত্নী-বাহুল্য, পুরুষের বহুপত্নীকতা যে-সমাজে প্রায় সার্বজনীন ছিল, তাতে অবস্থা বিপাকেই ব্যভিচার ও বিকৃতাচার আত্মপ্রকাশ করেছে, এ কথা ত সহজেই বুঝতে পারা যায়।

শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মাশ্রমের অন্তর্লগ্ন ক্রিয়া-করণ ইত্যাদির আলোচনাতেও দেখা যাবে, ব্যভিচার ও বিকৃতির অভ্যাস সমাজে কত দূর পর্যন্ত পৌছেছিল। সে-কালের সাহিত্যে ও সহজিয়াদের পুঁথি-পত্রে যে-সব

গুপ্ত-ক্রিয়ার তত্ত্ব ও বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে প্রচ্ছন্ন রূপকের আশ্রয়ে এবং আধুনালুপ্ত এক জাতীয় পারিভাষিকের সাহায্যে, অথবা রথ ও মন্দির গাত্রে খোদিত সে-কালের চিত্রে ও ভাস্কর্যে যে-ধরণের ন্যক্কারজনকতা রূপায়িত হয়েছে, তাতেও বোঝা যায়, সে-কালে এ-সব জিনিষের প্রাদুর্ভাব কম ছিল না। জানি, এই সব চিত্র সম্বন্ধে একাধিক তত্ত্ব-সম্মত ব্যাখ্যা প্রচারিত হয়েছে। বলা হয়েছে, মন্দির বা রথ হল আসলে জীব-দেহের প্রতীক, তার বহিরায়তন হল জৈব-অস্তিত্বের ব্যবহারিক স্তর, যেখানে পাপ-তাপ, স্খলন-পতন পরিব্যাপ্ত রয়েছে, আর অন্দর হল আত্মিক স্তর, যেখানে কোন কলুষ পৌঁছায় না। নির্মল শুচিতা ও অটুট সৌন্দর্য সেখানে চিরদীপ্যমান রয়েছে। যুক্তি যাই হক, এর দ্বারা সমাজ-জীবনে যে ব্যভিচার, বিকৃতি ও বৈকল্যের স্বীকৃতি ছিল, তা স্বীকার করা হচ্ছে।

যে-সব সামাজিক বিধি-বিধান ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি সে-কালের বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল, তা-ই সৃষ্টি করেছিল এই সব বিকৃতিকে। আর সে গুলোকে মানুষ জৈব-অস্তিত্বের স্বধর্ম বলে গ্রহণ করেছিল বলেই, সাহিত্যে, শিল্পে ও জীবন-চর্যায় তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। যুগোচিত কারণে আমরা আজ বিকৃতির রাজ্যটাকে আরো জটিল করেছি। সেদিনকার গণ্ডী ছিল ছোট, আজ তা হয়েছে ব্যাপক। কিন্তু আজ আমরা বাইরে তাকে গোপন করতে শিখেছি, তাই সেদিন যা প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হত, আজ চলা হয় তাকে আবৃত করে।

সমাজ সমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার

প্রথম অধ্যায়

ধর্মাচার বনাম যৌনাচার

মানুষের আদি ধর্মবোধ যে যৌনবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, একথা প্রায় সর্ববাদীসম্মত। মানুষ যেদিন বুঝেছিল যে স্ত্রী-পুরুষের অর্থাৎ পিতা-মাতার দেহসম্মেলন থেকে জীবের উৎপত্তি হয়, সেদিন সেই নজীরেই তার মনে হয়েছিল, হয়ত বিশ্ব-পৃথিবীর উৎপত্তির মূলেও অমনি কোন ব্যাপার নিহিত আছে। পার্থিব পিতা-মাতার আদর্শে তখন সে ঈশ্বররূপী পিতা-মাতা সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁদের ভেতর মনুষ্যোচিত সম্পর্ক আরোপ করে সে বিশ্বরহস্য বুঝতে চেয়েছিল।

আদি মানুষের কাছে পুরুষের লিঙ্গ আর নারীর যোনি নিতান্তই এক-একটা অঙ্গ ছিল না। এই দুই অঙ্গের সংযোগ ও সম্মেলনে যে সুখানুভূতি হয় এবং সেই সুখবোধ অপত্য প্রজননে রূপান্তরিত হয়ে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, তা-ই তাকে এই দুটি অঙ্গের অলৌকিক ক্ষমতা ও মহিমায় অভিভূত করে। স্বভাবতই আপন প্রতিচ্ছায়া অনুসরণ করে সে যে ঈশ্বর সৃষ্টি করল, তাতে এই দুটি অঙ্গ করল প্রধান স্থান অধিকার এবং এ দুইয়ের সঙ্গমকে সে একটা রহস্যময় আধ্যাত্মিক ব্যাপার বলে স্বীকার করে নিল। এই ভাবেই এল পূজা-পদ্ধতি এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম পূজাই হল লিঙ্গপূজা। পরবর্তী কালের দার্শনিক চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধি এই স্থূল উপলব্ধির ভেতর থেকে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব খুঁজে বের করেছে। বলেছে, এই যে দেব-দেবীর সঙ্গম, এটা রূপক মাত্র। আসলে এর মূল কথা হল প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মেলন। অনন্ত শক্তির আধার স্বরূপা যে প্রকৃতি, তাঁকেই বলা হয়েছে মা এবং যে চৈতন্য বা তেজোশক্তির প্রভাবে এই প্রকৃতি সজীব ও সক্রিয় হয়েছে, তাঁকেই বলা হয়েছে পিতা। অনেকের মতে দার্শনিক-তত্ত্ব-ব্যাখ্যানের এই সূত্র ধরেই নানা ধর্মগত মত ও পথ সৃষ্টি হয়েছে, আর প্রত্যেক মত স্ব-স্ব আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী দেব-প্রতীক সৃষ্টি করে নিয়েছে।

পুরুষরূপী শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নারায়ণ, গণপতি প্রভৃতি দেবের এবং প্রকৃতিরূপিণী দুর্গা, কালী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর উদ্ভব হয়েছে এই ভাবে এবং এঁদের যুগ্ম সমাবেশকে স্মরণ, মনন ও অনুধ্যান করা আত্মিক কল্যাণের উপায় বলে স্বীকৃত এবং প্রচারিত হয়েছে। অর্থাৎ জড় ও চেতনার, পুরুষ ও প্রকৃতির অবিভেদ্য মিলনের তত্ত্বটাই প্রাকৃত জনের বোঝার বিপাকে জান্তব মৈথুনে রূপান্তরিত হয়েছে, এ-ই হল পণ্ডিতদের মত। এই সূক্ষ্ম পণ্ডিতী বিচার উচ্চ মননশীলতার পরিচায়ক তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্মের তত্ত্ব আর ধর্মের ফলিতাংশ ত এক জিনিস নয়। ফলিত ধর্ম কোন তত্ত্বের অপেক্ষা না রেখেই, আপন অভিরুচি অনুযায়ী প্রতীক ও পদ্ধতি রচনা করেছে এবং বাস্তব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তত্ত্ব এসেছে তার পর এবং এক-একটা বাঁধা ছকে ফেলে জিনিষটাকে সহনীয় ও গ্রহণীয় করে তুলতে চেয়েছে। কাজেই সমস্ত তত্ত্বব্যাখ্যা প্রতিহত করেই অনুষ্ঠানিক ধর্ম তার আদি কাঠামো আজো অকৃত্রিম অনুরাগে আঁকড়ে আছে। সে কাঠামো বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, তাতে যৌনাত্মকতাই হল প্রধান ও প্রথম উপজীব্য। কোথাও একটু পরিশুদ্ধ আকারে, কোথাও বা খোলাখুলি ভাবে দেব-প্রতীকে যৌন সম্পর্ক আরোপিত হয়েছে এবং প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি এই লিঙ্গপূজাই আমাদের মধ্যে ধর্মের নামে চলেছে নানা আকারে।

আশৈশব ভক্তি সহকারে দেখা ও প্রণতি নিবেদন করার ফলেই, এই সব প্রতীকের প্রকৃত স্বরূপ এবং অন্তর্নিহিত অর্থ আমরা তলিয়ে দেখতে ভুলে যাই। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তিতে হক, আর শিব-শক্তির পূর্ণাঙ্গ বা খণ্ডিত প্রতীকে হক, সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যৌন সম্মেলনকেই উপস্থাপিত করা হয় নি ? শিবলিঙ্গের বা মহাকালীর পরিকল্পনায় যৌনতাকে সরাসরি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে লক্ষ্মী-নারায়ণের বা রাধা-কৃষ্ণের পরিকল্পনায় কামকেলির মূল কথাটি প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের আর শিব-শক্তির মূর্তি পরিকল্পনায় পরবর্তী কালে যে ভব্যতাটুকু বাঁচিয়ে বলার চেষ্টা হয়েছে, সেটা মানুষের ক্রমবর্ধিত শালীনতা বোধের পরিচায়ক। কিন্তু এই সব প্রতীকের পুরানো পরিকল্পনায় কোথাও কোন শালীনতার আচ্ছাদনই দেখতে পাওয়া যায় না।

'নীলতারা', 'বজ্রতারা' প্রভৃতি নামে পরিচিত কালিকা মূর্তিগুলি আশা করি সকলেই দেখেছেন। নীলতারা পরিকল্পনায় উলঙ্গিনী কালিকা শিবের উরুদ্বয়ে নতজানু ভঙ্গীতে বসে আছেন। সেই আলুলকুন্তলা, মিথুনাসনা মূর্তিই হল আদিমতম কালিকা মূর্তি। এই মূর্তির রকমারি রূপান্তর প্রচলিত আছে নানা স্থানে, নানা নামে। এমন মূর্তিও দেখেছি, যাতে শবরূপী শিব এক হাতে কালিকার কটিবেষ্টন করে অন্য হাতে স্বীয় সাধন ধরে আছেন। বাংলায় রাধা-কৃষ্ণের এবং দাক্ষিণাত্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের এমন মূর্তি যথেষ্ট পাওয়া যাবে, যাতে যৌনতাকে খোলাখুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে। বিষ্ণু বা নারায়ণের ক্রোড়ে দক্ষিণমুখী হয়ে উপবিষ্টা লক্ষ্মী একপদ উন্নীত করে রয়েছেন এবং দক্ষিণ হস্তে নায়ক তাঁর বসনাঞ্চল অপসারিত করছেন, এই রকম যুগল মূর্তি যথেষ্ট আছে। শঙ্খ-চক্রধারী বিষ্ণুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নূপুরাঙ্কিত চরণে নৃত্য করতে করতে লক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন, বা গজানন গণপতি উচ্ছ্রিত সাধনদণ্ড বামহস্তে ধারণ করে ও দক্ষিণহস্তে মুদ্রা রচনা করে নৃত্য করেছেন, এ রকম মূর্তি দাক্ষিণাত্যে আশা করি অনেকেই দেখে থাকবেন। বাংলাতেও রাধা ও কৃষ্ণ প্রাকৃত নর-নারীর মতো নানা আসনে সম্মিলিত আছেন, চতুষ্পার্শে অষ্টসখী গীতবাদ্য সহকারে নৃত্য করছেন, কারু নীবীবন্ধ শিথিল, কারু বক্ষদেশ অনাবৃত, কারু করতল সম্বাধতটে সংলগ্ন, এ রকম দৃশ্য অনেকই দেখা যাবে প্রাচীন পট, পাটা ও দেওয়াল-চিত্র অনুসন্ধান করে দেখলেন।

রাধার নিতম্ব বেষ্টন করে, ভূমিতলে নতজানু কিশোর কৃষ্ণের পোড়ামাটির একটি মূর্তি দেখেছি। দণ্ডায়মানা বিবসনা রাধার দেহসংলগ্ন আর একটি কৃষ্ণমূর্তিও দেখেছি। চালচিত্রের একটা দিক ভেঙে পড়ায়, সখী-সহচরীদের ভালো করে সনাক্ত করার উপায় নেই। তবে সেগুলো যে স্ত্রীমূর্তি তাতে আর সন্দেহ নেই, কারণ প্রত্যেকেই নিরাবৃত এবং নিখুঁত খোদকারীর গুণে প্রত্যেকেরই নিম্নাঙ্গ পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়েছে। শিবলিঙ্গের রকমারি আকার ত সকলেই দেখেছেন এবং কোন-কোন গৌরীপট্টের শিরোদেশে যে একটি বিন্দুবং অঙ্কুর ও শিবদণ্ডের উপান্তে দুটি বিল্বাকৃতি অণ্ড থাকে, এ ত সকলেরই জানা। কষ্টিপাথরের তৈরি এক বিশালকায় গৌরীপট্টের গহ্বরে পা রেখে শিব তাণ্ডবনৃত্য করছেন, আর যোনিপথের প্রলম্বিত অগ্রভাগ দিয়ে নরমুণ্ডরূপী জীব-প্রবাহ অজস্র ধারায় স্খলিত হয়ে আসছে, এ রকম একটা মূর্তির প্রতিলিপি সম্প্রতি দেখলাম।

আমার বিশ্বাস এই হল আদি নটরাজের পরিকল্পনা, পরে একেই মণ্ডলাকার বিশ্ব-চক্রে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

মোটের ওপর আমাদের ধর্মায়তনের প্রচলিত প্রতীকগুলি নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, তার প্রত্যেকটাই যৌনকেন্দ্রিক, কোনটা প্রকাশ্যে, কোনটা বা একটু নৈচে আড়াল দিয়ে। এর কারণ এই সব প্রতীক জন্মেছিল প্রাগৈতিহাসিক কালে, যখন মানুষ ছিল animist, নিসর্গ শক্তির ও লিঙ্গ-প্রতীকের আরাধনাই যখন ছিল তার ধর্ম। কালক্রমে এরা হিন্দু-সংস্কৃতির মর্মলোকে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। পুরাণ ও সন্দর্ভাদির সনদ পেয়ে তখনি কুলীন দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ঠিক হয়েছে, রুদ্র (শিব), কালী (শক্তি), অম্বা (দুর্গা), কৃষ্ণ (বিষ্ণু বা নারায়ণ) আসলে অনার্য দেবতা। আর্যেরা যখন দ্রবিড় সভ্যতা কবলিত ও 'সংস্কৃত' করেছে, তখনি এই সব পরদেবতাকে আত্মসাত করে, তারা আপন ধর্মায়তনে স্থান দিয়েছে। পুঁথিপত্র লিখে এঁদের মহিমা প্রচার করেছে। কিন্তু পরিকল্পনায়, আঙ্গিকে, উপকরণে, এঁদের আদিমতা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। তাই বেদান্ত ও উপনিষদের প্রজ্ঞাদৃষ্টি উপেক্ষা করে পৌত্তলিক ধর্মের প্রতীক ও পূজা-পদ্ধতিতে আজো লিঙ্গ এবং যোনির আসন অব্যাহত রয়েছে। যৌনাত্মক নানা অনুষ্ঠান, আসন ও উপকরণ রয়েছে এই সব প্রতীকারাধনার সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হয়ে।

শাক্তদের বামাচার, শৈবদের গৌরী-গ্রহণ বা বৈষ্ণবদের কিশোরী ভজনের কথা আশা করি সকলেই জানেন। এই সব অনুষ্ঠান যে খুবই পুরানো, তা এদের অনুষ্ঠানগত আদিমতা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। কিশোরী বা গৌরী নামধেয়া কুমারীর অজাতকেশ যোনিদেশ দুধ-গঙ্গাজল বা ঘৃত-মধু সহযোগে পূজা করা, তারপর কৃষ্ণ বা ভৈরব-রূপী পুরুষ কর্তৃক তাতে জীবন সঞ্চার করা, অথবা সুরাসক্ত কৌলপ্রধান কর্তৃক বিবস্ত্র ভৈরবীর অঙ্গে সাধন সন্নিবিষ্ট করে, বজ্রোলি মুদ্রা বা বিন্দুসাধন অভ্যাস করা যে উপাসক সম্প্রদায় কর্তৃক স্ব-স্ব উপাস্য দেবতার প্রতীকানুসরণের প্রবৃত্তি থেকেই এসেছে, এতে আর সন্দেহ নেই। মূত্র, থুথু, শুক্র, ঋতু-শোণিত, সঙ্গম-ক্লেদ প্রভৃতিতে সিক্ত ন্যাকড়া পুষ্প রূপে কানে বা মণিবন্ধে ধারণ, যৌনকেশের ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র রূপে ললাটে লেপন, স্ত্রী-পুরুষে পারস্পরিক অঙ্গলেহন, শুক্রসেবন, বা এই শ্রেণীর অপরাপর কদাচার যে আদিম অভ্যাসেরই অনুবৃত্তি স্বরূপ এবং এ সবই একদা যে প্রাচীন লিঙ্গ-পূজার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত কুমারী, কারুণী, ভৈরবী ও দেবদাসীদের পতিতা বৃত্তি যে ধর্মায়তনে সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃত হয়, অথবা মৎস্য, মাংস, সুরা, শোণিত, যোনি ও লিঙ্গের অবয়ব বিশিষ্ট ফুল, ফল ও তৈজস যে দেবারাধনায় অপরিহার্য উপকরণ রূপে বিবেচিত হয়, এসবও এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। বাস্তবিকই শঙ্খ, প্রদীপ, কোষাকুষি, ঘণ্টা, কমণ্ডলু, চামর, বাতিদান প্রভৃতি তৈজস, অপরাজিতা, অতসী, আকন্দ, ধুতুরা, কলিকা, জবা, চাঁপা প্রভৃতি ফুল, বেল, ফুটি, পেঁপে, শসা, কলা প্রভৃতি ফল, দুধ, দই, ঘোল, ঘী, মধু প্রভৃতি পানীয় যে পূজোপকরণ হিসাবে সর্বত্র স্বীকৃত, এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো। একান্ত ভাবে মৈথুনকেন্দ্রিক মনোভাব ও দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে মানুষ যখন প্রথম আমলের দেবতাদের সৃষ্টি করেছিল, তখন তার আবিষ্কৃত যাবতীয় অভ্যাস, আসন ও অনুষ্ঠানের মতো উপকরণগুলিও যথাসম্ভব যৌনতার দ্বারাই চিহ্নিত হবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কালক্রমে বিচারশীল মানুষ যখন লিঙ্গপূজাকে শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মবিধি বলে স্বীকার করেছে, তখনি রকমারি রূপক ব্যাখ্যানের সাহায্যে সমুদয় দেব-প্রতীক, পূজা-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠানের সার্বভৌম স্বীকৃতি লাভ হয়েছে। অবশেষে ধারাবাহিক ব্যবহারে সব কিছুই অভ্যস্ত বিষয়ে পরিণত হয়েছে, তখন আর এদের আদিমতা কারু চোখে পড়েনি। আজো চলছে তারি জের।

এখানে আরো একটা সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করা দরকার। আদিম সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। আদিম মানুষের ধর্মবোধও তাই ছিল মাতৃতান্ত্রিক। আমাদের ধর্মতত্ত্ব থেকেও একথা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করা যায়। তন্ত্রাচার বা শক্তি-পূজাই আমাদের আদি পূজা। আর সব পূজাই জন্মেছে এই আদি পূজার শাখা-প্রশাখা হিসাবে। আমাদের দেবায়তনে মাতৃ-দেবতার স্থানই সর্বাগ্রে। পিতৃ-দেবতার সংখ্যাও কম, গৌরবও মায়ের তুলনায় নগণ্য। যা-কিছু প্রাণদায়ী, কল্যাণপ্রদ, শক্তি, সম্পদ ও ঐশ্বর্য-বিধায়ক, তাতেই আমরা মাতৃত্ব আরোপ করেছি। তাই নদী, মাটি, অন্ন, বিদ্যা, বিত্ত, সামর্থ্য, সবই আমাদের কাছে মাতৃ রূপে প্রতিভাত। গঙ্গা, বসুমতী, অন্নদা, বাণী, শ্রী, নানা খণ্ড-রূপে আমরা মায়ের পূজা করেছি। কালক্রমে খণ্ড-মাতৃত্বের এই বহুমুখী ধারাই এসে মিশেছে এক অখণ্ড মাতৃত্বে, যাঁর নাম মহাশক্তি।

কিন্তু এই পরিশুদ্ধ মাতৃ-দর্শন অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কলের। প্রাচীন মানুষ মাতৃত্বের জৈব দিকটাই লক্ষ্য করেছিল এবং সেদিক থেকেই তাঁর

মহিমাকে সম্মান করেছিল। তাই পুরাতন পরিকল্পনায় মাতা বিবস্ত্রা এবং যৌন-ক্রিয়া নিরতা। বসুমতী মাতা হল-চালনা ও বীজ-বপনের দ্বারা শস্যবতী হন, প্রাচীন মানুষের বিচারে এটা ছিল সঙ্গম ও গর্ভ-বিধানেরই অনুরূপ ব্যাপার। এই নজীরেই বসুমতীকে তারা বর্ষায় রজস্বলা কল্পনা করেছে, অম্বুবাচী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যার ধারা আজো চলেছে। কামাখ্যার যোনিপীঠে কৃত্রিম ঋতু-শোণিত সৃষ্টি করে, এই হল-চালনা রূপককে বাস্তব রূপ দেবারও চেষ্টা হয়েছে। গঙ্গা বা নদী-জননীকে শস্য বিধায়িনী ও সম্পদশালিনী করার জন্যে তাঁর গর্ভে মৃত্তিকা নির্মিত শিবলিঙ্গ, প্রজ্জ্বলিত বর্তিকা, ঘৃত-মধু, ফল-মূল ও শস্যবীজ নিক্ষেপ করার মধ্যেও যে এই সঙ্গম-বিধানের রূপকই মূর্ত হয়, আর বারুণী স্নানের অক্ষয় পুণ্যার্জন যে আসলে গঙ্গাগর্ভ থেকে সদ্য নিষ্ক্রান্ত হয়ে, নবজাতক রূপে আবির্ভূত হওয়ারই রূপকানুসরণ, এ কথা আশা করি ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন সবাই।

নদী ও বসুমতী পূজার প্রাথমিক রূপটা আজো আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। মৃত্তিকার একটি তাল তৈরী করে তার গর্ভে শুক্র নিক্ষেপ এবং সেই নিষিক্ত মৃৎপিণ্ড মাটিতে পুঁতে, তার ওপর হল-চালনা উত্তরবঙ্গের উপান্ত সীমায় আজো হাজংদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের নাম 'গেরবাহান' (গর্ভবিধান ?), আর যিনি এই তেজ নিক্ষেপ করেন, তিনি হলেন 'পেঠান' (প্রধান ?)। প্রথম ঋতুমতী বালিকার শোণিতসিক্ত ন্যাকড়া শুক্র-নিষিক্ত করে, একটি প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ যোগে সেই রজো-বীর্য মণ্ডিত আলোক-শিখা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে সিংভূম ও মানভূম অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে। তাঁরা বলেন এর নাম 'সাম্পন' (সম্পদ দান) ?। আমাদের নদী ও বসুমতী পূজার ঐতিহ্য যে এখান থেকেই এসেছে এবং সেই জন্যে যে তার আদিম যৌনাত্মকতা আজো অব্যাহত আছে, এ বিষয়ে আশা করি কেউ দ্বিমত হবেন না। এই ভাবেই এসেছে সমুদয় মাতৃ-প্রতীকের পূজা। কাজেই সব মাতাই ধরেছেন মূলত একরূপ। পিতারা এসেছেন এই সব মাতৃভাণ্ডে বীজ প্রক্ষেপক রূপে। প্রথম আমলে তাই তাঁরা নৈর্বক্তিক, শবরূপী শিব। ক্রমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আওতায় তাঁদের প্রতাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন তাঁরা হয়েছেন সৃষ্টিকর্ত্তারূপী ব্রহ্মা, পালনকর্তারূপী বিষ্ণু এবং সংহারকরূপী শিব। মাতৃত্বের নির্বাধ গরিমা তখন সঙ্কুচিত হয়েছে, তার স্থানে এসেছে পিতৃ-লিঙ্গের ব্যাপক আরাধনা। শক্তিবাদ এইভাবে শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছে।

পশুপতি শিব, গণপতি গজানন, আর প্রজাপতি ব্রহ্মা তাই লিঙ্গরূপী পরমেশ্বর হয়েই সর্বজনের পূজার বিষয়ীভূত হয়েছেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার বোধহয় ব্যাপক পূজা-পদ্ধতি কোথাও প্রচলিত নেই। যে দু-তিনটি ব্রহ্মামূর্তি দেখার সুযোগ হয়েছে, তার একটিতে দেখেছি, অর্ধ-বিকশিত শতদলের ভেতর ধ্যান স্তিমিতনেত্রে দণ্ডায়মান চতুরানন ব্রহ্মা দুই হাতে উচ্ছি্ত সাধন ধারণ করে আছেন। আর একটিতে যোগাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মার দিকে মুখ করে, আলুলায়িত কুন্তলা এক তরুণী তাঁর দুই জানুতে দু-পা রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছেন। জানি না, ইনিই তাঁর মানস-কন্যা সন্ধ্যা বা উষা কিনা! কারণ-সমুদ্রে আপন তেজ নিক্ষেপ করে ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, প্রথম মূর্তিতে বোধহয় এই তত্ত্বটি বোঝানো হচ্ছে। আর আপন মানস-কন্যায় উপগত হয়ে তিনি প্রজা সৃষ্টি করেছেন, এটা বোধহয় বোঝানো হচ্ছে দ্বিতীয় মূর্তিতে। হংসীরমণ নিরত ব্রহ্মার আর একটি চিত্রও দেখেছি একখানি তাম্রফলকে। অধ্যাপক কৃপাশরণ বলেছেন, এ ব্রহ্মা অনার্য। বস্তুত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং তাঁদের প্রকৃতিরা সবাই আদিতে অনার্য, কালক্রমে তাঁরা আর্য সংস্কৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন, এই হল অনেকের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ে এই যৌনাশ্রয়ী হিন্দুধর্ম সাময়িক ভাবে ঘা খেয়েছিল। কিন্তু নির্বিশেষ তত্ত্ববোধ ও ব্যবহার-বিশুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধাচারকে শেষ পর্যন্ত তন্ত্রাচার গ্রাস করে ফেলল এবং বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের মতবাদ মহাযান, হীনযান, বজ্রযান, নানা শাখা-প্রশাখা আশ্রয় করে রকমারি উৎকট ও উদ্ভট যৌন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই প্রকাশমান হল।

তথাকথিত সহজিয়াবাদ জন্মাল এই থেকেই এবং পুরাতন লিঙ্গপূজাই আবার ফিরে এল নূতন রূপ ও নাম নিয়ে। তান্ত্রিকদের ভৈরবী-চক্রই রূপান্তরিত হল বৌদ্ধদের বিহার ও সঙ্ঘারামে এবং তাঁদের অনুসৃত অঙ্গশুদ্ধি, লিঙ্গশুদ্ধি, ভূতসিদ্ধি, মকরসিদ্ধি, অঘোর পন্থা, অশোক পন্থা, অনেক কিছু কদর্য জিনিষ এসে, পুরানো বৌদ্ধধর্মের আনুষ্ঠানিক সরলতা আবিল করে ফেলল। এই কদাচারের বিরুদ্ধে আর একবার প্রতিরোধের আন্দোলন এল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তরফ থেকে। কামকেন্দ্রিক মাতৃ-পূজা পরিহার করে, তারি ভিত্তির ওপর তাঁরা প্রেমকেন্দ্রিক কৃষ্ণ-পূজা প্রবর্তন করলেন। পিতৃ ত্রি-মূর্তির অন্যতম রূপে বিষ্ণু বা নারায়ণ অনেক আগে থেকেই পূজা পেয়ে এসেছেন এবং তাঁর ও তাঁর প্রকৃতি লক্ষ্মীর যুগল প্রতীক পুরাতন শিব-শক্তি প্রতীকের মতোই

এদেশে যথাসম্ভব প্রচারও লাভ করেছে। তারি রূপান্তরভেদ করলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা, রাধা-কৃষ্ণের যুগল আরাধনা প্রবর্তন করে। সেই যৌন-মিলনই রয়ে গেল পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থলে, আর ওপরে ওপরে গড়ে উঠল একটা প্রেম-ভক্তি মিশ্রিত মতবাদের পরিমণ্ডল! অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ সহজিয়াবাদেরই অন্যতম শাখারূপে জন্মাল এবং সেই পুরানো যৌনতাতেই ফিরে এল দেখতে দেখতে।

ন্যাড়া-নেড়ী, কর্তাভজা, আউল, বাউল, কত সম্প্রদায় গজিয়ে উঠল চারিদিকে এবং রকমারি ছদ্মনামে যৌন কদাচারের পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগল। শ্রীচৈতন্যের প্রজ্ঞা ও প্রেমতত্ত্ব নিষ্ফল হয়ে গেল, ঠিক বুদ্ধের আচার-বিশুদ্ধি ও মৈত্রী-দর্শনের মতোই। আসলে আমাদের মজ্জাগত লিঙ্গপূজার অভ্যাসই টিঁকে গেছে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। যোগীদের জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তদের প্রেমমার্গ তত্ত্বচিন্তার উৎকর্ষ হিসাবে সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা জন-মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। যোগসাধনার নামে তাই কতকগুলি ম্যাজিক এবং লিঙ্গশাসন, কুম্ভক মৈথুন প্রভৃতি কতকগুলি যৌন কদাচারই হয়েছে জ্ঞানমার্গের অবলম্বন, আর কিশোরী ভজন, নারীর কৃত্রিম পুরুষত্ব গ্রহণ, অথবা পুরুষে নারীত্ব আরোপ করে তাকে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে প্রকৃতি জ্ঞানে তার সঙ্গে সংসর্গ স্থাপন হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রেমধর্মের বনিয়াদী লক্ষণ! প্রাগৈতিহাসিক কালের animism থেকে বরাবর লক্ষ্য করে গেলে, আমাদের ধর্মবোধ যে যৌনবোধের ওপরই প্রতিষ্ঠিত, একথা কি এর পরও আর বুঝতে বাকী থাকে? কিন্তু আগেই বলেছি যে অনেক দিনের অভ্যাসে বিচারবুদ্ধি আমাদের নিরস্ত হয়েছে বলেই, কোন জিনিষ আমরা তলিয়ে দেখি না। কৌশলী তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতাদের ব্যাখ্যানকেই আমরা অভ্রান্ত বলে গ্রহণ ও বিশ্বাস করি।

আসলে যে-সব শাস্ত্রগ্রন্থের মাধ্যমে আমরা হিন্দুধর্ম বুঝি ও বোঝাই, তার মধ্যেই আমাদের ধর্ম-সংস্থিতির আদিসূত্র নিহিত আছে। উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ ও ভাগবত যাঁরা সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে পড়বেন, তাঁরাই দেখবেন, অনাচার, ব্যভিচার ও যৌন বিকৃতাচারের এমন কোন দিক নেই, যাকে না শাস্ত্রকাররা সাগ্রহে ও সসম্মানে স্বীকার করেছেন। ছলনার দ্বারা গুরু-পত্নী হরণ ও বলপূর্বক দেবকন্যা রমণ থেকে সুরু করে, পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র এবং ভ্রাতা-ভগিনীর সম্মতিমূলক সম্মেলন পর্যন্ত, বহিরঙ্গিক ও আন্তঃপুরিক

ব্যভিচারের সমস্ত দিকই অবাধে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে প্রতিকল্প রমণ, হননাত্মক রমণ ও রকমারি কদাচার বিকৃতাচারের কাহিনী। এই রকম শাস্ত্রগ্রন্থের পটভূমিতে নিবদ্ধ বলেই ধর্মসংস্থিতি আমাদের কামকেন্দ্রিক হয়েছে, না কামকেন্দ্রিক ধর্মব্যবস্থাকে সহণীয় ও গ্রহণীয় করার জন্যেই এই সব শাস্ত্র লেখা হয়েছে, তা নিয়ে তর্ক তুলে লাভ নেই। প্রাচীন ইহুদী, মিশরী, চীনা, প্রাক-ইসলাম আরবী ও গ্রীক ধর্মপুরাণ এবং ধর্ম-প্রতীক ও পূজা-পদ্ধতির মধ্যেও একই রকম লৈঙ্গিকতার রূপ সর্বত্র বিকট ভাবে পরিদৃশ্যমান।

খৃষ্টান ধর্ম বলিষ্ঠতর নীতি-বিশুদ্ধির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল, তাই তাতে যৌনশাসনের আদর্শটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক মিষ্টিকদের মধ্যেও কালক্রমে এল কান্ত ভাবের সাধনা। নয় কুমারীর বিরহ, বাসক-সজ্জা ও ভাব-সম্মেলন জাতীয় আধা-বৈষ্ণবী অনুষ্ঠানগুলি আস্তে আস্তে খৃষ্টীয় ধর্মায়তনে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। চিরকুমার যীশুর নামকে মারী মাদলিনের নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে, দ্বৈত ভাবের ভজনাও আরম্ভ হয়ে গেল। এই দ্বৈত মিলনের প্রতীক রূপেই নাকি ক্রুশকাষ্ঠে লিঙ্গত্ব আরোপিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে খৃষ্টীয় ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ ও ভগিনী-সঙ্ঘেও শেষ পর্যন্ত যৌন কদাচার প্রবল হয়েছে, ঠিক ন্যাড়া-নেড়ীদের আখড়ার মতোই। ঐশ্লামিক সাধক সঙ্ঘের যে অংশ সুফীবাদকে গ্রহণ করলেন, তাঁরাও একেশ্বর তত্ত্ব বা 'আন্নল হক' তত্ত্বকে পরিহার করে, চলে এলেন দ্বৈত সাধনের আওতায় এবং সাকি-সরাপের জয় গানে মুখরিত হয়ে উঠল আলিমদের সাধনকেন্দ্র গুলি। এই সাকি-সরাপের ওপরও রকমারি রূপক চাপানো হয়েছে, যেমন হয়েছে বৈষ্ণবদের অষ্টসখীর ওপর, শাক্তদের বামা ও কারণ-বারির ওপর, খৃষ্টানদের নয় কুমারীর এবং ধূপ, দীপ ও ক্রুশের ওপর।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে হিন্দু, সুফী, খৃষ্টান, তিন ধর্মেই কান্ত ভাবের সাধনা যে মূলত একপথে প্রবাহিত হয়েছে, এতে অনেকে অনুমান করেন, সমগ্র এশিয়া মণ্ডলেই একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রচলিত ছিল, যা বিভিন্ন ধর্ম-প্রতীক ও পূজা-পদ্ধতির মাধ্যমে মূর্ত হয়েছে। মধ্যযুগীয় ধর্ম সাধনার তুলনামূলক আলোচনা থেকে এই তথ্যের সত্যাসত্য নিরূপিত হবে। সে আলোচনা আপাতত আমার প্রসঙ্গের বাইরে। শুধু এইটুকু বলে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে কোথাও প্রচ্ছন্ন ভাবে, কোথাও বা প্রকট ভাবে সব ধর্মই উৎসারিত হয়েছে যৌনাত্মক দেব-পরিকল্পনা থেকে এবং দেবতার আচার ও

অভ্যাস উপাসকদের কর্মের মধ্যে সঞ্চারিত ও রূপায়িত হয়েই গড়ে তুলেছে সমুদয় পূজোপকরণ ও পূজা-পদ্ধতি।

হিন্দুধর্মের মৌলিক উপাদান আশ্রয় করে যে সব উপধর্ম ও লোকধর্ম দেখা দিয়েছে, তাতেও এই তত্ত্বটিরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা করা যায়। মনসা, শীতলা, ওলা, ষষ্ঠী, মেলানী, ভাদু, টুসু, বড়াম, রকমারি গ্রাম্যদেবতার পূজা বাংলা দেশে প্রচলিত আছে। এঁরা সকলেই মাতৃ-দেবতা এবং এঁদের পূজা পদ্ধতিতে শক্তিপূজার অনুরূপ বিধি-ব্যবস্থারই নির্দেশ আছে। মেলানী, ভাদু, টুসু প্রভৃতি ঠাকুরাণীরা একেবারেই অর্বাচীন। কোন ইদানীন্তন পুরাণ বা উপপুরাণেও এঁদের উল্লেখ নেই। বাংলার বহু স্থানেই এই সব অকুলীন দেবীর পূজা মদ্য ও মৈথুন সহযোগে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মুষ্টিমেয় পুং-দেবতাও আছেন। তাঁদের পূজারও রকমারি উদ্ভট ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যাবে, সুন্দরবনে ও ভাঁটি অঞ্চলে।

আমাদের সমাজ-জীবন এই রকম ধর্মবোধের ওপর সংস্থাপিত বলেই, আমাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি পর্বেও তাই যৌন-কেন্দ্রিকতার ছাপ সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত। জাতকর্ম, উপনয়ন, বিবাহ, বিবাহিতা কন্যার প্রথম ঋতু, গর্ভাধান, পুংসবন, সাধভক্ষণ, যে-কোন অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করুন, তাতেই দেখবেন, হয় স্থূল নয় সূক্ষ্মভাবে যৌনতাকে স্বীকার করা হয়েছে। গভবতী নারীর কোমরের কসি আলগা করে, তার নাভির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে একটি অঙ্গুরীয়ক নিক্ষেপ করা এবং সেটি চিত হয়ে বা কাত হয়ে মাটিতে পড়ার দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান কন্যা হবে, না পুরুষ হবে, ঠিক করার যে অনুষ্ঠানকে পুংসবন বলে, অথবা গর্ভবতী কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার উপহার দেওয়া ও সুখাদ্য খাওয়ানোর যে উৎসবকে সাধ বলে, তার নির্গলিতার্থ কি?

বিবাহিতা কন্যা প্রথম ঋতুমতী হলে, তাকে একান্তরিত করে রাখা এবং চতুর্থ দিন স্নান করিয়ে স্বামীর ঘরে তাকে ঋতু রক্ষার জন্যে পাঠানো প্রকৃতপক্ষে কি উপজাতীয়দের ভেদন পর্বেরই সংশোধিত সংস্করণ নয়? উপবীত সংস্কারের দ্বারা দ্বিজাতীয় কুমারদের দ্বিতীয় জন্মে উন্নীত করার জন্যে তাদের যে ভগাকৃতি খিলানের তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তা কি প্রকৃত পক্ষে আর একবার গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসারই রূপক নয়? বিবাহকালীন রকমারি স্ত্রী আচারে, যথা কন্যার হাতে লাটামাছ ও ভরাঘট তুলে দেওয়া, তাকে

কলাতলায় অনাবৃত পৃষ্ঠ করিয়ে পাত্র কর্তৃক পিঠে সিঁদুরের পুতুল আঁকানো, কৌমার্য ভেদের স্মারক চিহ্নরূপে তার সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা টেনে দেওয়া, পাণি-গ্রহণের পর থেকে যাতে পরস্পরের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয়, তার উপায় স্বরূপ বিবিধ বন্ধ-ধন্দ প্রয়োগ করা, যথা পাত্রীর মূত্রসিক্ত ন্যাকড়া জ্বালিয়ে পাত্রের মাথা টপকে ফেলে দেওয়া, পাত্র-পাত্রীকে বাসর ঘরে বসিয়ে কড়ি খেলানো, পরস্পরকে এক চাদরে বাঁধা ও এক পাত্রে পান-ভোজন করানো ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর মধ্যেও কি আদিম মানুষের যৌন অভ্যাসকেই মেনে নেয়া হয় নি ?

এরি সূত্র ধরে স্বামী পরিত্যক্তা, বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা নারীর সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক ইত্যাদির অনুষ্ঠান, মাদুলি, চুলপড়া, তেলপড়া, ধূলোপড়া ইত্যাদি ব্যবহার, দেবস্থানে হত্যা দেওয়া ইত্যাদি অভ্যাসগুলি ধর্মব্যবস্থায় অনুমোদিত হয়েও কি প্রকৃতপক্ষে যৌনাচারকেই তলায় তলায় অনুসরণ করে না ? অরক্ষণীয়া কুলীন কন্যাদের কুলগাছ, বেলগাছ, অথবা দাদামশায় সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাত-পাক ঘুরিয়ে দেওয়া, কোন-কোন সমাজে এই শ্রেণীর মেয়ে কুমারী অবস্থায় মারা গেলে, কোন ব্রাহ্মণ কুমারের সঙ্গে তার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ দেওয়া, দুজনকে কিছুক্ষণ এক ঘরে আবদ্ধ রাখা, তারপর দুজনকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া এবং একজনকে পোড়ানো, অন্যজনকে ঐ কন্যার ব্যবহৃত বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে বিতাড়িত করা ইত্যাদির কথাও সম্ভবত অনেকেই অবগত আছেন। অবিবাহিত ছেলেদের যে খোলা ছাদে বা নির্জন স্থানে একা থাকতে ঠাকুমা-পিসিমারা নিষেধ করেন, বলেন, পরীতে ধরবে, এর কারণ কি ? কারণ ঐ অতৃপ্তা কুমারীদের ভয়! তাঁদের বিশ্বাস, ওদের আত্মা প্রেতরূপ ধরে আইবুড়ো ছেলেদের পিছু পিছু ঘোরে এবং একলা পেলেই এসে ধরে। তাই একদা এই সব ছেলের কোমরে ঘুনসী ও চাবি রাখার রেওয়াজ ছিল, এখনো কিছুটা আছে। দক্ষিণের নাম্বুদ্রী সম্প্রদায় এই জন্যে অতৃপ্তা কুমারীর পার্থিব দেহেই অতৃপ্তি বিদূরণের ব্যবস্থা করেছেন, মরণোত্তর বিবাহের রীতি প্রবর্তন করে। বাংলা দেশে এবং উড়িষ্যাতেও কোথাও কোথাও এই প্রথা আছে।

মরণোত্তর অনুষ্ঠান সমূহে, বিশেষত শ্রাদ্ধে এই আদিম অনুযৌন অভ্যাসের কিছু কিছু ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে। চিতাশয্যায় নারীকে চিৎ ও পুরুষকে উপুড় করে শোয়ানো, মৃত্তিকারূপী মাতৃযোনিতে অস্থিচূর্ণ প্রোথিত করে তা

গঙ্গায় নিক্ষেপ করা এবং প্রবহমান জল-ধারার ভেতর দিয়ে পুনর্জীবনের প্রতিশ্রুতি আহ্বান করা, বা জলাশয়ের ধারে লিঙ্গরূপী বৃষকাষ্ঠ স্থাপন করাও একই মনোবৃত্তির পরিচায়ক। লোকান্তরিত প্রেতের সূক্ষ্ম দেহে অপত্য-ধারার ভেতর দিয়ে অনুপ্রবাহিত হয়ে আসার অনুকূলে কৃত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও সেই যৌন-কেন্দ্রিকতাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রমাণিত করে। অর্থাৎ ধর্মের জন্মই যৌনবোধ থেকে এবং ধর্ম-ব্যবস্থিত সব কিছু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানই আমাদের আবর্তিত হচ্ছে যৌনবৃত্তির অয়নকে কেন্দ্র করে, এই হল মোটা কথা। এটা ভালো কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত, সে বিচার আমার জন্যে নয়। আমি শুধু তত্ত্বটি বোঝাতে চেয়েছি। যেহেতু এই তত্ত্বটি উপলব্ধি না করলে, আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তরঙ্গ রূপটি পুরোপুরি কেউ ধরতে পারেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মচর্য না যৌনসংহার

আমাদের দেব-পরিকল্পনা, পূজা-পদ্ধতি, ধর্মাচার ও ধর্মসম্মত সমাজাচারে যৌনতার প্রতিপত্তি কত অধিক, ধর্মের নামে সমাজের নানা স্তরে কি ভাবে অবাধ যৌনচর্চা চলে আসছে, ইতিপূর্বের অধ্যায়ে আমি তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও তার আন্তর্নিহিত তত্ত্ববিজ্ঞান যে আগাগোড়াই যৌনবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা এই আলোচনায় আশা করি প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এর উল্টো দিকটাও আলোচনার যোগ্য। দেখানো দরকার যে ধর্মের নামে যৌনসংহারের উদ্যমও দেখানো হয়েছে প্রচুর, এখনো হয়ে থাকে এবং খুব বড় একটা দলই তারও সমর্থক। বলাই বাহুল্য, আমি যোগী, ব্রহ্মচারী বা উর্ধ্বরেতাদের কথা বলছি।

কামবৃত্তি এঁদের মতে স্থূল পশুবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করতে না পারলে নাকি নর-নারীর কোন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতির বা মুক্তি লাভের আশা নেই। এঁরা তাই কাম-ক্রোধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ধর্মগুলি সমূলে সংহার করে, জান্তবতার উর্ধ্বে ওঠার সাধনা করেন। কাম-কাঞ্চনত্যাগী এই সব উর্ধ্বরেতারা বলেন যে সমগ্র মনন ক্রিয়াকে যৌগিক উপায়ে কেন্দ্রায়িত করে, ব্রহ্মাভিমুখে প্রসারিত করলে, জন্মায় এমন একটা ষষ্ঠেন্দ্রিয়জাত শক্তি, যা অদৃশ্যকে দেখার, অশ্রোতব্যকে শোনার, অজ্ঞেয়কে জানার উপায় স্বরূপ। সেই তুরীয় বা লোকোত্তর স্তরে পৌঁছলে, তবেই নাকি জীবের মুক্তি। তখনই নাকি জীবাত্মা সত্যি সত্যি পরমাত্মায় গিয়ে লীন হয়।

বস্তুত যোগের দ্বারা এই সব দুর্লভ শক্তি লাভ হয় কিনা এবং হলে তাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য মিলন সংঘটিত হয় কিনা, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। বাস্তবতা-সম্মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করে, এ সমস্যার মীমাংসা করা যাবে না। বরং এটাই প্রমাণিত হবে যে এই মতবাদের পেছনে কোন সত্যের ভিত্তি নেই, এর স্থিতি প্রচলিত বিশ্বাসের ওপর। কিন্তু সেই বিচারে প্রবৃত্ত হবার আগে এঁদের যুক্তিধারা অনুসরণের প্রয়োজন আছে। পতঞ্জলির যোগ-দর্শন সূত্র বলেছেন, ব্রহ্মচর্যে স্বপ্রতিষ্ঠ হলে বীর্যলাভ

হয়। বীর্যলাভের দ্বারা আসে শম, দম প্রভৃতি গুণাবলী, যা পূর্ণতার দ্যোতক, আর এই সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতাই হল ব্রহ্মে পৌছানোর একমাত্র পাথেয়।

কাম-ক্রোধ প্রভৃতি জৈববৃত্তির দাসত্বে আত্মসমর্পণ করলে, নর-নারীর এই স্বাভাবিক পূর্ণতা ব্যাহত হয় এবং সহজ শক্তি একবার অপচিত হলে, আর তা পূরণের আশা নেই। ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে, সেই সহজ শক্তির ভাণ্ডার পূর্ণ রাখাই হল যোগমার্গে সাফল্যের প্রথম সোপান। এই সঙ্গেই এঁরা বলেন যে শীতাতপ, ব্যাধি ও অন্যান্য কারণে শরীরের যেটুকু ক্ষয় জীবমাত্রেরই হয়ে থাকে, যোগীর তা হয় না। প্রথমত তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কোন অস্তিত্বই নেই, তা মায়া মাত্র। দ্বিতীয়ত মস্তিষ্কের ব্রহ্মকূট থেকে অতি ক্ষীণ ধারায় যে অমৃত-বিন্দু উৎসারিত হচ্ছে, যৌগিক প্রক্রিয়ায় রসনাকে তার উৎসমুখে সংলগ্ন করে রাখার ফলে, সেই অমৃত-ধারাই তাঁর শরীর পোষণ ও কান্তি বৃদ্ধির সহায়তা করে। তাঁর স্নান-পান, আহার, নিদ্রা, কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। নিত্য নির্মুক্ত আত্মারূপে তিনি অহর্নিশি ব্রহ্ম-চিন্তায় তদ্গত থাকেন। তারপর একদিন সহস্রার বিকশিত হয়, ঘটাকাশরূপী দেহ ত্যাগ করে প্রাণসত্তা সেদিন চিদাকাশরূপী অনন্তে বিলীন হয়।

এই হল মোটের ওপর যোগের তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস রাখেন, এই তত্ত্বের নির্দেশানুযায়ী ন্যাস, প্রণায়াম, ব্রহ্মচর্য, ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করেন, এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। সাধারণ নর-নারীকে তাঁরা মোহমুগ্ধ বিষয়ী জীব বলে উপেক্ষা করেন। ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে তাঁরা পশুবৃত্তি বলে অভিহিত করেন। পার্থিব উন্নতি ও সমৃদ্ধিকে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতিকে তাঁরা তমোগুণাশ্রিত বিষয়-কার্য জ্ঞানে এড়িয়ে চলেন। ইন্দ্রিয় বৃত্তি ও বাস্তব সুখ-দুঃখের অধীন সাধারণ মানুষের কাছে এঁরা তাই অতি-মানুষরূপে পূজো পান। এঁদের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ ও অবাস্তব উপদেশাবলী অক্ষুণ্ণ নিষ্ঠায় শ্রবণ ও গ্রহণ করাই হল দুর্বলচিত্ত সাধারণ মানুষের নিত্যকার অভ্যাস। না হবে কেন? সকলেই মনে করেন, পার্থিব মায়া-মোহ ও সুখ-দুঃখ বোধকে অতিক্রম করা, বা দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি গুলিকে প্রতিহত করার মতো দুর্জয় শক্তি যাঁরা অর্জন করেছেন, তাঁরা নিশ্চয় মহামানুষ এবং সে রকম মানুষরা যে সহজ বিশ্বাসী সাধারণ লোকের কাছে ঈশ্বরজনিত পুরুষ রূপে গৃহীত হবেন, এতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

তবে আশার কথা যে এঁদের যোগ-বিভূতি বা সাধন-বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে

লোকের শ্রদ্ধা বা আস্থা যতই বেশী হক, কার্যত এঁদের পন্থানুসরণ করেন না লাখে একজনও। সব মানুষই যদি ইন্দ্রিয়ধর্ম নিরোধ করে শুদ্ধ সমাহিত অবস্থায় উন্নীত হতে চেষ্টা করত, ব্রহ্মচর্য হানিকে মহাপাপ বলে গণ্য করত, কামিনী-কাঞ্চনকে ত্যাজ্য জ্ঞান করত, শিল্প, সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ব্যবহারিক জগৎকে ভাবত মিথ্যা মায়া বলে, তাহলে জগতে মানুষ বলেই ত কোন জীব থাকত না। পৃথিবী হত অরণ্যময় স্থান, হিংস্র শ্বাপদের বাসভূমি। কাজেই পরিকল্পনার দিক থেকে যোগীদের লক্ষ্য বা কর্মপন্থা যত মহৎ, যত পবিত্রই হক, বাস্তবতার বিচারে তার সার্থকতা কিছুই নেই। সর্ব-সাধারণের কোন প্রয়োজনই নেই এ সবে। কোন কল্যাণও হতে পারে না এতে তাঁদের।

তাছাড়া এঁদের প্রচারিত তত্ত্বকথার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, এ কথা ত আগেই বলেছি। মানুষের চেতনা স্থুল বস্তু-সীমাতেই আবদ্ধ। তার বাইরে শিবলোক বা ব্রহ্মলোক জাতীয় কোন দিব্য-স্তরকে সে কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি করে নিতে পারে অবশ্য। কিন্তু সে ত-কবি-কল্পনা ছাড়া কিছু নয়! কাজেই প্রত্যক্ষ বস্তু-স্তরকে অতিক্রম করে, তথাকথিত ষষ্ঠেন্দ্রিয়জাত দিব্য-স্তরে গিয়ে কূটস্থ হওয়া শরীরী জীবের পক্ষে অসম্ভব। মানুষের দৈহিক ও মানসিক সত্তার ওপর বস্তু-জগতের প্রভাব এবং বস্তু-জগতের ভেতর ইন্দ্রিয়-ধর্মের পরিব্যাপ্তি অস্তিত্বের স্বধর্ম অনুযায়ী এমনি অনতিক্রমণীয় ও অনিবার্য যে একে অস্বীকার করে যাওয়া সহজও নয়, সম্ভবও নয়। জোর করে এই বাস্তব বৃত্তি সমূহ নিরোধ করলে, সেগুলো নিগৃহীত হয় বটে, কিন্তু নির্মূলিত হয় না। নানা কুৎসিত ও অনুচিত পথেই তা প্রকাশমান হয়, যা হয়ে থাকে সাধারণত এই সব উর্দ্ধরেতা নামধেয় যোগীদের জীবনে। কিন্তু সে কথা পরে।

অন্যান্য বৃত্তির চেয়ে কামবৃত্তির উপরই এঁদের রাগটা বেশী। তাই কামবৃত্তি সংহারের জন্যে এঁদের তোড়জোড়ের আর অন্ত নেই। সাধারণ ভাবে কৌপীন পরে কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বা উত্থান নিরস্ত করা হল সকলেরই অভ্যাস। কিন্তু কৌপীনের চেয়ে কামের শক্তি বেশী, তাই কাঠের তক্তি বা লোহার তার দিয়ে জননেন্দ্রিয়কে শৃঙ্খলিত করে রাখতেও দেখা যায় অনেককে। একজন সিদ্ধবাবাকে দেখেছি, লিঙ্গের অগ্রভাগে একটি লোহার কড়া পরিয়ে রাখতে। আর একজনকে দেখেছি, চর্মাবরণ ছিদ্র করে একটি দড়ি পরিয়ে রাখতে। একজন 'উদাসীন' সারারাত্রি প্রকাণ্ড একটি গামলায় গরম জল

ঢেলে, তার ভেতর কোমর ডুবিয়ে বসে থাকতেন। একজন তান্ত্রিক যোগী বলেছিলেন, কামোদ্রেক বা রেতস্খলনের ভয়ে তিনি জ্বলন্ত কলিকা দিয়ে জননেন্দ্রিয়ে যখন-তখন ছ্যাকা দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া জননেন্দ্রিয়ের অর্ধাংশ বা অণ্ডকোষদ্বয় ছেদন করে ফেলা পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যের উপায় হিসাবে অবলম্বিত হবার দু-চারটি নিদর্শন আছে।

নাগা সন্ন্যাসীদের ভেতরও কাম-নিগ্রহের অনেক রকম অভ্যাস প্রচলিত থাকতে দেখেছি। একজন নাগাকে দেখেছিলাম, দড়ি দিয়ে একটা লোহার চিমটে জননেন্দ্রিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে। এই ভার বহনের জন্যই কিনা জানি না, তাঁর ঐ অঙ্গের আবয়বিক দৈর্ঘ্য ও স্ফীতি সাধারণ মানুষের প্রায় দ্বিগুণ। আর একজন নাগাকে স্খলিত বীর্য ডান হাতের তালুতে নিয়ে উদরস্থ করতে দেখা গেছে। এঁরা নিষ্কলুষ ব্রহ্মচর্যকে আদর্শ বলে মনে করেন, তাই স্বপ্নে বা সাময়িক উত্তেজনায় হঠাৎ বীর্যপাত হয়ে গেলে, তা পান করে নেন। অজ্ঞতা বশেই অবশ্য এঁরা মনে করেন যে স্খলিত বীর্য আবার স্বস্থানে ফিরে যায়। তা যায় না, পাকস্থলীর মধ্যে গিয়ে তা আবর্জনা স্তূপে সঞ্চিত হয়।

বহুজন সম্মানিত এক মৌনীবাবাকে একদিন উন্মাদের মতো নদীর ধারে ছুটোছুটি করতে ও সেই সঙ্গে অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত প্রসারিত করে মনে-মনে কি বলতে দেখি। কিছুক্ষণ পরে বাবা রৌদ্রতপ্ত বালুকার উপর শুয়ে পড়লেন এবং গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তারপর উঠে স্নান করলেন এবং হাসি-হাসি মুখ করে স্বস্থানে চলে গেলেন। ভক্তদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কামোদ্রেক হলেই বাবা ঐ রকম করেন। এ নাকি তাঁর মতে পশু-তাড়না। বিড় বিড় করে যা বলেন, সে হল পশুরূপী কামকে ভৎ'সনা। আর একজন ব্রহ্মযোগী প্রতিদিন পাথর বাটিতে দুধ, কলা ও চিনি মিশিয়ে তার ভেতর যৌনাঙ্গ ন্যস্ত করতেন, তারপর বিবস্ত্র অবস্থায় মেঝেয় পড়ে থাকতেন এবং চতুর্দিক থেকে পিঁপড়ে এসে ঘিরে ধরত সেই দুগ্ধ-শর্করা লিপ্ত অঙ্গকে। তিনি সানন্দে সেই দংশন যন্ত্রণা সহ্য করতেন, লিঙ্গকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে বলে। একজন ব্রহ্মচর্য রক্ষার বিঘ্ন জ্ঞানে লিঙ্গের ওপর ইষ্টকাঘাত করেছিলেন এবং সেই থেঁৎলানো লিঙ্গ উন্মুক্ত করে পথে পথে ঘুরতেন।

বস্তুত এই সব উৎকট ও উদ্ভট উপায়ে লিঙ্গ-শাসনের পেছনে একটি মাত্র মনোভাব আছে: সে হল এই যে কামবৃত্তি অতি মন্দ জিনিষ, একে উৎখাত না করলে কোন দিন মোক্ষলাভ হবে না। সুতরাং যে রকম করে পারো, একে

নিগৃহীত করো। কিন্তু এঁরা জানেন না যে কামবৃত্তির অভিব্যক্তি জননেন্দ্রিয় দিয়ে হলেও, তার মূলাধার মন। সেই মনকে সংযত করাই হল দেহকে সংযত করার প্রধান উপায়। দুঃখের বিষয়, বাসনারূপী মন থেকে কামকে উচ্ছিন্ন করা যায় না। সে যথাস্থানে বসে উদ্দীপনা সঞ্চার করেই চলেছে, আর না বুঝে, অকারণ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করেই এঁরা মনে করছেন, বুঝি তাকে আয়ত্তে এনেছেন। আসলে জন্মলগ্নেই মানুষ প্রকৃতির কাছে পায় যে-সব মৌলিক অনুপ্রেরণা, যৌনবৃত্তি তার অন্যতম এবং হয়ত প্রধানতমই। অস্তিত্বের সমস্ত অণু-পরমাণু ব্যাপ্ত করে কামবৃত্তি রয়েছে আদ্যাশক্তি রূপে বিদ্যমান। তাকে উচ্ছিন্ন করব বললেই করা যাবে কেন? কাজেই অবাস্তব শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করার নামে অঙ্গ নিপীড়ন করেই ব্রহ্মচর্যের মান রাখতে হয়।

নারীদের মধ্যে যোগাচার অনুষ্ঠানের নিদর্শন কম। তবে নাগিনী, যোগিনী, উদাসিনী শ্রেণীর নারী-ব্রহ্মচারিণীও কিছু আছেন এবং তাঁরাও নিষ্কলুষ ব্রহ্মচর্য রক্ষার জন্যে রকমারি উপায় অবলম্বন করে থাকেন। সাধারণ ভাবে তাঁরাও কৌপীন ধারণ করেন। কেউ কেউ কাঠের বা চামড়ার নেংটিও সম্বাধের উপরিভাগে সংশ্লিষ্ট করে রাখেন। অনেকে নারকেল ছোবড়া বা এই জাতীয় কোন অস্বস্তিকর জিনিষ প্রবেশ করিয়ে, তার ওপর কৌপীন পরেন। এই ভাবে স্থায়ী যন্ত্রণা বিধানের দ্বারাই নাকি কামোদ্রেক প্রতিহত হয়।

একজন মাতাজী প্রত্যহ ঐ পরিমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ গোবর লেপন করতেন এবং সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র একটি গামছা পরে দ্রুত পায়ে উঠানে পায়চারি করতেন। পদচারণার বেগ প্রশমিত হত বিশ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে। তখন তিনি অবগাহন করতেন। খুব সম্ভব উত্তেজনা দমনের ঔষধ হিসাবেই ভিজা গোবর ব্যবহার করতেন তিনি। দ্রুত পদচারণার অভ্যাসটি দেখে অন্তত তাই মনে করা যেতে পারে। আর একজন 'উদাসিনী' প্রভূত সাজ-সজ্জা ও বিলাস-ব্যসনের মধ্যেই ব্রহ্মচর্য ও ঈশ্বরচিন্তা করতেন। শুনেছি, রূপবান ধনী স্বামীকে তিনি বর্জন করেছিলেন, তাঁর কামনা সহ্য করতে পারেন নি বলে। কামলিপ্সা অন্তরে পোষণ করে যে-সব দুষ্ট তাঁর ভক্ত হত, তিনি তাদের দিকে নাকি তাকালেই বুঝতে পারতেন এবং সদুপদেশ মিশ্রিত তিরস্কারে তাদের চৈতন্য উদ্রিক্ত করতেন। এই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ব্রহ্মচর্যে তিনি স্থিরপ্রতিষ্ঠ হতে পেরেছেন কি না? মহিলাটি তাতে অসঙ্কোচে বলেন যে কামনা মাঝে মাঝে তাঁকেও অভিভূত করে। কিন্তু

কি ভাবে তাকে দমন করেন, সে কথা তিনি কিছুতেই বলতে চান না। বলেন, ও-সব সাধনমার্গের কথা আপনারা বুঝবেন না, বুঝলেও বিশ্বাস করবেন না।

দুই কানে পিতলের মাকড়ি পরানো একটি হৃষ্টপুষ্ট বিড়ালীকে তিনি অন্ন দিয়ে পুষতেন। কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতেন। এই বিড়ালীকে তিনি চমৎকার শিক্ষা দিয়েছিলেন। অনেকের ধারণা, একেই তিনি ব্যবহার করতেন। এই অনুমানের প্রমাণ রূপে আরো কয়েকটি নারী-ব্রহ্মচারিণীর কথা উল্লেখ করতে পারি। গুমগড়ের শ্মশানেশ্বর মন্দিরের পেছন দিকে এক আধা-ভৈরবী সন্ন্যাসিনীকে দেখেছিলাম। সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা অবস্থায় দিবারাত্রি তিনি ভূমিশয্যায় শুয়ে থাকতেন। যে যা দিত নির্বিচারে খেতেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় দৃকপাত ছিল না, মল-মূত্র ক্ষেপে ছিল না কোন সঙ্কোচ বা সতর্কতা। সকলকে বলতে শুনলাম, উনি মা-কালীর অবতার এবং নাকি বাকসিদ্ধা। তাঁকে কথা বলতে শুনিনি, নড়তে চড়তেও দেখিনি। একটি বলিষ্ঠাকায় দেশী কুকুরকে দেখেছি সর্বদা তাঁর পাশে বসে থাকতে এবং মূত্র-পুরীষাদি ক্ষেপণের পরই সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবেগে লেহন করতে। এই কুকুরটিকেও শিবভক্ত জ্ঞানে অনেকে সম্মান করতেন। আর এক সন্ন্যাসিনী নারীসমাজে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে থাকতেন। পুরুষদের সামনে এলে, কখনো কখনো একটি কানি বা কাগজ নিম্নাঙ্গে চাপা দিতেন। বয়স তাঁর তিরিশের বেশী নয়। রং কালো হলেও চেহারা সুশ্রী। ভক্তেরা বলতেন, তিনি পনেরো বছর শুধু একটি করে বিল্বপত্র ও এক ঘটি করে জল খেয়ে আছেন। কোন কিছুই হাত দিয়ে গ্রহণ করতেন না তিনি। পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, যে যা দিত, পা দিয়ে সরিয়ে দিতেন। যার দিকে যেটা পড়ত, সেটা পেত সে-ই মায়ের প্রসাদ রূপে। খাদ্যদ্রব্য দিলে হা-হা করে হাসতেন। হয় পা দিয়ে চটকে দিতেন, নয় দেহের নিম্নাংশে রক্ষা করে, আয় আয় বলে পশু-পক্ষীদের ডাকতেন। শুনেছি, কাক, চড়াই, বেড়াল, কুকুর, সবাই নির্ভয়ে এগিয়ে আসত এবং শায়িত অবস্থায় তিনি সেই খাদ্যলোভী জীবদের লেহন ও কণ্ডূয়নের অধিকার দিতেন এবং সেই সঙ্গে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও পরমার্থিকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।

তবে নারী-ব্রহ্মচারিণীদের মধ্যে ঠিক এই রকম মুক্তদৃষ্টি কমই দেখা যাবে। বেশীর ভাগই লজ্জা নামক সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারেন না দেখেছি। কামবৃত্তি সম্বন্ধে সাধারণ আলাপ-আলোচনা সকলেই অসঙ্কোচে করে থাকেন, কিন্তু আপন যৌনজীবন সম্পর্কীয় আলোচনা কেউই করতে

চান না। যথেষ্ট সতর্ক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে কামোত্তেজনা অনুভব করেন এবং তাকে মৃদু উপায়ে নিরস্ত বা কঠোর হস্তে দমিত করাই তাঁরা ব্রহ্মচর্যের অনুকূল মনে করেন। কঠোর উপায়গুলির মধ্যে আকটি জলে বসে থাকা, তপ্ত বালুকা প্রক্ষেপ করা, সংশ্লিষ্ট অঙ্গে মিষ্ট বিলেপনের দ্বারা পিপীলিকাকে দংশনে নিয়োজিত করা ইত্যাদি-ইত্যাদির অভ্যাস গুহ্য সাধনের অঙ্গ রূপে প্রচলিত আছে। আর মৃদু উপায় হিসাবে স্কুল ছাত্রীদের সুবিদিত কৃত্রিম অনুষ্ঠানগুলি সন্ন্যাসিনী মহলেও অল্পাধিক প্রচলিত আছে।

একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার যে শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য ব্যবস্থিত হয়েছে মূলত পুরুষের জন্যেই, তাই 'বীর্যং ধারণং ব্রহ্মচর্যং', এই হল শাস্ত্রের নির্দেশ। নারীর কথা শাস্ত্রকার বলেন নি। কাজেই ব্রহ্মচর্য ও যৌনাতিক্রমণের ক্ষেত্রে নারী যখন এসেছেন, তখন বীর্য ধারণের মতো কোন প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের কথা তাঁকে ভাবতে হয় নি। পুরুষ সংস্রব থেকে আত্মরক্ষা করাই তাঁর কাছে যৌনসংহারের আদর্শ রূপে প্রতিভাত হয়েছে, তাই যৌন উত্তেজনা ও কৃত্রিম উপায়ে সেই উত্তেজনা প্রশমনকে তাঁর অন্যায় বা আদর্শ বিরুদ্ধ বলে মনে হয়নি। বরং সেই রকম মৃদু উপায়ে কামরূপী প্রবল শক্তিকে পরাস্ত করা যায়, এতে সংযতেন্দ্রিয় নারী গর্ব এবং আনন্দই বোধ করেছেন। সন্ন্যাসিনী, উদাসিনী, সিদ্ধা, ভৈরবী, চারণী, কারুণী, নানা শ্রেণীর যে-সব ব্রহ্মচারিণী দেখা যায়, তাঁদের অনেকেরই ঝোলাঝুলি তল্লাস করে পোড়া মাটি বা কাঠের consolator বা কৃত্রিম সাধন যন্ত্র পাওয়া গেছে। পশুরক্ষা ও নিয়োগের কথা ত আগেই বলেছি। এখানকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এ-সব ব্যাপার বিকৃত কামাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রাচীন সমাজের নৈতিকাদর্শে এ-সব জিনিষ সম্বন্ধে কোন অপরাধ বোধই ছিল না। পুরুষেরা অনেকে এ-সবের খবরই রাখতেন না। যাঁরা রাখতেন, তাঁরাও এগুলোকে সাধন-ভজনের অঙ্গীভূত বলে মনে করতেন। সুতরাং এসব ব্রহ্মচর্যের নামেই চলে যেত।

এই ভাবে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বা যৌনবৃত্তি উৎসাদনই ঊর্ধ্বরেতৃত্বের প্রধানতম লক্ষণ। যাঁরা শুদ্ধযোগী, অর্থাৎ যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক এবং লৌকিক ধর্ম ও আচার-আচরণের বিরোধী, তাঁরা পার্থিব অস্তিত্বের প্রধান পরিচয় যে যৌনতা, তাকে সমূলে দেহ থেকে উৎখাত করার পক্ষপাতী। ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা সংযত বা স্তম্ভিত করা, কিংবা সাত্ত্বিক চিন্তাধারার প্রভাবে তামসিক ভাব ও কর্ম-প্রেরণাকে উচ্ছিন্ন করা এবং বস্তুবিশ্ব থেকে

মনকে সমূলে উৎখাত করে নিয়ে, নিত্য সত্য যে ব্রহ্ম, তাতে একনিবদ্ধ করাই তাঁদের আদর্শ। এই আদর্শের স্থিতি যে অনির্দেশ্য ব্রহ্ম-কল্পনার ওপর, তাঁকে বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রমাণিত করা যায় না, অথবা তাঁর ধ্যান, মনন ও চিন্তনে কোন পারত্রিক কল্যাণ হয় কিনা, তা-ও যুক্তিযোগে প্রমাণের বিষয় নয়। তবে এই আদর্শের যোগীরা বিশ্বাস রাখেন এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁরা বস্তু-ব্রহ্মাণ্ডকে মায়া জ্ঞানে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেন। তা থেকেই এসেছে এই বিষয়-বাসনা বর্জনের ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়ন্ত্রণের আদর্শ, যার চলতি নাম ব্রহ্মচর্য। এঁরা বলেন, জ্ঞান থেকে আসে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য আনে মোহমুক্তি এবং মোহমুক্ত শুদ্ধাচারী ও শুদ্ধদৃষ্টি যে যোগী, তিনিই মোক্ষরূপী পরম পদ লাভ করেন। কিন্তু কার্যত এঁরা কি ভাবে বিষয়বৈরাগ্য আনার সাধনা করেন, ইতিপূর্বেই তা উল্লেখ করেছি। শুধু যৌন শাসনেই এঁদের সেই কৃচ্ছ্র সাধনার পরিসমাপ্তি নয়, অঙ্গশুদ্ধি ইত্যাদির ভেতরও একই রকম আত্মনিপীড়নের চেষ্টা প্রকাশ পায়।

নাসিকার দ্বারা জল পান, কুম্ভক প্রক্রিয়ায় পায়ুদেশ দিয়ে উদরস্থিত মলভাণ্ড নিষ্কাশিত করা এবং ধারাজলে ধৌত করে আবার তা স্বস্থানে ন্যস্ত করা (পারিভাষিক নাম যথাক্রমে নাসাপান ও অন্তর্ধৌতি), প্রত্যেক যোগীই নিত্যকর্ম রূপে অভ্যাস করেন। অনেকেই স্খলিত শুক্রবিন্দু রসনায় শোষণ করে নেন এবং ব্রহ্মকূট নিঃসৃত অমৃতধারা ধ্যানস্তিমিতবস্থায় পান করেন, এ ত আগেই বলেছি। এছাড়া স্নান, আহার, নিদ্রা এবং দেহ-বিনোদনের অন্যান্য ব্যাপারগুলিতেও এঁদের রকমারি উৎকট ও বিচিত্র অভ্যাস দেখা যায়। কেউ গ্রীষ্মকালে উষ্ণ জলে ও শীতকালে তুষার জলে স্নান করেন, কেউ তিক্ত বা কষায় বৃক্ষপত্র চর্বণ ও জল পানে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন, কেউ ইষ্টক-শয্যায় বা কণ্টক-শয্যায় শয়ন করেন। কেউ চতুষ্পার্শে অগ্নিকুণ্ড রচনা করে, তার মধ্যে হেঁটমুণ্ডে ও ঊর্ধ্বপদে থেকে, কেউ আকটি ভূপ্রোথিত থেকে ব্রহ্মচিন্তা করেন। এছাড়া দেহে ছুরিকা বিদ্ধ করা, চোখে কাঁটা ফোটানো, নাকে শলাকা সঞ্চার করা প্রভৃতি লোমহর্ষণ প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত যোগীও দেখা যায়। বলাই বাহুল্য, স্থূল বা মায়িক দেহকে যন্ত্রণা ও নিপীড়ন দান করে, তাকে ভোগ-বাসনা থেকে বিচ্যুত করার প্রয়াসই এ-সবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে এগুলি ম্যাসোকিজম বা আত্মপীড়নের যৌগিক সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়।

এর দ্বারা কি ফল লাভ হয় বা আদৌ কিছু হয় কি না, তা নিয়ে তর্ক তুলে লাভ নেই। ব্রহ্মানুভূতি এমনি একটা আত্মকেন্দ্রিক বস্তু যে ওর ইতি-নেতি কোন দিকই অন্যের ভেতর সঞ্চারিত করা যায় না। সবই নিজে অনুভব করতে হয়। তবে যোগলব্ধ ক্ষমতার লৌকিক নিদর্শন যা দেখা যায়, তা বিস্ময়কর হলেও, আধ্যাত্মিক যে নয়, তা নির্ভয়েই বলা যেতে পারে। কেউ সাপের বিষ, কেউ নাইট্রিক এসিড অবলীলাক্রমে পান করেন, কেউ চোখে ছুঁচ বিদ্ধ করে মুখ দিয়ে তা বের করেন. কেউ হাতে ধূলো নিয়ে তাকে রকমারি সুগন্ধে রূপান্তরিত করেন, কেউ পায়ু পথে এক গামলা জল শোষণ করে নিয়ে, মুখ দিয়ে তা নিষ্কাশিত করে দেন, কেউ পদ্মাসন হয়ে বসে, কুম্ভক প্রক্রিয়ায় ঊর্ধ্বে উঠতে থাকেন এবং শূন্যে নিশ্চল হয়ে থাকেন। এছাড়া আরো অনেক রকম কঠিন, দুষ্কর ও বিস্ময়সূচক অনুষ্ঠানই যোগক্রিয়ার পরিচায়ক রূপে ইতস্তত প্রদর্শিত হতে দেখেছি। এগুলি কঠিন কাজ তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু মায়িক জগতের জড়-বন্ধন থেকে আপন সত্তাকে বিমুক্ত করে চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মে নিশ্চল করার কাজে এরা কতটা সহায়ক, অথবা এগুলি আয়াসলব্ধ ম্যাজিক ছাড়া আর কিছুই নয়, তা নিয়ে নিশ্চয় আলোচনা চলতে পারে। যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার যে যোগী নন, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু এই সব বা এর চেয়েও দুষ্কর অনেক কিছু কাজ দেখিয়ে তিনি ত দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ?

যাই হক, একদিকে সুকঠিন আত্মনিগ্রহ, অন্যদিকে কঠিনতর ম্যাজিক, এই হল যোগীদের বাস্তব পরিচয়। আত্মিক পরিচয় ব্রহ্মাভূতি কিনা, তা নিয়ে অকারণ তর্ক করার কোন প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানীর চোখে জিনিষটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে ধর্মবোধের ক্রমভিব্যক্তির পথে একদা ম্যাজিক বা black art এসে ধর্মায়তনের অঙ্গীভূত হয়েছিল। নৈসর্গিক শক্তির ওপর প্রভুত্ব স্থাপন, অলৌকিক অনুষ্ঠানে কৃতিত্ব অর্জন, ভূতসিদ্ধি প্রভৃতি তখনি ধর্মাচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। তারপর বৈদান্তিক মায়াবাদ ও ব্রহ্মবাদের রসায়নে তার জন্মান্তর বিধান হয়ে যে প্রথা জন্মলাভ করে. তা-ই যোগ নামে চলে আসছে। সনাতন বা পৌত্তলিক ধর্মের অন্তর্গত রকমারি অনাচার ও বিকৃতাচার যেমন শাস্ত্রের দোহাইয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী নির্বিবাদে চলে আসছে, ভক্তিবাদের নামে তার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতির অভিযোগই যেমন কেউ উত্থাপন করেন না, তেমনি যোগের নামেও এই সব নগ্নতা, কৃচ্ছ্রতা,

কৌৎসিত্য ও কলা-কৌশল উচ্চ মার্গের জিনিষ বলেই চিরদিন সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়ে চলেছে। এ-সবের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না!

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে যোগীদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানী, সদাচার সম্পন্ন বা সৎচিন্তা-পরায়ণ ব্যক্তি দু-দশজন আছেন। সাধারণ ভাবে নির্লোভ জিতেন্দ্রিয় বা সংযতমনা বলে তাঁদের স্বীকার করে নিতেও বাধা নেই। কিন্তু কোন-না-কোন বাস্তব কারণে প্রতিহত হয়েই যে মনোধর্ম তাঁদের বাস্তব-বিমুখ হয় এবং সেটা যে প্রকৃতপক্ষে বস্তুলোক থেকে স্বচ্ছন্দে উর্ধ্বায়িত হয়ে, রসলোকে বা ভাবলোকে উপনীত হওয়া নয়, পলায়নী মনোভাবের বশবর্তী হয়ে দূর থেকে বস্তুকেই ভাবরূপে উপভোগ করা, তা স্বীকার করে না নিয়ে উপায় নেই। যোগীসমাজে প্রচলিত 'বিন্দুসাধন'ই হল এর সর্বোত্তম প্রমাণ।

বিন্দুসাধন সকলেই যে করেন তা নয়, যাঁরা করেন, তাঁরাও অনেকেই প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না। কিন্তু এই সমাজে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে এই কু-অভ্যাসের প্রসার খুব কমও নয়। বিন্দুসাধন হল আসলে কুম্ভক মৈথুন। যোগপরায়ণ দুটি নর-নারী দেহ-মিলনে আবদ্ধ হবেন, কিন্তু চিত্তবৃত্তিকে এমন ভাবে ব্রহ্মচিন্তায় তদ্গত ও স্তম্ভিত করে রাখবেন, যাতে দু-জনের কেউই কামভাবের দ্বারা আবিষ্ট হবেন না, বা কোন রূপ চরম পরিণতিরও সম্মুখীন হবেন না। উভয়ে এই অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজ নিজ সংযম, নিস্পৃহতা ও ইন্দ্রিয়-বলের পরীক্ষা করবেন, এই হল বিন্দুসাধনের মোটামুটি উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি। অর্থাৎ ওঁদের মতে এটা জান্তব মৈথুন নয়, এ হল উর্ধ্বরেতৃত্বের পাঠ কতদূর অধিগত হয়েছে, নিরাসক্ত ভাবে তারই পরীক্ষা। সুতরাং এটা সাধনেরই অংশ। এজন্যে সঙ্কোচের যেমন কোন কারণ নেই, পার্থিব সম্বন্ধে-ভেদের প্রশ্ন চিন্তা করার তেমনি কোন হেতু নেই। সাত্ত্বিক ভাবে অভিভূত যে কোন দু-জন যোগাচারী নর-নারীই এটা করতে পারেন। এ করলে মানুষ যেহেতু তুরীয় ভাব ও উচ্চ অনুপ্রেরণার অধিকারী হয়, সেই হেতু এটা করাই হল নৈষ্ঠিকদের মতে যোগশক্তি সংবর্ধনের সহায়ক।

বলা বাহুল্য, সাধারণ দৃষ্টিতে এটা যোগের দোহাইয়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা ছাড়া আর কিছু নয় এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রকের সাহায্য নিয়ে মিলনে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে এর বস্তুগত কোন পার্থক্যও নেই। দীর্ঘদিনের একান্ত চেষ্টায় ধারক

শক্তির অভ্যাস আয়ত্ত করে, কোন ব্যক্তি হয়ত অস্খলিত অপসারণ করে নিতে পারেন। কিন্তু তার জন্যে ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান বলা যায় না। তাছাড়া বজ্রোলি মুদ্রায় সাফল্য লাভ করেছেন, এমন ব্যক্তি কমই পাওয়া গেছে। বেশীর ভাগেরই স্খলন হয় এবং সেই স্খলনকে শাস্ত্রের দোহাইয়ে সমর্থন করাও তাই বিন্দুসাধনের আনুষঙ্গিক রূপেই গণ্য হয়। স্খলিত শুক্রকে নির্বিকল্প যোগী জননেন্দ্রিয় দিয়ে পুনরায় আকর্ষণ করে নেবেন এবং স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবেন, আর কুম্ভক প্রক্রিয়ায় অঙ্গ সঙ্কুচিত করে, তারপর ক্রমবর্ধিত শ্বাস-পরিবাহনের দ্বারা নারীও উৎসারিত শুক্রবিন্দু নিষ্কাশিত করে দেবেন, এই হল শাস্ত্রোক্ত বিধান। দুঃখের বিষয়, বিধান যাই হক, কার্যত এটা সম্ভব কিনা, সে কথা আশা করি আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।

উৎসারিত শুক্র আর দেহে ফেরে না, নিষিক্ত অঙ্গ থেকেও শুক্র আর সমূলে উৎখাত হয় না। সুতরাং শাস্ত্র-বিধান যাই হক, বিন্দুসাধন প্রকৃতপক্ষে যে জৈবতাতেই পর্যবসিত হয়, তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝবেন। বিন্দুসাধনে অভ্যস্ত এক যোগাচারী উদাসীনের খবর পেয়েছিলাম। তিনি মাটিতে শুতেন, শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস নগ্নগাত্রে থাকতেন, প্রতিদিন মাত্র একটি পদার্থ, যেমন একটি কলা, একটি নেবু, একটি বিল্বপত্র, যা পেতেন, তাই খেতেন। প্রত্যূষে উঠে ধারাজলে অন্তর্ধৌতি করতেন। টাকা-পয়সা হাত দিয়ে ছুঁতেন না। মধ্যাহ্নে ধ্যান ও গভীর রাত্রে বিন্দুসাধন করতেন। এক বিধবা তাঁর মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। একমাত্র তিনিই তাঁর কাছে যেতে বা তাঁর ঝোলাঝুলি স্পর্শ করতে পেতেন। অন্য কোন নারীরই অধিকার ছিল না তাঁর সম্মুখীন হবার। এই বিধবাও যোগাচার অভ্যাস করতেন এবং আহার-বিহারে পুরোপুরি বৈরাগ্যের অনুশীলন করতেন। অনেককে তিনিই দীক্ষা এবং ধর্মোপদেশ দিতেন, যেহেতু মহারাজ স্বয়ং কথা কইতেন না। এই শিষ্য সম্প্রদায়ের একজনের মুখ থেকে জানা যায় যে মহারাজ ও মাতাজী নাকি বিন্দুসাধন অভ্যাসে সিদ্ধিলাভ করেছেন। ওঁরা পার্থিব মায়া মোহের উর্ধ্বে, ওঁদের কোন লৌকিক সম্বন্ধ নেই, লৌকিক বৃত্তি বা প্রকৃতির কোন আবেদনও নেই ওঁদের, এই হল তাঁর অভিমত।

আর এক যোগী একদা প্রচুর পরিমাণ সরিষার তেল পান করে, সেই তেল জননেন্দ্রিয় পথে নিষ্কাশিত করে দিয়ে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন। গঙ্গার ধারে এক পরিত্যক্ত কুঠীবাড়ীর বারান্দায় তিনি শুয়ে বসে থাকতেন।

অধিকাংশ সময়ই থাকতেন ভাব-সমাধিতে আচ্ছন্ন। কখনো কখনো উঠে বেড়াতেন। এঁর কাছে কোন পতি-পরিত্যক্তা নারী মাঝে মাঝে দিবা-দ্বিপ্রহরে আসতেন শস্ত্রোপদেশ নিতে। বাবার যোগ বিভূতি সম্বন্ধে সকলেরই ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাই কেউ এ নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। তাছাড়া জটাজুটধারী অতি বর্ষীয়ান বাবা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণও ছিল না। সহসা কোন অজ্ঞাত কারণে এই মহিলা উন্মাদ হয়ে গেলেন এবং সম্পূর্ণ হত-চেতন অবস্থায় পথে পথে বিড় বিড় করে কি বলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আশ্চর্যের কথা, বাবাকেও আর এরপর পাওয়া গেল না। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার পর মহিলাটি অনেকটা সুস্থ হলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ আর হলেন না। এঁর কাছে জানা গেল যে বাবা তাঁকে চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই শিক্ষার আনুষঙ্গিক রূপেই তিনি শুদ্ধাচারে তাঁর সঙ্গে গুহ্য সাধন করতেন। সাধন প্রক্রিয়া মোটের ওপর ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়, শুধু অনুষ্ঠান কালে বাবা স্তিমিত নেত্রে মন্ত্র উচ্চারণ করতেন এবং স্খলনান্তে তেজোবিন্দু শোষণ করে নিতেন। এ ছাড়া মহিলাটিকে দিয়ে তিনি ন্যাস, প্রাণায়াম ও অঙ্গশুদ্ধির কতকগুলো কঠিন অনুষ্ঠান করাতেন। তার ভেতর একটা হল, খানিকটা ন্যাকড়া কয়েক বার গলধঃকরণ করা ও বাইরে টেনে নেওয়া, আর একটা হল, মুখাভ্যন্তরস্থিত পানীয় নাসিকা দিয়ে নিষ্কাশিত করা। এ ছাড়া আরো কতকগুলো তথ্য পাওয়া গিয়েছিল যা বাক্যালাপের অসম্বদ্ধতা হেতু ভালো করে বুঝে ওঠা যায় নি।

আরো একটি ঘটনা হল, এক বারো বৎসর বয়স্ক কিশোরীর ওপর প্রায়-বৃদ্ধ এক সন্ন্যাসীর বিন্দুসাধন অনুষ্ঠান। উক্ত সন্ন্যাসীও যোগী রূপে পরিচিত ছিলেন। বহু উকিল, এঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার তাঁর ভক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, বয়স্ক শিক্ষিত ও পদস্থ ভক্ত-ভক্তাদের উপেক্ষা করে বাবা ঐ কিশোরীটির প্রতি একান্ত কৃপা পরবশ হলেন। তিনি বললেন, ওর মধ্যে ষোল-কলায় ব্রহ্মতেজ জাজ্জ্বল্যমান রয়েছে। বাবার এই আকস্মিক কৃপায় মেয়েটির মর্যাদা হু-হু করে বেড়ে গেল। সকলেই তাকেও শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে লাগলেন। গভীর রাত্রে বাবা যখন ভাব-সমাধিমগ্ন থাকতেন, তখন অনেক সময় বালিকাটি তাঁর পরিচর্যায় নিরত থাকত। একদিন এই অবস্থাতেই একজন দেখলেন ভূশায়িতা বালিকাটির উপর নতজানু ভঙ্গীতে বসে বাবা স্ফুটকণ্ঠে মন্ত্র আবৃত্তি করছেন। বালিকাটি মুদিত নেত্রে করজোড়ে প্রার্থনা করছে। বিষয়টি অল্প

দিনেই জানাজানি হয়ে গেল, বাবাও বিতাড়িত হলেন। তারপর অনুসন্ধানে জানা গেল, অঋতুমতী এই কুমারীর ওপর বাবা নিয়মিত বিন্দুক্রিয়া করতেন এবং বলতেন, এর দ্বারাই নাকি তার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ হচ্ছে। ক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ বালিকাটি দিতে পারে নি।

এই রকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার বোধহয় আর আবশ্যকতা নেই। কামশাসন ও যৌনসংহারের নামে যোগী সমাজে একদিকে যেমন চলে নিয়ন্ত্রণের সুকঠিন কড়াকড়ি, আর একদিকে চলে এই রকম অত্মপ্রতারণার বাড়াবাড়ি। এ দুটোই কোন-না-কোন ভাবে বিকৃত মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক এবং পুরানো ধর্ম-ব্যবস্থার ক্রমানুবৃত্তি রূপে এগুলো সসম্মানে চলে আসছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। শুদ্ধযোগী বলতে যে সম্প্রদায়কে বোঝায়, তাঁরা আদর্শের দিক থেকে ব্রহ্মচর্য পরায়ণ এবং চিন্তার দিক থেকে ব্রহ্মবাদী। কিন্তু এমন যোগীও আছেন, যারা বস্তুর মধ্যে থেকেও বস্তুকে অতিক্রম করে যেতে চান নিরাসক্ত উপভোগের দ্বারা, যেমন পাঁকে থেকে পাঁকাল পাঁকমুক্ত থাকে। বিন্দুসাধন ও অপরাপর গুহ্য সাধনকারা অনেকেই এই মতের উপাসক। অনুসন্ধানে দেখা যাবে, এঁদের সাধন-প্রক্রিয়া উৎসারিত হয়েছে পুরানো তন্ত্রাচারের আদি-উৎস থেকে। ধর্মানুরাগী ব্যক্তিদের প্রচার ও বক্তৃতার ফলে এ-সবের একটি আধ্যাত্মিক চেহারা সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এর মর্মমূল পর্যন্ত গেলে যা পাওয়া যায়, তা ন্যক্কারজনক বিকৃতি ছাড়া কিছু না।

তৃতীয় অধ্যায়

যোগী ও ভক্তসমাজ

যোগীদের মোটের ওপর দুটো বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী। নিরাকারবাদীরা হলেন বৈদান্তিক বা ব্রহ্ম উপাসক, আর সাকারবাদীরা বেশীর ভাগই তান্ত্রিক বা শক্তি উপাসক। কৃষ্ণ উপাসক যোগীও কিছু কিছু আছেন। কিন্তু বৈষ্ণব সাধনতন্ত্রে ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গের চেয়ে অধিক সম্মানিত, তাই বৈষ্ণব মতের সমর্থকরা ন্যাস, প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধনের পক্ষপাতী নন। কিন্তু কি সাকারবাদী, আর কি নিরাকারবাদী, উভয় শ্রেণীর যোগীরই মূল বক্তব্য এক, যদিও সাধন-পদ্ধতিতে উভয়ের ভেতর আঙ্গিক ও অনুষ্ঠানের পার্থক্য প্রচুর। উভয়ের মতেই বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়া মাত্র, তার নির্বিশেষ কোন অস্তিত্ব নেই। একমাত্র চিন্ময় ও শাশ্বত সত্য হলেন ব্রহ্ম বা শক্তি, চিত্তবৃত্তিকে ইন্দ্রিয়ধর্ম ও বস্তুবোধ থেকে স্খলিত করে, সেই পরমাত্মার অভিমুখে প্রবাহিত করাই হল জীবাত্মার একমাত্র কর্তব্য।

কিন্তু এক দল, যাঁরা শুদ্ধযোগী, তাঁরা বলেন মনন শক্তিকে বস্তুলোক থেকে চৈতন্যলোকে কেন্দ্রায়িত করলেই বিষয়-বোধ আপনা থেকে তিরোহিত হয়। এই কেন্দ্রায়িত করার উপায় হল, ধ্যান-ধারণা, ন্যাস-প্রাণায়াম। অপর দল, যাঁরা হঠযোগী বা তান্ত্রিক যোগী, তাঁরা বলেন, মায়িক জগতের আকর্ষণ দুরতিক্রম্য, তাকে অনুকল্প ভোগের ভেতর দিয়ে ভিন্ন বর্জন করা সম্ভব নয়। মনের গভীরে কোথাও যদি ন্যূনতম ভোগবাসনাও আত্মগোপন করে থাকে, তাহলে তা তত্ত্বোপলব্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করবে। সুতরাং ভোগের পথ ধরেই ভোগাতীতের দিকে যেতে হবে। এঁদের মতে, তাই বিন্দুসাধন প্রভৃতিই হল মোক্ষ লাভের প্রকৃষ্ট সোপান।

মোটের ওপর এই সব প্রক্রিয়ার নামই সাধনা এবং এই সাধনার ধারাবাহিক অভ্যাস থেকে আয়ত্ত হয় যে সব শক্তি, তারই নাম সিদ্ধি। অধ্যাত্মিকতা বর্জিত সহজ দৃষ্টিতে দেখলে, এই সাধনাকে ব্যায়াম ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অঙ্গশুদ্ধি, লিঙ্গশুদ্ধি, অন্তর্ধৌতি, নেতি, ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি হল দৈহিক ব্যায়াম, আর ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, সমাধি প্রভৃতি হল মানসিক ব্যায়াম।

ধারাবাহিক অভ্যাস এবং অনুষ্ঠানের দ্বারা দৈহিক ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করতে করতে, সাধারণ মানুষই রকমারি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠে। আপন দেহকে ইচ্ছামত সঙ্কুচিত করে ফেলা, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে নিরবলম্ব শূন্যে ওঠা, ভূপ্রোথিত বা জলমগ্ন হয়ে অনেকক্ষণ থাকা, বিষ খেয়ে হজম করা, আগুনে হাত-পা দিয়ে না পোড়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম ও কাম-ক্রোধ বিরহিত হতে পারা, একদৃষ্টে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকা, হেঁট-মুণ্ডে ও ঊর্ধ্ব পদে সমাধিস্থ থাকা প্রভৃতি এই একনিষ্ঠ শক্তি-সাধনার ফল। নিজের দেহ-মন থেকে বিমুক্ত করে, এই শক্তি সাময়িক ভাবে অন্যের ওপর প্রক্ষেপ করাও সম্ভব। নিজের মনন-শক্তির দ্বারা অন্যের মনন-ক্রিয়াকে স্তম্ভিত বা আবিষ্ট করে, তাকে চিনি বলে ধূলো খাওয়ানো, দৈববাণী শোনানো, দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, গন্ধর্ব-কিন্নর দেখানো, মৃত জনের সঙ্গে কথা বলানো, সম্মোহিত অবস্থার মধ্যে বিবিধ দুষ্কর কার্য করানো ইত্যাদি ব্যাপারও অনেকে করতে পারেন। সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, এর প্রথমাংশ হল ব্যায়াম বা অভ্যাসজাত শক্তি, দ্বিতীয়াংশ হল ভেল্কী বা ইন্দ্রজাল-বিদ্যা সঞ্জাত ক্ষমতা।

আস্তিক্যবুদ্ধি পরায়ণ নর-নারী এ কথায় কুপিত হবেন সন্দেহ নেই। এ-ও জানি যে এই শক্তিগুলো সাত্ত্বিক না তামসিক, আধ্যাত্মিক না ম্যাজিক, তা নিয়ে তর্ক উঠবে। কিন্তু আগেই বলছি, ধর্মায়তনের অন্তর্ভুক্ত নন, এমন অনেক ব্যক্তির মধ্যেও ধারাবাহিক অনুশীলনের ফলে এই সব বা এই ধরণের শক্তি বিকশিত হতে দেখা যায়। কাজেই যোগীদের এই সব শক্তিকে যোগ-বিভূতি বলে মনে করার কি হেতু আছে? আর এই সব শক্তি যাঁরা আহরণ করেছেন, তাঁরা ঈশ্বরের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছেন, এমন কথা মনে করারই বা সমর্থন কোথায়?

কিন্তু এই অলৌকিক শক্তিগুলো নিয়েই হয় বিপদ। সাধারণ লোক ত বটেই, অনেক জ্ঞানী, গুণী, বিচারশীল লোকও এই সব অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং সেই অভিভূতির দৌর্বল্যেই তাঁরা বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ভাবতে সুরু করেন, বুঝি এগুলো আধ্যাত্মিক বা ঐশ্বরিক ব্যাপার! বস্তুত এগুলো দুষ্কর বা বিস্ময়কর ব্যাপার তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলো মনুষ্যসাধ্য ব্যাপারই এবং এই সব শক্তির অধিকারীরা সাধারণ মানুষই, কেউ উচ্চতর লোকের অধিবাসী বা মহত্তর সত্যানুভূতির অধিপতি নন, এটা মনে থাকে না অনেকেরই। একজন তত্ত্বজ্ঞ বলেছেন, জীবলোক বা

বস্তুলোক থেকে বিযুক্ত করে চেতনাকে ব্রহ্মাভিমুখে প্রবাহিত করার পথে যোগ-সাধনা হল একটা মধ্যবর্তী সোপান। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বাক্য-মনের অগোচর, নিরাকার, নির্বিকল্প, ইচ্ছা মাত্রেই তাঁকে ধারণা করা যায় না। তাই ধ্যান, ধারণা ও ন্যাস, প্রাণায়ামের সাহায্যে বিশেষ কেন্দ্রে মনকে নিবদ্ধ করে, আস্তে আস্তে বিষয়গত বিচ্ছিত্তি অভ্যাস করতে হয়, তারপর সেই বিমুক্ত মনকে ব্রহ্মের উদ্দেশে প্রসারিত করতে হয়। সুতরাং যোগই ব্রহ্মলাভ নয়, ব্রহ্মলাভের পথ মাত্র। এই পথে কিছু দূর গেলে, যে ঐশ্বর্য বা শক্তি লাভ হয়, সে শক্তিতে সমৃদ্ধি আছে, কিন্তু তাকে অতিক্রম করে তবেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। দুঃখের বিষয়, সেই শক্তি ও সমৃদ্ধিতে পৌঁছেই বেশীর ভাগ লোক বিকারগ্রস্ত হন। মনে করেন, এরই নাম ব্রহ্মপদ। ফলে প্রকৃত ব্রহ্মে আর পৌঁছানোই হয় না। আহৃত ক্ষমতার অহেতুক অপব্যবহারেই যোগীরা লক্ষ্যভ্রষ্ট ও নিরয়গামী হতে থাকেন।

এ যুক্তি বিজ্ঞানানুমোদিত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এতে শুধু একটা কথাই প্রণিধানযোগ্য : যোগশক্তি যে অনৈশ্বরিক বা অনাধ্যাত্মিক, খোদ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুরাই তা স্বীকার করছেন। এর বেশী আর কিছুই এ থেকে নেবার নেই। আসলে বস্তুলোক বা জীবলোককে আশ্রয় করেই মানুষের চেতনা। বস্তু-সংজ্ঞা বিরহিত নির্বিশেষ চেতনা বলে কোন জিনিষ নেই, হতেও পারে না। কারণ বোধ বা চেতনার যা উপাদান, সেই মন নিবদ্ধ দেহের মধ্যে এবং দেহ বাস্তবাতীত নয়। দেহকে পীড়ন বা নির্যাতন করে সর্বসাধারণের অভ্যস্ত ও অনুভূত বৃত্তিগুলি থেকে স্খলিত করা যেতে পারে, কিন্তু দেহের মৌলিক স্বধর্ম যে জান্তবতা বা বস্তু-চেতনা, তা থেকে ষোল-আনা বিশ্লিষ্ট করা যায় না। কাজেই জীবাতীত ও বাস্তবাতীত ব্রহ্মের কল্পনা চলতে পারে, কিন্তু সেই কল্পনাকে প্রামাণ্য সত্য বলে গ্রহণ করার কোন উপায় শরীরী জীবের হাতে নেই। তাতে সমাবিষ্ট হবার কোন বাস্তব সম্ভাবনাও তাই দেখা যায় না মানুষের পক্ষে।

তবে যোগীরা ব্রহ্মপদ লাভের আশায় বাস্তবকে অস্বীকার করার এ প্রয়াস করেন কেন? কেনই বা এজন্যে এত উৎকট ও উদ্ভট অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করে, সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত বৃত্তিগুলি উৎসাদন করতে চান? এর উত্তর সহজ। কোন-না-কোন সামাজিক, ব্যক্তিক, বা মানসিক কারণেই চিত্তবৃত্তি তাঁদের প্রতিহত হয়ে নিজের মধ্যে এসে সঙ্কুচিত হয়। মানুষের পথ পরিহার করে তখন অতি-মানুষী কোন অলৌকিক পথে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েই এই ক্ষতি পূরণের

নেশা তাঁদের পেয়ে বসে। যোগী, সাধক, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ফকির, উদাসী, ক্ষ্যাপা প্রভৃতির আদি ইতিহাস এই এবং স্বাভাবিকতার প্রতিকূল বলে, একে বিকৃতিই বলতে হবে। এই বিকৃতি প্রাবল্য লাভ করলে, তা যে উন্মত্ততাতেই পর্যবসিত হয়, তার প্রমাণ তান্ত্রিক যোগীদের বিবিধ কুৎসিত আচার-অনুষ্ঠান। উলঙ্গ হয়ে থাকা, মৃতদেহ খাওয়া, মল, মূত্র, রক্ত, পুঁজে বিকার-বোধ বর্জিত হওয়া, ভূত-প্রেত, দানা-দৈত্য দেখা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রভৃতি আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিবিধ অনুষ্ঠানের যে-সব নিদর্শন সর্বদাই পাওয়া যায়, সেগুলো মনস্তত্ত্বের বিচারে বিকার এবং উন্মত্ততা ছাড়া আর কি? এই বিকৃতি ও বৈকল্যকে ভ্রমবশে লোকে সংস্কারবর্জিত তুরীয় অবস্থায় উপনীত হওয়ার লক্ষণ বলে মনে করে, যেহেতু শাস্ত্রোক্ত যোগের তত্ত্ব ও লক্ষ্য সম্বন্ধে লোক-মনে এই ধারণাই প্রচলিত আছে। বস্তুত বিষয়-বিরাগ সম্ভূত ঈশ্বরানুধ্যানের প্রবৃত্তি ও প্রক্রিয়াকে অবদমন এবং তজ্জনিত বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। নিয়মিত অনুশীলনে এই বিকৃতিরও কতকগুলো বিশেষ দিক পরিস্ফুট হতে পারে, হয়ও তাই। সেই বিশেষ দিকগুলোই হল তথাকথিত যোগ-বিভূতি। বিভূতির একটা প্রসন্ন বা পরিচ্ছন্ন রূপ অবশ্য কারো কারো আচরণে প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু বিকট ও বিসদৃশ রূপই দেখা যায় সব চেয়ে বেশী।

এর কারণও সুস্পষ্ট। সর্বশ্রেণীর যোগেরই ভিত্তিভূমি হল ব্রহ্মচর্য বা যৌন সংহার এবং সেটা কোন ক্ষেত্রেই অকৃত্রিম বা স্বভাবসম্মত জিনিষ নয়। যৌন-বৃত্তি হল জৈব অস্তিত্বের প্রধানতম বৃত্তি। এই বৃত্তি থেকেই জীবনের উদ্ভব এবং জীবনের সমস্ত স্তরকে আশ্রয় করেই এই বৃত্তি প্রাণ-শক্তি রূপে প্রবহমান। সুতরাং জৈবসত্তাকে বস্তু-চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে, সর্বাগ্রে চাই যৌনবোধ বিরহিত হওয়া, নতুবা ব্রহ্মমার্গে অগ্রসর হবার আশা কোথায়? কিন্তু ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বললেই হওয়া যায় না। জন্মগত বিকলতা হেতু কোন-কোন লোক আপনা থেকেই যৌনবোধ বিরহিত হতে পারে হয়ত। সে রকম লোক চেষ্টা করলে হয়ত সহজেই ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিতও হতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও প্রকৃতিস্থতা সম্পন্ন লোককে এজন্যে করতে হয় অনেক কোসিস ও কসরৎ। সেই সব কসরতের নামই হল ব্রহ্মচর্য সাধন। এর বৈজ্ঞানিক নামই হল অবদমন এবং অবদমনের স্বধর্ম হল কোন-না-কোন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মূল বৃত্তির আত্মপ্রকাশ।

কিন্তু ব্রহ্মচর্য সাধনের নামে নিয়মিত ইন্দ্রিয়পীড়ন ও লিঙ্গ-শাসনের দ্বারা যৌনাবদমনও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। নানা বিকৃত উপায় স্বীকার করে নিয়েই তাই তাঁদের কামক্ষুধা চরিতার্থ করতে হয়। আগেই বলেছি স্খলিত শুক্র পান করে নেওয়া, বিন্দুসাধনের নামে অনুকল্প মৈথুন করা, ইন্দ্রিয় নিপীড়নের নামে জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গের দ্বারা লেহন ও দংশন করানো ইত্যাদি অনেক রকম কুশ্রী আচরণই যোগীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এগুলোকে অনিবার্য বা অনতিক্রমণীয় জ্ঞানে তাঁরা শুধু গ্রহণই করেন নি, রীতিমতো একটা যোগের মর্যাদা দিয়েই এগুলোকে স্বীকার ও প্রচার করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যোগসংশ্লিষ্ট ব্রহ্মচর্য এবং যৌন সংহারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যা-ই হক, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিকৃতাচার। এই বিকৃতাচারের ভ্রান্ত তপস্যায় বহুলোক এ পর্যন্ত আত্মনিয়োগ করেছেন, আজো করছেন এবং হাজার হাজার নর-নারী তাঁহাদের শুদ্ধমতি, স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মবেত্তা জ্ঞানে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে যাচ্ছেন।

নির্মুক্ত বিচারবুদ্ধি নিয়ে এর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে যাওয়ার বিপদ আছে। তবু গতানুগতিক অন্ধ বিশ্বাসের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতেই হবে, নইলে প্রকৃত সত্য কোন দিন পূরোপূরি উদ্ঘাটিত হবে না। আর একটা কথাও এইখানে বলে রাখতে হবে। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, যাঁরা আন্তরিক ভাবে যোগযাগ, ব্রহ্মচর্য, ধ্যান ইত্যাদিতে বিশ্বাস রাখেন এবং বস্তুলোকে অবস্থিত থেকেও যোগপ্রভাবে বস্তুকে অস্বীকার করে, চৈতন্য লোকে অধিরূঢ় হবার আশায় এ-সবের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা বিকৃতমনা বা বিকৃতাচারী হলেও কপট নন।

কিন্তু কাপট্য ও অকাপট্যের সীমা নির্ধারিত হবে কি দিয়ে? যাঁরা সংসার, সমাজ ও লোকালয় ছেড়ে, নির্জন সমুদ্রতীরে, গহন অরণ্যে বা দুর্গম গিরি-কন্দরে তপস্যা নিমগ্ন আছেন, অহঙ্কার, আত্মপ্রাধান্য, আহার-বিহার ও প্রচারের কোন কামনাই যাঁদের নেই, তাঁদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ হয়ত বা অকপট। কিন্তু সে রকম যোগী কে বা কজন? সকলেই ত লোকালয়ের গায়ে গা ঠেকিয়ে থাকেন এবং রকমারি যোগের ভেল্কী দেখিয়ে, বিষয়-বিরাগ ও ঈশ্বর-চিন্তার পরিপোষক নানা সুকথা ও সদুপদেশ সিঞ্চন করে পাইকারি হারে শিষ্য-শিষ্যা জড়ো করেন। বন্ধ্যা, বালবিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও মৃতবৎসা নারীরা তাঁদের আশেপাশে এসে জড়ো হয়। কেউ চায় ওষুধ, কেউ চায় উপদেশ, কেউ বা দৈবানুগ্রহ। মৎলবী ধূর্ত, দুষ্কৃতকারী অনুতপ্ত ও ধর্মবিলাসী

প্রবীণেরাও তাঁদের ঘিরে ধরেন। কারু মামলা, কারু কন্যাদায়, কারু সাইটিকা। এই ভাবেই জমে ওঠে আধ্যাত্মিকতার কারবার, তখন অন্যায়, অনাচার ও কদাচার করতেই বা বাধা কি? বারণই বা করে কে?

কিন্তু যোগীমাত্রেই যেমন আধ্যাত্মিকতার কারবারী নন, তেমনি একমাত্র যোগীরাই এই কারবারের ব্যাপারী নন। ভক্তিসাধক বা ভাবসাধক নামেও খুব বড় একটা দল আছেন, যাঁরা একই ভাবে ধর্মের নামে অন্যায় ও অনাচারের একশেষ করেন। এঁরা বলেন, যোগের পন্থা ঐশ্বর্যের পন্থা। ওতে মানুষের মনে আসে শক্তির মত্ততা, তার ফলে আসলকে ভুলে সে করে নকলের দাস্য। ভাবের পথ সহজ পথ। এপথে নেই কোন বিধি-বিধানের বালাই, কোন আচার-অনুষ্ঠানের কড়াকড়ি। নিজেকে সহজ আবেগে পরমাত্মার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেই, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় একটা অচিন্ত্য ভেদাভেদ। তখন আপনিই বিষয়তৃষ্ণা, বাহ্যজ্ঞান ও জৈবচেতনা স্খলিত হয়ে যায়, জীবই পরিণত হয় শিবে। এই পথের সাধকরাই হলেন এঁদের মতে সর্বোচ্চ স্তরের সাধক। এই সাধন-শক্তি অর্জনের জিনিষ নয়। এ হল স্বয়ম্ভূত। যাঁর মধ্যে এই শক্তি জন্মায়, তাঁর জন্মগত সুকৃতিই তাঁকে সেই সৌভাগ্যের অধিকারী করে।

মত হিসাবে এ-ও কথার কারসাজি, তাতে আর সন্দেহ নেই। কারণ ধ্যান-ধারণার ভেতর দিয়েই হক, আর সহজ আবেগেই হক, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যোগাযোগ ব্যাপারটা বাস্তব বুদ্ধির অগম্য। আর বিষয়তৃষ্ণা, বাহ্যজ্ঞান ও জৈবচেতনা তিরোহিত হওয়ার ব্যাপারটা মনস্তত্ত্বমূলক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এলাকাভুক্ত। কাজেই এ সিদ্ধান্তের কাঠামোও একই রকম অপ্রমাণ্য তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মত যাই হক, এই মতের সাধকসংখ্যা দেশে কম নয়। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বাউল, উদাসী, নানা নামে ভাব-সাধকরা সমাজে বিচরণ করেন এবং রকমারি ভানুকালির অভিনয় করে, লোকের বুদ্ধি-বিভ্রান্তি উৎপন্ন করেন। যেহেতু এঁরা সহজ সাধক এবং কোন বিধি-বিধানের অন্তর্গত নন, সেই হেতু এঁদের রীতি-পদ্ধতি যোগীদের চেয়ে অনেক বেশী নিরঙ্কুশ।

কোন কিছু বিশ্বাস করতে বা করাতেই এঁদের বাধে না। কেউ বলেন, তিনি গোপী ভাবের সাধক। এই বলে শাড়ী, কাঁচুলী, নথ, মাকড়ি, আলতা ও সিঁদুর সহযোগে নারী সেজে বসেন। বুকে কৃত্রিম স্তন ধারণ করেন। মাসে মাসে কৃত্রিম ঋতু পালন করেন। কেউ বলেন তিনি বালগোপাল। সেই অজুহাতে তরুণী নারীর কোলে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ওঠেন এবং অকুণ্ঠ

অসঙ্কোচে স্তন পান করতে থাকেন। কেউ বলেন, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। বাঁশী ধরে বাঁকা হয়ে দাঁড়াতে, বস্ত্র হরণ করতে, রাস, দোল, ঝুলন করতে মোটেই তাঁর বাধে না। কেউ সাজেন মহাদেব, উলঙ্গ হয়ে থাকেন। প্রকাশ্যেই শক্তি-সাধন বা গৌরীগ্রহণ করেন। কেউ রামোপাসক রূপে লাঙ্গুল ধরেন। কেউ গণপতি উপাসক রূপে মূষিক বৃত্তি অনুসরণ করেন। অর্থাৎ ক্ষুদকুঁড়ো খুঁটে খান। প্রাকৃত জন এই সব লীলাপরায়ণ সাধককে যোগীর চেয়ে বেশী পছন্দ করে। তার কারণ যোগীরা হয় বেদান্ত, নয় তন্ত্র ব্যাখ্যা করেন, যা সাধারণের মাথায় ঢোকে না। কিন্তু এঁরা বলেন সহজ সাধনের কথা, যা জৈব-ধর্মের প্রতিকূল নয়। উপরন্তু এঁরা যখন-তখন দিব্যোন্মাদ দশা পান। সেই দশা-প্রাপ্তির বিচিত্রতাই এঁদের সব চেয়ে বেশী জনপ্রিয় করে।

কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এক প্রসিদ্ধ উদাসীন দক্ষিণ কলিকাতায় কোন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী অতিথি হয়েছিলেন। বর্তমান লেখক এবং আরো কয়েক জনের সঙ্গে তাঁর সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনা খুব ভাসা-ভাসা, কারণ বাবার পুঁজি খুব বেশী নয়। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং গৌরাঙ্গ প্রভুর মতো হাত তুলে নৃত্য সুরু করলেন। নাচতে নাচতে পড়ে গেলেন অজ্ঞান হয়ে। খানিকক্ষণ খোল-করতাল যোগে কীর্তন হতেই তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এল এবং তিনি ঠিক হয়ে বসলেন। বসেই যাদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল, তাঁদের আর চিনতে পারলেন না। নতুন করে পরিচয়-সূত্র স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। আর এক প্রসিদ্ধ মা কয়েক দিন কোন শ্মশানে বাস করছিলেন। নতুন শবদেহ এলেই তাঁর দশাপ্রাপ্তি হত।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়াতেন। পরণের কাপড় খসে পড়ত, ইঞ্চি দুই জিভ ঝুলে পড়ত, মাথার চুল হয়ে উঠত খাড়া খাড়া। নিমীলিত নেত্রে বিড় বিড় করে তিনি অনেক কিছু বকতেন। এই অবস্থায় একদিন তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। গায়ের রং-ও বিস্ময়কর ভাবে নীলাভ মনে হয়েছিল। এই রকম ভাব-সমাধির দৃষ্টান্ত আরো একটি পেয়েছি। এক সাধক পুরুষকে কালী-ভাব ধারণ করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বক্ষদেশে স্তনোদ্গম হতে দেখে, এক ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, স্পষ্ট দেখলাম, মহাদেবের বুকে পা রেখে মা নাচছেন! তিনি বোধহয় ভক্তির চোখে দেখেছিলেন। সাদা চোখে দেখেছিলেন যাঁরা, তাঁরা দেখেন শুধু বক্ষদেশে স্তনবৎ দুটি পেশী আবির্ভূত হতে

এবং জিভ বেরিয়ে আসত। পরণে ধুতি ছিল, কাজেই যৌনাঙ্গে কোন রূপান্তর হয়েছিল কি না জানা যায় নি।

এই সব অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার চোখের ওপর সঙ্ঘটিত হতে দেখলে, স্বভাবতই মানুষের যুক্তির বনিয়াদ শিথিল হয়ে যায়। ভয়ে ভক্তিতে তখন আপনা থেকেই দলে দলে লোক এঁদের চরণতলে লুটিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। এঁরাও সেই সুযোগে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র, বন্ধধন্ধ, অনেক কিছুর উৎকোচে লোক বশীভূত করতে থাকেন। মারণ, বশীকরণ, গর্ভপাতন, বিবিধ ঘৃণ্য ব্যাপারে আশ্রিতদের সহযোগী হয়ে ওঠেন এবং ধর্মের নামে, গুহ্য সাধনের দোহাইয়ে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া থেকে সুরু করে রকমারি অন্যায় অনাচার করেন।

এক ক্ষ্যাপা নামধারী সাধক কিছুদিন রামরাজাতলা অঞ্চলে বেড়াতেন। কেউ কোন অসুখ নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলেই, তিনি যাহক একটা টোটকা ওষুধ তাকে বাৎলে দিতেন। অনেক সময় স্বতপ্রবৃত্ত হয়েও কারুকে কারুকে বলতেন, তোমার এই রোগ হয়েছে। অনুরাগীদের বক্তব্য এই যে প্রত্যেককেই অসুখটা কবুল করতে হত। বাবাকে ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না। একটি বছর-এগারো বয়সের মেয়ের হাঁপানি হয়েছিল। তার মা নিয়ে গেল তাকে ক্ষ্যাপার কাছে। ক্ষ্যাপা বললেন, বোধ হয় মেয়েটিকেই, ভয় পাবি না? যা দেব, তাই ভক্তি করে খাবি? বলাই বাহুল্য বালিকা স্বীকৃত হল।

তখন একটি নারকেল মালায় খানিকটা জল নিয়ে, ক্ষ্যাপা একটা চালের নীচে গিয়ে বসলেন এবং শুধু মেয়েটিকে বললেন, চলে আয়! একটু পরে মেয়েটি বমির আওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে এল এবং ওষুধটা কি সে সম্বন্ধে কিছুই কারু কাছে প্রকাশ করল না। অনেক পীড়াপীড়ির পর জানা গেল যে ক্ষ্যাপা ঐ জলের ভেতর শুক্র নিক্ষেপ করে, বালিকাকে তাই পান করিয়েছে। এই ক্ষ্যাপাকে আমি দেখেছি। কথা বলতে বলতে হা-হা করে হেসেই তিনি অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। ভূত, প্রেত ও দেবতা, গন্ধর্বদের সঙ্গে কথা বলতেন। অনেকেই ও-পক্ষের কথাও শুনেছে। কেউ কেউ দেখেছেও বললে। কিন্তু আমি শুধু ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামিই দেখেছি। ঠিক এই রকম ক্ষেপীও দেখেছি একটি। তিনি তরুণী এবং সুন্দরী। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, কপালে তেল-সিঁদুরের বিরাট কস্কা, পরণে গেরুয়া, হাতে ত্রিশূল, ফুলের মালা দিয়ে খোঁপা বাঁধা। এক জমিদার গৃহে উঠেছেন। দিবা-রাত্রি উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক

শ্রেণীর বিশিষ্ট ভদ্রজন এবং তাঁদের গৃহিণীরা আসছেন যাচ্ছেন। মা নাকি ভাব-যোগিনী এবং জাতিস্মর। পর পর সাত জন্মের কাহিনী তিনি অবলীলায় বলতে পারেন।

এক ডাক্তার বন্ধুর সহগামী রূপে হাজির হলাম। মা পদ্মাসন হয়ে বসে আছেন। দুটি চোখ ধ্যানস্তিমিত। হঠাৎ হা-হা করে উচ্চ হাস্য এবং শূন্যচারী কোন ব্যক্তির সঙ্গে বাক্যালাপ সুরু হল। বাক্যের বিষয় ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে কলহ। বুঝলাম, কোন অন্যজন্মের দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে! মা প্রকৃতিস্থ হলে দু-একটি কথা হল। সে কথা ঐ ঘুড়ি-ওড়ানো জন্মের প্রসঙ্গ নিয়েই। সে জন্মে তিনি জাতিতে ছিলেন গোয়ালা, তাঁর নাম ছিল ভূষণ। সঙ্গে এ জন্মে তিনি নারী হয়ে জন্মালেন কি করে, বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হা-হা করে উচ্চ হাস্য এবং সোজা উঠে দাঁড়িয়ে বস্ত্র উন্মোচন। ব লিস কি রে, আমি নারী? দেখ ত নারী, না নর! বলা বাহুল্য, তিনি নারীই। একটি স্কুলের ছেলে এই মাতাজীর একান্ত অনুরাগী হয়ে পড়ে। দিন-রাত্রি সে তাঁর সেবা ও পরিচর্যা করত। এক দিন রাত্রিবেলা ছেলেটি নিষ্প্রভ মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঐ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করা হল, ব্যাপার কি রে? সে কিছুই বলল না, শুধু 'না', 'না', 'ও-কি', 'ও-কি' করে কাঁপতে লাগল। তার কাপড়ে রক্তের দাগ, হাতেও রক্ত। এরপর ছেলেটির মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিল।

ভূতিসিদ্ধি পরায়ণ আর এক ফকিরকে দেখেছি। তিনি কোন জাতি বোঝা কঠিন। কখনো কালী নাম করেন, কখনো আল্লা নাম করেন। কখনো উলঙ্গ হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দেন, কখনো জোব্বা ও পাগড়ীতে সজ্জিত হয়ে বলেন, শিঙার বেশ ধরেছেন। এঁকে ঘিরেও সর্বদা নর-নারীর মেলা বসত। এই মেলাতেই এক গ্রাম্য বধূকে ফকির একদিন বললেন, নৈঋর্তের যোগিনী তাকে ভর করেছে। তার ওপর দানা-দৈত্যেরা সর্বদা পাক দিয়ে উড়ছে। তার হাতে শ্বশুরকুলের সর্বনাশ হবে। সে যেখানে যাবে, সেখানে পায়ের তলায় ঘাস জলে উঠবে। এর পর আর বলার কি আছে? সকলেই ফকিরকে চেপে ধরল, বাবা, ভালো করে দাও। বাবা হাসলেন। বললেন, তিন প্রহর রাত্রে গাংপারের ষষ্ঠীগাছতলায় বৌটি যদি সাহস করে যেতে পারে, একমাত্র তাহলেই ভূতশুদ্ধি করে দিতে পারবেন তিনি। যথাসময়ে যথাস্থানে বৌটিকে এগিয়ে দিয়ে সবাই আড়ালে সরে দাঁড়াল। তারপরই

বিকট একটা আর্তনাদ শোনা গেল। পরের দিন সকালে ক্লান্ত বিক্ষত দেহে বৌটি ফিরে এল। তার সর্বাঙ্গে বড় বড় দংশন জনিত ক্ষত চুলের অগ্রভাগ দগ্ধ, বুদ্ধি-শুদ্ধিও কেমন যেন আচ্ছন্ন। গ্রামের লোক বলল, বৌটি খুব বাঁচাই বেঁচে গেল বাবার দয়ায়! বৌটি কিন্তু কিছুই আর বলল না।

এই সব সিদ্ধপুরুষ, দিব্যোন্মাদ, ভক্ত ও ভাবুকদের চিন্তা, আচরণ ও কার্য-কলাপ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এঁদের মনস্তত্ত্ব শুধু অস্বাভাবিকই নয়, অনেক ক্ষেত্রে বিকল ও বিকৃত। সেই বিকলতার ঝোঁকেই এঁরা কল্পিত ভূত-প্রেত দেব-দেবীর সঙ্গে আদান-প্রদান করছেন মনে করেন। আর এঁদের অনেকেরই থাকে বিশেষ ধরণের একটা ব্যক্তিগত চৌম্বক শক্তি, যা এঁরা সংক্রামিত করতে পারেন অন্যের ভেতর। তার ফলেই এঁদের সেবক ও ভক্তবৃন্দ এঁরা যা দেখান, তাই দেখেন। প্রকৃত পক্ষে বিকৃত মনস্তত্ত্বই এঁদের কার্য-কলাপে অবদমন জনিত নানা অনাচার ও বিকৃতাচারে প্রকাশমান হয়। ভক্তির প্রাবল্যে ও অজ্ঞানতার বিপাকে লোকে এসবের মধ্যেও মাহাত্ম্য আবিষ্কার করেন। কোন দিনই এগুলো অন্যায় বা অনুচিত বলে গৃহীত হয় না। এই সব সিদ্ধপুরুষ বা ভক্তদের শারীর প্রকৃতিতেও একটা জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার আছে। এঁরা অনেকেই মৃগীরোগ গ্রস্ত হন। একটা কোন উদ্দীপ্ত মনস্তত্ত্বের দ্বারা আক্রান্ত হলেই এঁদের দেহগত সেই ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। তাইতেই যখন-তখন সমাধিস্থ হতে ও সেই সমাধির ভেতর কালী ও কৃষ্ণ, শিব ও গণেশ হয়ে পড়তে এঁদের দেরী লাগে না। অবচেতনায় যে-সব অস্বাভাবিক ও অনৈসর্গিক চিন্তা এঁদের সর্বদা তরঙ্গিত হচ্ছে, দেহ সংজ্ঞা-বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা চেতনার পর্দায় ভেসে ওঠে এবং দেহ-মনের যুগ্ম রসায়নে মুহূর্তমধ্যেই তা অদ্ভুত এক-একটা রূপান্তরে প্রতিভাত হয়।

এরি নাম দশা বা দিব্যোন্মত্ততা। এটা বিশ্বের বহু ভক্তি-সাধকের জীবনেই হতে দেখা গেছে এবং এর আদি-কারণটাও একই বলে বিবেচিত হয়েছে। কাজেই কালী ভাবে আবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাত্রবর্ণ ঈষৎ নীলাভ হওয়া বা বুকে ঈষৎ স্তনোদ্গম হওয়া খুব অসম্ভব নয়। পুরুষের ঋতু হওয়া বা মানুষের ল্যাজ গজানো অবশ্য তাই বলে সম্ভব নয়, যদিও তা-ও কোন কোন শ্রেষ্ঠ ভক্তের জীবনে হয়েছিল বলে ছাপার অক্ষরে লেখা হয়েছে! আসলে এ সবই

এসে থাকতে পারে তাঁর মনে। সে কথাই তাঁর উক্তিতে ভর করে হয়ত প্রামাণ্য তথ্য রূপে ধার্মিকদের বাজারে চলেছে।

অবশ্য এ সবই হল স্বভাব-ভক্তের কথা। অনেক নকল ভক্ত আছেন, হয়ত তাঁরাই বেশী। তাঁরা নানা সাংসারিক অভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে ভক্তের ছদ্মবেশ ধরেন। এই ছদ্মবেশ ধরার প্রবৃত্তিও একটা অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বজনিত ব্যাপার সন্দেহ নেই। তবু স্বভাব-বিকৃতদের সঙ্গে এঁদের একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। এঁদের অন্তশ্চেতনায় আছে অনুচিত পথে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার দুষ্ট কামনা। সেই কামনা তৃপ্ত করার কৌশল হিসাবেই এঁরা জটা, চিমটা, ত্রিশূল, গেরুয়ার শরণাপন্ন হন। ক্রমে এই অরোপিত অভ্যাসগুলো স্বভাবে দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। তখন কে আসল, আর কে নকল, সাব্যস্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে যা সহজ, যা সার্বজনীন, তাকে বর্জন করে চলার চেষ্টাই একটা অস্বাভাবিকতা।

সে অস্বাভাবিকতা ধর্মের নামে সম্মানিত হলেও, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে তা দুর্বল ও বিকারগ্রস্তই করে। সুতরাং সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও বিজ্ঞান সম্মত সমাজ গঠন যাঁদের অভিপ্রেত, তাঁরা যোগী, ব্রহ্মচারী, তান্ত্রিক, কাপালিক, অঘোরপন্থী, সখী-সাধক, উদাসীন, বাউল, ফকির, বা এই শ্রেণীর ধর্ম-ব্যাপারীদের অস্তিত্বকে কখনোই বাঞ্ছনীয় মনে করতে পারেন না। এঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন না। উপরন্তু বিশ্বাসপ্রবণ সাধারণ মানুষকে নানা অবাস্তব উপদেশ দিয়ে বিপথগামী করেন। নির্বোধ নর-নারীকে করেন নিজ নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে দেহে ও মনে অধঃপতিত। ধর্ম থাকা ভালো কি খারাপ, ঈশ্বরতত্ত্বের মূল্য আছে কি নেই, জগৎ, জীবন ও পরমার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য কি না, তা নিয়ে মতভেদের অবকাশ যাই থাকুক, বিষয়টা অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে এর যে-কোনটাকে রূপ দেবার চেষ্টা যেখানেই হয়, সেখানেই অন্যায় অনাচার ও বিকৃতাচার এসে হাত-পা মেলে বসে। সুতরাং অগ্রগামী বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করে, এই বিকৃতির মূলোচ্ছেদ করাই হল ভাবী কল্যাণের পরিপোষক।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মাশ্রমে যৌনাচার

বিভিন্ন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে যে-সব যৌনাত্মক পূজা-পদ্ধতি ও ক্রিয়া-কলাপ প্রচলিত আছে, সাধন-ভজনের অঙ্গ এবং আত্মিক উন্নতির উপায় রূপে বহু লোক সমাজের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, দিনের পর দিন যে-সব অনুষ্ঠান করে, তার মোটামুটি পরিচয় ইতিপূর্বে উদ্ঘাটিত করেছি। কিন্তু বিষয়টি এত বড় এবং এত বৃহৎ গণ্ডীর মধ্যে এর প্রসার যে প্রসঙ্গটির অন্যান্য দিক নিয়েও আলোচনা প্রয়োজন। সাধু মহাত্মা ও ধর্মগুরু রূপে যে সমস্ত মানুষ নিত্য নিয়ত আমাদের আশেপাশে ঘোরেন, গৃহস্থ মানুষরা স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করে। আত্মিক কল্যাণের আশায় তারা তাঁদের কাছে দীক্ষা নেয়। মন্ত্র-তন্ত্র ও তুক তাক শেখে, টোটকা সংগ্রহ করে, পাপ-তাপ থেকে মুক্তির এবং পরলোকের জন্যে পাথেয় সঞ্চয়ের আশায় এঁদের শরণাপন্ন হয়। এই ভাবেই তাঁদের প্রভাব সমাজ-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়। ভক্তি মিশ্রিত পরকাল-ভীতির ফলেই তাঁদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অন্যায়, অশ্লীল, বিকৃত ও বীভৎস আচরণগুলিও লোকচক্ষে মহিমান্বিত চেহারা ধরে। বুঝে না-বুঝে লোকে সে-সবের অনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হয়। কাজেই সমাজ ও জন-সাধারণকে সতর্ক করার প্রয়োজনেই এই সব যৌনাত্মক ধর্মানুষ্ঠানের প্রকৃত স্বরূপ এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে, ধর্মের নামে এমন অনেক অভ্যাস ও আচার সমাজ-জীবনে প্রচলিত আছে, যা সুরুচি এবং সভ্যতার বিচারে উন্মত্ততা ও অপরাধ রূপে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু বিচার-বুদ্ধি বিমূঢ় জনমত এগুলোকে ধর্মাচার বলেই জানে ও বিশ্বাস করে। তাই গোপনে এগুলিকে লালন ও পোষণ করে সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য কলুষিত করতে থাকে। ইতিপূর্বের অধ্যায়গুলিতে আমি এই জাতীয় ধর্মাচারের অনেক দিক উদ্ঘাটিত করেছি। অবশিষ্ট দিকগুলির কথা এবার বলব।

শৈবদের মধ্যে গৌরীগরণ (গ্রহণ, করণ ?) নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, হয়ত অনেকে জানেন না। এই অনুষ্ঠানটি প্রকৃতপক্ষে অঋতুমতী বালিকাদের কৌমার্য হরণ ছাড়া আর কিছু নয়। দশমহাবিদ্যার প্রতীক রূপে দশটি অজাত-ঋতু বালিকাকে স্নান করিয়ে, বিমুক্ত বেশে ও বিস্রস্ত

কেশে মৃত্তিকা নির্মিত ছোট ছোট বেদীতে বসানো হয় এবং ফুল, বিল্বপত্র ও আতপ চাউল সহযোগে তাদের যোনিদেশে গৌরী-পীঠের প্রতিষ্ঠা করে শিবরূপী এক ভৈরব তাদের কৌমার্য সংহার করেন। এই ভৈরবের উচ্ছ্রিত অঙ্গকে দুধ এবং গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করা হয়, তারপর তিনি নির্মল চিত্তে শিব-মহিমায় সমাবিষ্ট হয়ে প্রত্যেকটি মহাবিদ্যার গৌরী-পীঠে শিব-প্রতীক সন্নিবিষ্ট করেন। সাধারণত একজন ভৈরবের পক্ষে এতগুলি গৌরীর কৌমার্যভেদ সম্ভব নয় বলে, তিনি প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। অর্থাৎ তাঁর প্রিয় অনুচরদের কারু কারু দেহ স্পর্শ করে দেন। তখন একদিকে বালিকাদের আর্তনাদ, অন্যদিকে শিবানুচরদের সংকীর্তন সুরু হয়। আর তারি ভেতর গৌরীগরণ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই অনুষ্ঠানের শোনিতে নিষিক্ত ন্যাকড়া 'সিদ্ধবস্ত্র' রূপে সমাজে চলে। রোগ বিনাশ, শত্রু নিপাত, মামলা জয়, পরীক্ষা পাশ ইত্যাদির ব্যাপারে বিশেষ ফলপ্রদ বিশ্বাসে অনেকে তা সংগ্রহ করে রাখেন। মাদুলীতে ধারণও করেন। জিনিষটা যে কি, তা হয়ত অনেকেই জানেন না।

উত্তর রাঢ়ের কোন কোন অঞ্চলে এ অনুষ্ঠান চলিত আছে। শিব চতুর্দশীর রাত্রে অত্যন্ত গোপনে ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হয়। সাধারণত দরিদ্র ঘরের মেয়েদের কিছু অর্থের বিনিময়ে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যাওয়া হয় এজন্যে, আর বিকৃতাসক্তি পরায়ণ দুষ্টেরা প্রতিনিধিত্ব পাবার লোভে এখানে এসে জড়ো হয়। এই ভাবে একশো আটটি কুমারী ভেদ করতে পারেন যে ভৈরব, তিনি নাকি পুরোপুরি শিবের পদবী লাভ করেন। এ রকম একাধিক শিবের অস্তিত্বের খবরও পাওয়া গেছে।

বামাচারী শাক্তদের মধ্যেও এই রকম এবং আরো অনেক রকম বিশ্রী ব্যাপার প্রচলিত আছে। তাঁরা 'ক্রিয়া' নামে যে পরিভাষিক শব্দটি সর্বদা ব্যবহার করে থাকেন, তার আসল অর্থ হল, বিবসনা কালিকার প্রতিনিধি রূপিনী একটি কৃষ্ণাঙ্গ নারী সংগ্রহ করে, সুরা পানান্তে তার সঙ্গে অস্খলিত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হওয়া। কৌল মণ্ডলীর আচার্য যিনি, তিনি এই অনুষ্ঠানে ভৈরবের ভূমিকা নেন এবং ভক্তমণ্ডলী চারদিকে বসে গীত-বাদ্য সহযোগে অনুষ্ঠানটির সৌকর্য বিধান করেন। কিন্তু ধারক শক্তির ন্যূনতা বশত অনিবার্য ভাবেই স্খলন হয়। কাজেই এক ভৈরবের পক্ষে সমগ্র লগ্নকাল কৃষ্ণাকে লিপ্ত থাকা সম্ভব হয় না। ভক্তবৃন্দ তাই পর্যায়ক্রমে ক্রিয়া করতে

করতে অমাবস্যার আসর জমিয়ে রাখেন। কোন-কোন স্থলে এজন্তে ভৈরবীরও প্রতিনিধি জোটানো হয়। মূল ভৈরবীর অঙ্গ সংস্পর্শনের দ্বারা তাঁরাও শক্তি-পদবী লাভ করেন। যেখানে একাধিক ভৈরবী যোগাড় হয় না, সেখানে এক ভৈরবীকেই প্রত্যেকটি শিবের 'ক্রিয়া' কবুল করে নিতে হয়। এ মার্গে যাঁর যত দক্ষতা, তাঁর তত বড় শক্তি। অনুসন্ধানে এই তথ্য পাওয়া গেলেও, এঁরা কিন্তু ব্যাপারটির জৈব দিককে কিছুতেই স্বীকার করেন না। এই কুম্ভক এঁদের মতে পুরুষ-প্রকৃতির সম্মেলন ছাড়া আর কিছু নয়। এই সময় শিব-শিবাণী যে তুরীয় অবস্থায় উন্নীত থাকেন, তা নাকি তাঁদের মধ্যে দিব্যদৃষ্টি সঞ্চার করে, যার ফলে তাঁরা হন বাকসিদ্ধ। পতি-পরিত্যক্তা দুঃখিনী,বন্ধ্যা গৃহিণী, মামলা-বিব্রত গৃহস্থ, রকমারি মানুষ তদ্বির-তল্লাস করে অনেক সময় এই সব আসরে উপস্থিত হন, আপন আপন ভাগ্যলিপি জানার জন্যে। এই 'ক্রিয়ার' ব্যাপ্তি সারা দেশে এবং বহু বিশিষ্ট লোকও গোপনে এর সঙ্গে জড়িত।

অঘোরপন্থা, অশোকপন্থা, মার্গ-সাধনপন্থা, আরো নানা শ্রেণীর তন্ত্রাচার চলিত আছে, যা বিকৃত যৌনাসক্তির বীভৎস নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব দলের এক ব্যক্তি একদা মৃতা নারী রমণের অপরাধে ধরা পড়েছিল। কোন রকম অপরাধের ভাব না দেখিয়ে, অম্লানবদনেই সে বলল যে মৃতদেহ আর ইঁট-কাঠ-পাথরে প্রভেদ কি? পাঞ্চভৌতিক সত্তা যখন পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে, তখন দেহবস্তুর অন্তর্গত চক্ষু, কর্ণের মতো সমস্ত অঙ্গই মৃত। সেই রকম একটি মৃত প্রত্যঙ্গে লোষ্ট্রনিক্ষেপও যা, শুক্রপাতনও তাই। তত্ত্ববিশ্লেষণ ছেড়ে, তাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার আসল উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করা হলে, সে বলল, ভূতসিদ্ধি লাভের উপায় হিসাবে এই কার্য করেছে সে। এতে আমাদের সকলেরই কল্যাণ হবে। একটি মৃতাচারী তান্ত্রিক মেদিনীপুর জেলার কোন শালবনে নিক্ষিপ্ত এক মৃতা তরুণীর ওপর মৈথুনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হচ্ছিল, এমন সময় কাষ্ঠাহরণকারী গ্রামবাসীরা দেখতে পেয়ে তাকে তাড়া করে। তারা বলে, মৃত মেয়েটিকে ভূতে গ্রহণ করেছিল। তারপর মৃত-দেহ ভক্ষণ নিরত সেই ব্যক্তি নিকটবর্তী গ্রাম্য শ্মশানে ধরা পড়ে। এ ছাড়া মৃতা নারী গমনের বিবরণ আরো আছে, এখানে তার উল্লেখ অনাবশ্যক। এ একটা বিশেষ তন্ত্রাচার এবং এর রূপক ব্যাখ্যাও সুবিদিত।

বিকৃত তন্ত্রাচারের তালিকা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পাঁচজন কৃষ্ণকায়

নারী থেকে পঞ্চ প্রকার ক্লেদ সংগ্রহ করে, তার ন্যাকড়া, 'পঞ্চ পুষ্প' নামে ব্যবহার করা, অর্থাৎ অঙ্গে ধারণ করা, যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া, প্রদীপ জ্বালিয়ে দেহ ও গৃহের আরতি করা ইত্যাদির বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ করা গেছে। এ ছাড়া মূত্রপান, শুক্রসেবন, নিষিদ্ধ অঙ্গাদি লেহন, মুণ্ডিত গুপ্তকেশের ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র রূপে ললাটে ধারণ, এমন কি পশু গমনও কোন-কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ তন্ত্রাচাররূপে অনুষ্ঠান করে, তার সংবাদ আছে।

এক শ্রেণীর শক্তি-সাধিকা আছে, যারা বাহ্যত পুংসংস্রব বর্জন করে চলে। এদের দেশজ নাম কারুণী। এদের মধ্যে একজন নারীই ভৈরব রূপে অন্যান্য নারীতে সংগত হয়। দলবদ্ধ ভাবে নারীতে নারীতে সম্মেলন, লেহন, শিবাকৃতি যে-কোন দ্রব্য সংস্থাপন ইত্যাদির অনুষ্ঠান এদের মধ্যে ব্যাপক। এই সম্প্রদায়ের আখড়া পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও আছে শোনা যায়। কিন্তু গৃহস্থ পরিবারের অন্তর্গত বাল্য-বিধবাদের মধ্যেই গোপনে এর চলতি বেশী। আবার শক্তি-সম্পর্কহীন পুরুষাচারী তান্ত্রিকও আছে। তারা কোন অভিপ্রেত বালককেই ভৈরবী রূপে গ্রহণ ও বরণ করে। বহু ভৈরবের দ্বারা উপদ্রুত এই রকম একটি বালক চিকিৎসার্থ কোন ডাক্তারের কাছে এসেছিল। বহু পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ভৈরবদের হদিশ সে বলেনি, তবে তাঁদের অভ্যাস ও অনুষ্ঠানাদির বিবরণ গোপন করে নি। যারা মৃতদেহ খায়, মল-মূত্র-রক্ত-থুথু, কিছুতেই যাদের ঘৃণা নেই, এমন একটা সম্প্রদায় যে যৌনানুষ্ঠানের ব্যাপারেও চরমতম বিকৃতির অনুগামী হবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বিপদের কথা যে, এই সমস্ত অনুষ্ঠান ধর্মাচরণ রূপে চলে এবং গোপনে সমাজের পোষকতা পায় বলেই, বাইরে কোন দিন প্রকাশ পায় না। ফলে সমাজের নর-নারী ও বালক-বালিকা নিজেদের অজ্ঞাতেই অনেক সময় এই সমস্ত ভৈরবী-চক্রে গিয়ে পড়ে এবং কু-অভ্যাসে আসক্ত হয়ে সমাজের চতুর্দিকে সেই বিষ ছড়াতে থাকে। বিকৃতাসক্তির সহজাত অনুপ্রেরণা নর-নারীর মধ্যে আছে, এ কথা আমি আগেই বলেছি। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সমাজ-জীবনে তার আবাদ ও অনুশীলন চলতে থাকলে, তার স্ফুরণ ও ব্যাপ্তি আরো ভয়াবহ হবে, এ কথা কে না স্বীকার করবেন?

বৈষ্ণবদের মধ্যেও বহু রকমের বিকৃতি প্রচলিত আছে, যার খবর হয়ত কেউ কেউ অল্প-বিস্তর রাখেন। গোপীভাবে ভজনার নামে পুরুষের কৃত্রিম স্তন ধারণ, গুম্ফ-শ্মশ্রু মুণ্ডন, ঘাঘরা অলঙ্কার পরিধান, মাসে মাসে কৃত্রিম

ঋতুপালন ইত্যাদি কোন-কোন সম্প্রদায়ের ভেতর সাধনার অঙ্গ হিসাবে চলিত আছে, এ আগেই বলেছি। এক আখড়ায় এই রকম আটজনকে দেখেছিলাম, তাঁরা 'অষ্টসখী' নামে পরিচিত। ঘোমটা দিয়ে মেয়েলী সুরে কথা বলা, চলা-ফেরা ও ওঠা-বসায় সার্থক নারীত্বের অভিনয় এঁদের এমনি সহজসাধ্য দেখেছিলাম যে এক-নজরেই সন্দেহ হয়েছিল, এঁরা হয় পুরুষত্ব বর্জিত, নয় বিকৃত আসক্তি পরায়ণ। অনুসন্ধান নিষ্ফল হয় নি। জানা গেছে যে নিজেরা ব্রজগোপী সেজে ছোট ছোট ছেলেকে রাখাল বালক রূপে আয়ত্তে এনে, খাদ্যাদির দ্বারা প্রলুব্ধ করে এঁদের কেউ কেউ তাদের সঙ্গে কুক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। কেউ কেউ নারীবেশে নাবালিকাদের মধ্যে অবাধ প্রবেশের সুযোগ নিয়ে তাদের সঙ্গে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন দু-তিনটি স্বীকৃতি থেকে জানতে পেরেছি যে প্রত্যেকটি ব্যাপারই নিষ্পন্ন হয় ধর্মাচরণের নামে এবং 'হরি হরি' 'রাধে রাধে' ধ্বনি সহকারে অনুষ্ঠানে গাম্ভীর্য সঞ্চার করা হয়।

বৈষ্ণবদের কিশোরী-ভজন অনুষ্ঠানও অনেকটা শৈবদের গৌরীগরণের মতোই। অক্ষত অঙ্গ, অনুদ্গত গুপ্তকেশ,. ব্রজ কিশোরীদের (কৃষ্ণ যাঁদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন। প্রতীকরূপিণী কুমারীদের সংগ্রহ করে কৃষ্ণরূপী গোঁসাই প্রথম তাদের কৌমার্য ভেদ করেন। তারপর কৃষ্ণের নামে উৎসর্গিত সেই কিশোরীরা অপরাপর ভক্তের সেব্যা হয়। এখানেও মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে, নাম-সঙ্গীত হয়। কিঞ্চিৎ অর্থমূল্যেই এইসব কিশোরী সংগৃহীত হয়। রসমার্গে দীক্ষা দানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি-পরায়ণ কোন-কোন দরিদ্র অভিভাবক ইচ্ছা করেও কন্যাদের এখানে পাঠিয়ে থাকেন। সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রেম-চর্চিকা বা প্রেম-চর্চরী অনুষ্ঠানের বিষয়ও কিছু কিছু সংগ্রহ হয়েছে। খুব গোপনে কোন-কোন আখড়ায় প্রচুর পরিমাণে ময়দা ঢেলে, তার ওপর রাধা-কৃষ্ণ নৃত্য-গীত ও রসলীলায় ব্যাপৃত হন, তারপর সেই ময়দায় লুচি বানিয়ে ভক্তজনের মহোৎসব হয়। এ ছাড়া বাল-গোপাল রূপে বয়স্ক ভক্ত কর্তৃক যুবতীদের ক্রোড়ে আরোহণ, স্তনপান, অথবা নন্দকিশোর রূপে কুমারীদের সঙ্গে দোল, রাস, ঝুলন এবং বস্ত্রহরণ ইত্যাদিরও অভিনয় হয়ে থাকে। সে-সব কুমারীও সংগৃহীত হয় গৃহস্থাঞ্চল থেকেই এবং অনেক স্থলে কুমারী নামে তার ভেতর বিধবা, বিবাহিতা, এমন কি পতিতাও থাকে। গোষ্ঠলীলা রূপেও অনাচার অনুষ্ঠিত হয় প্রচুর পরিমাণে। শাক্ত অঘোরীদের মতো বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যেও রকমারি ঘৃণাকারজনক ব্যাপার, যেমন শুক্রপান, কুম্ভক মৈথুন, লিঙ্গারাধনা ইত্যাদি

প্রচলিত আছে। তত্ত্ব সেই একই, পুরুষ-প্রকৃতির অভিন্ন মিলনে তুরীয়ানন্দ অনুভব এবং ঘৃণা-লজ্জা-ভয় প্রভৃতি প্রাকৃত বোধ অতিক্রম করে, নিত্য সত্য নিরঞ্জনাবস্থা লাভ। কার্যত কিন্তু ব্যভিচার ও বিকৃতাচারকেই এই ভাবে ধর্মের নামাবলী চাপা দিয়ে উপভোগ করা হয়। আর উদ্দেশ্যপরায়ণ ভণ্ডেরা ভক্তবেশে এর ভেতর ঢুকে এই যথেচ্ছাচারের অংশীদার হয়।

আউল, বাউল, দরবেশ, কর্তাভজা প্রভৃতি অপরাপর সহজিয়াদের মধ্যেও এই রকম বা আরো অনেক রকম কদনুষ্ঠান চলিত আছে। পুরুষে পুরুষে ও নারীতে নারীতে সম-মেলন, শুক্র-শোণিত পান, অবলেহন, যৌনাঙ্গ পূজা, এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যেও পূজা-পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত ও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শুক্র-সংমিশ্রিত সরবৎকে এঁদের কোন-কোন দল 'সুধা' বলেন। ঋতুসিক্ত ন্যাকড়াকে বলেন 'বজ্র' এবং তা গোপীযন্ত্র বা এক-তারাতে সংযুক্ত করে রাখেন। অপরাজিতা ফুল যোনির প্রতীক বলে, তাকে এঁরা 'টোটেম' হিসাবে ব্যবহার করেন। মৈথুন সংস্পৃষ্ট ঝুমকো জবা দিয়ে বশীকরণ মূলক একাধিক 'করণ' হয়। আসলে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, যে-কোন পর্যায়ের সহজিয়াই কতকগুলি আনুষ্ঠানিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও মূলত একই ধরণের যৌনাপচার করে থাকেন, এতে মনে হয়, আদিম কালের যৌনারাধনা নানা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে আজো অব্যাহত ধারায় বয়ে চলেছে, আর শাস্ত্রাদেশের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে টিঁকিয়ে রাখা হচ্ছে। বস্তুত নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধান এদিক থেকে বেশী পাথেয় সঞ্চয় করেনি বলেই, এর আদি-সূত্রটি আবিষ্কার করা এখনও সহজ হয়নি। কিন্তু বাংলা দেশে যে এ-পথে গবেষণা চালানোর প্রয়োজন রয়েছে, তা আশা করি পাঠক-পাঠিকা অনুধাবন করেছেন।

বলা বাহুল্য ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নর-নারীদের কুৎসা কীর্তন আমার উদ্দেশ্য নয় এবং যে-কোন বৈষ্ণব বা শৈব বা শাক্তই যে এই সব অনুষ্ঠানে লিপ্ত আছেন, এমন কথাও আমি বলিনি। সত্যকার শুদ্ধচেতা, সদাচারী ও নিষ্ঠাবান ধার্মিক নিশ্চয় আছেন। হয়ত সংখ্যায় তাঁরা অনধিক। কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পিছনেই আছে এক-এক দল দুষ্কৃতকারী, যারা অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত, দরিদ্র ও বিশ্বাসপ্রবণ নর-নারীকে ধর্মের জাল বিছিয়ে ধরে আনে ও ব্যভিচার এবং বিকৃতির পঙ্কে ডুবিয়ে দেয়। সভ্য সমাজের সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়েই যেমন চোর, জুয়াচোর, জালিয়াৎ, গুণ্ডা লোকালয়ের শান্তি ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে, এরাও ঠিক তেমনি ভাবেই তার নৈতিক জীবনকে হতশ্রী ও কদভ্যাস-দুষ্ট করে থাকে।

তবে পার্থক্য এই যে এই 'নীচের জগৎ' জন-সাধারণের বিশ্বাসে ও সহযোগিতায় লালিত হয়, তাই রাষ্ট্রের আইন এদের কোন দিন আয়ত্তে আনার সুযোগ পায় না।

কিন্তু গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে ধর্মাচরণে নিরত নর-নারীই যে কেবল বিকৃত যৌনাচার করে, তা নয়। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মার্কা-মারা নয়, এমন অনেক দলও দেখা যায়, যারা ধর্মাচরণের নামে অনেক রকম অপাচার করে থাকে। তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, গাছচালা, নলচালা, বশীকরণ, গর্ভপাত, অনেক কিছু ব্যাপারে অজ্ঞ জন-সাধারণ তাদের শরণাপন্ন হয় এবং তারাও সে সুযোগের সদ্ব্যবহার পূর্ণমাত্রায় করে। এক অবধূত তাঁর উচ্ছ্রিত ও উন্মুক্তাগ্র জননেন্দ্রিয় দিয়ে ভারোত্তলন করে মহিলাদের নমস্য হয়ে উঠেছিলেন মুর্শিদাবাদে। পায়ু ও লিঙ্গের দ্বারা জলপান করে গ্রাম্য নর-নারীকে অবাক করে দেওয়ার আর একটা ঘটনাও পেয়েছি। ঘণ্টাব্যাপী অবিরাম মৈথুনেও শুক্রপাত না হতে দেবার আস্ফালন করে, যে-কোন নারীকে তা পরীক্ষা করে দেখতে আহ্বান করেছিলেন আর এক সিদ্ধপুরুষ। গ্রাম্য নারীরা বাবার বিভূতি পরীক্ষা করার মানসে এক গোহাল ঘরে সমবেত হয়ে, কোন নষ্ট নারীকে এই কাজে নিয়োজিত করেছিল এবং শুনেছি, বাবার আশ্চর্য ক্ষমতায় বিমোহিত হয়ে তাঁকে তারা দেবতা বলেই স্বীকার করে নিয়েছিল। ত্রিপাদ দোষ থেকে এক মৃতা তরুণীকে মুক্ত করার জন্যে এক সন্ন্যাসী তার গাত্রে শুক্রক্ষেপ করে মন্ত্রোচ্চারণ করে দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন যে এই মেয়ে তিন মাসের মধ্যেই আত্মীয়-স্বজনের কারো-না-কারো গর্ভে সন্তান রূপে আবির্ভূত হবে। দর্শকদের বক্তব্য যে সত্য সত্যই তা হয়েছিল। সেই চোখ, সেই নাক, সেই রকম চলা-বলা।

উত্তর বঙ্গের কোন কোন স্থানে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এবং মাদ্রাজের নাম্বুদ্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে কুমারী মেয়ের মৃত্যু হলে, তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন-না-কোন যুবকের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় এবং সেই যুবককে আনুষ্ঠানিক ভাবে মৃতার সঙ্গে সহবাস করিয়ে, তবে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এঁরা বলেন, নইলে নাকি ঐ কুমারী কামাতুরা প্রেতিনীরূপে পরিবারস্থ যুবকদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবে। মৃতাচারী রূপে কুখ্যাত এই রকম এক যুবককে দেখেছিলাম। তাকে দেখলেই পাগলা ধরণের মনে হয়। কথা-বার্তা অসম্বদ্ধ, চোখের দৃষ্টিও অনৈসর্গিক। জিনিষটা সে স্বীকার করেছিল, তবে গুছিয়ে বলতে পারেনি সব।

অনেকেই জানেন আশা করি যে, পতি কর্তৃক পুনগৃহীতা হওয়ার জন্যে পতি-পরিত্যক্তাকে, সন্তান লাভের জন্যে বন্ধ্যাকে, জরায়ুঘটিত পীড়া থেকে মুক্ত করার জন্যে রোগগ্রস্তাকে সাধু, পীর, মুরসেদ ও মোহান্তের দয়া ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সমাজে। এই সমস্ত ব্যবস্থার অন্তর্ভেদ করলে দেখা যাবে, তা কতকগুলো কদর্য বিকৃতাচার ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন, কলার মধ্যে একটি যৌনকেশ দিয়ে তা ভক্ষণ করতে দেওয়া হয়, কুলগাছ বা বেলগাছের সঙ্গে সাত পাক ঘুরিয়ে একটু ধূলোপড়া কটিতটে নিক্ষেপ করা হয়, জীব-জন্তুর ক্লেদ মিশ্রিত আলো চাল চর্বণ করে ফেলে দিতে বলা হয়, অমাবস্যার রাত্রে মৃৎপাত্রে মূত্রত্যাগ করে, সেই হাঁড়ি ঈশান কোণে ভূপ্রোথিত করতে বলা হয়, এমনি আরো অনেক কিছু করতে বলা হয়, যা কুল-মহিলারা সকলকেই অল্পাধিক জানেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ভিক্ষুক সমাজ

ধর্ম ব্যবসায়ীদের পরই আসে ভিক্ষা ব্যবসায়ীদের কথা। বলা বাহুল্য পেশাদার ভিক্ষুকরা প্রথমটা সবাই গৃহস্থ ছিল, অন্তত পক্ষে গৃহস্থ জীবনের আশ্রয়ে ছিল, তারপর প্রবল অন্নসমস্যার তাড়নায় ছিটকে কোন ভিক্ষুকের আড্ডায় গিয়ে পড়েছে এবং অনিবার্য ভাবেই পেশাদার ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। পেশাদার গুণ্ডার আড্ডায় পড়লে ঠিক এই ভাবেই মানুষ গুণ্ডা হয়। পতিতার আড্ডায় পড়লে মেয়েরা পতিতা হয়। তারপর স্থান-কাল ও পারিপার্শ্বিকই টেনে নিয়ে চলে তাদের। নিজে চেষ্টা করলেও সে চলার প্রতিকূলে আসা যায় না। আর প্রতিকূল চেষ্টাটাও বজায় থাকে না বেশীদিন অনেকেরই।

ভিক্ষুকদের যে আড্ডার কথা বলছিলাম, তার একটা অংশ চালিত হয় রীতি-মতো মহাজনী কারবার রূপে। একদল দুরভিসন্ধী পরায়ণ অবস্থাপন্ন লোক আড়ালে লুকিয়ে বসে, আড়কাঠির সাহায্যে নানা জায়গা থেকে মা-বাপ-মরা গরীব ছেলে-মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে একত্র করে এবং ন্যূনতম অন্ন-বস্ত্র জুগিয়ে, তার বিনিময়ে তাদের দিয়ে যৎপরোনাস্তি ভিক্ষা উপার্জন করিয়ে নিয়ে নিজেরা লাভবান হয়। বলা বাহুল্য, ভিক্ষালব্ধ চাল-ডাল, কাপড়, পয়সা সব এরা দখল করে এবং সে-সবের গোপন ক্রয়-বিক্রয়ই হল তাদের আসল ব্যবসা। এই ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্যে তারা অন্ধ, খঞ্জ, মূক, বধির ও বিকলাঙ্গ ছেলে-মেয়ে পেলেই মোটা দামে কেনে। অনেক সময় অন্য কোন দলে এই রকম ছেলে-মেয়ে দেখলে, তাদের চুরি করেও আপন দলে ঢোকায়। তাছাড়া গৃহস্থঘরের ছেলে-মেয়ে চুরি করে, নানা অমানুষিক উপায়ে তাদের বিকৃত বিকলাঙ্গে পরিণত করে, তাদের দিয়ে ভিক্ষা করানোর নজরীও আছে যথেষ্ট।

এই সব ভিক্ষাব্যবসায়ী আড়ালে আত্মগোপন করে থেকে, দিনের পর দিন সুকৌশলে নূতন নূতন ছেলে-মেয়ে এনে নিজের দল পুষ্টি করছে এবং জন সাধারণের দয়াবৃত্তির সুযোগে নিজেদের তহবিল বৃদ্ধি করছে। ভূরি পরিমাণ নর-নারীকে সমুচিত জীবন-যাপন ও সঙ্গত পথে জীবিকার্জনের অধিকার থেকে চির বঞ্চিত করে সামাজিক আবহাওয়া বিষময় করে তুলেছে। অথচ মজা এই যে তারা কোনদিন ধরা পড়ে না। ভদ্রসমাজে ভদ্র সহৃদয় ব্যক্তি রূপেই খাসা দিন কাটিয়ে যায়। ভিক্ষাহরণের যন্ত্ররূপে সংগৃহীত এই

সমস্ত বালক-বালিকাকে দেবমন্দিরের সামনে, বাজারের ভিতরে, জনাকীর্ণ পথের পাশে দাঁড় করিয়ে বা বসিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে তারা তারস্বরে দয়াভিক্ষা করতে থাকে। অন্যত্র যাবার হুকুম নেই, অনেকের সে শক্তিও থাকেনা। তারপর এক সময় তাদের ডেরায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই সমস্ত দিন বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে যা সংগ্রহ হয়েছে, তার হিসাব-নিকাশ হতে থাকে। কি ভাবে এই আড্ডায় ছেলেরা ও মেয়েরা এসে পড়ে, গোপনে কি রকম জীবন সাধারণত তারা যাপন করে, তার কিছু কিছু বিবরণ এখানে উল্লেখ করছি। বর্ধমান থেকে বিমাতার অত্যাচারে বিব্রত হয়ে একটি বছর তেরো বয়সের ছেলে বিনা টিকিটে একদিন রেলগাড়ী চেপে বসে এবং কলকাতায় এসে হাজির হয়। এখানে কদিন হাওড়া স্টেশনে ইতস্তত চেয়ে-চিন্তে খেয়ে বেড়ানোর পর হঠাৎ একদিন একটা আধা-ভদ্রগোছের ছোকরা তাকে ডেকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করল এবং অন্ন-বস্ত্রের বিনিময়ে কাজ জুটিয়ে দেবে বলে এক আস্তানায় নিয়ে গেল। এই আস্তানায় সামান্যতম অন্ন-বস্ত্র মিলল অবশ্য, কিন্তু তার বদলেই তাকে পেশাদার ভিক্ষুকের জীবন মেনে নিতে হল।

এই ছেলেটির জবানবন্দীতে সর্বসাকুল্যে এই ভাবে বাধ্যতামূলক ক্রীতদাসের জীবনে নিক্ষিপ্ত আট-নটি ছেলে-মেয়ের কাহিনী পাওয়া যায়, যাদের প্রত্যেককে পথে বসে ভিক্ষা করতে হত এবং ডেরায় প্রতিপালকদের হাতে প্রত্যহ প্রহার-নির্যাতন ও নিপীড়নের কঠোরতম নিদর্শনগুলিই একমাত্র পারিশ্রমিক রূপে স্বীকার করে নিতে হত। একটি বছর নয়েকের মেয়ে পর পর দু-দিন ভিক্ষায় কিছু যোগাড় করতে পারেনি, অথবা যা পেয়েছিল, তা নিজে খেয়ে ফেলেছিল। তার শাস্তি স্বরূপ একটা বাঁকারি তার যৌনাঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং একটি বছর চোদ্দ বয়সের ছেলে দল ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল বলে, তার দুই গালে এবং নিতম্বে জ্বলন্ত লোহার ছেঁকা দেওয়া হয়। একটি বছর দশেক বয়সের মেয়ের জবানবন্দী থেকে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, সে-ও প্রায় একই রকম। সে এক ছুতোরের মেয়ে। বাপের মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে তার মা কলকাতায় আসে জীবিকার সন্ধানে। তারপর মা থাকতে আরম্ভ করে এক ব্যক্তির রক্ষিতা রূপে ও তার ঔরসে তার সন্তানাদি হতে সুরু হয়। তখন অত্যাচারিত মেয়েটা একদিন কারুকে না বলে, পালিয়ে যায় মায়ের আশ্রয় থেকে। একটি বাবু-মতো লোক কিছু পয়সা ও খাদ্যদ্রব্য দিয়ে প্রথম

দিনেই তাকে প্রলুব্ধ করে ও এক নিভৃত স্থানে নিয়ে গিয়ে তার ওপর অত্যায়াচরণ করে। অতঃপর এই বাবুই তাকে এক ডেরায় নিয়ে গিয়ে তোলে ও সেখানে তাকে নজরবন্দী হতে হয়। এখানে ছেলে-মেয়ে আর যারা ছিল, তারা সবাই ভিক্ষা করত। কিন্তু ভিক্ষার ছদ্মবেশে চুরি ও যৌন-দুষ্কৃতির দ্বারা অধিক পয়সা রোজগারের জন্যেই এদের উৎসাহিত করা হত সদা-সর্বদা। যারা চলতি পথের ফেরীওয়ালার ঝাঁকা থেকে খাবার এবং পথিকের পকেট থেকে পয়সা তুলে নিতে পারত, কিংবা যে-সমস্ত ছেলে-মেয়ে অন্যের সঙ্গে ঘৃণ্য কদাচার করে তার পারিশ্রমিক স্বরূপ বেশী পয়সা কামিয়ে আনত, তাদের রীতিমতো বাহবা দেওয়া হত এবং অনেক অপদার্থকে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণের জন্যে সুকঠিন দণ্ড দেওয়া হত। দণ্ড কি রকম, তার আভাস আগেই দিয়েছি।

এই দুটি ছেলে-মেয়েই স্ব-স্ব বাসস্থানের বিবরণ বিশদ ভাবে বলেছে। ওখানকার হালচাল সম্বন্ধেও প্রায় কিছুই গোপন করেনি। কিন্তু দুজনের একজনও নাম-ঠিকানা বলে নি। একজন বলেছে, জানি না। আর একজন বলেছে, না বাবু, তাহলে মেরে ফেলবে। বোধ হয় দলে ঢোকানোর সময় এদের এমন ভাবে তালিম দেওয়া হয়, যাতে ধরা পড়লে, এরা কিছুতেই অন্ধিসন্ধি প্রকাশ না করে দেয়। অথবা সে শক্তিই এদের বেশীর ভাগের থাকে না। একটা জিনিষ এই সব আস্তানা সম্বন্ধে আবিষ্কার করা যায়, সে হল এই যে এখানে বয়স্ক স্ত্রীলোক এবং পুরুষ যা থাকে, তার অনেক গুণ বেশী থাকে বালক-বালিকা, কারণ তারাই হল পালকদের স্বার্থ সাধনের সর্বাধিক উপযোগী। এমন কি বয়স্কদের স্থানই দেওয়া হয় না, এমন আড্ডাও আছে।

ভিক্ষা এবং চুরি থেকে সংগৃহীত পণ্য কি ভাবে বিক্রী হয়, তার বিবরণও কিছু-কিছু পাওয়া গেছে। কিন্তু সে-সব আমার আলোচনার বহির্ভূত। মহাজন পরিচালিত ভিক্ষুকদের এই ডেরাগুলো বাইরে থেকে অনেক সময় আবিষ্কার করা কঠিন। পিছন পিছন ধাওয়া করে দেখা গেছে, ব্যবসায়ী পট্টির ভেতর কোন-না-কোন বড় গুদামের, নয়ত কোন বস্তি-এলাকার একান্তে দলবর্তী ছেলে-মেয়েকে গাদাবন্দী করে রাখা হয় এবং বাইরে এগুলোকে অনাথ আশ্রম বা এতিম-খানা নামে চালানো হয়। এমনও শুনেছি যে এই নামে লোক ঠকিয়ে চাঁদা তোলা হয় এবং তা এতিমদের পরিবর্তে তাদের

প্রতিপালকদের পেট ভরায়। কিন্তু সন্ধানী লোকেরা সবাই জানে যে এগুলো পেশাদার ভিক্ষুকদের আস্তানা এবং এখানে এসে স্বল্প মজুরীর পরিবর্তে তারা ছেলে-মেয়ে কিনে নিয়ে যায়, কখনো বেগার খাটাতে, কখনো বজ্জাতী করতে। এমন ভাবেই এই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারটা ঘটে যে, তা কাকে-কোকিলেও টের পায় না। তবে ভাবীকালে যাদের শ্রম ভাঙানো যাবে, এমন ছেলে এবং যাদের পতিতাবৃত্তিতে নামানো যাবে, এমন মেয়ে এসব জায়গায় কমই পাওয়া যায়। কারণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস, কদর্য খাদ্য ভক্ষণ, কুশ্রী পরিচ্ছদ পরিধান, অত্যধিক নিপীড়ন, নানা কারণে অকালেই এরা মানুষের সম্পদ হারিয়ে ফেলে। তাই অবস্থা বিপাকে একবার ভিক্ষা ব্যবসায়ে এসে পড়লে, পেশাদার ভিক্ষুক রূপেই এদের জীবন কাটাতে হয়। তা থেকে মুক্ত হয়ে অন্য জীবনে যাওয়া আর তাদের পক্ষে সহজ বা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া আগেই বলেছি যে ভিক্ষার্জনের সহজতম উপায় হিসাবে দলবর্তী ছেলে-মেয়েদের কাণা, খোঁড়া, মূক, বধির বা দুষ্টক্ষত-গ্রস্ত করার অভ্যাসও এদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে চলিত আছে। কাজেই ফিরে যাওয়ার পথও থাকে না তাদের।

কিন্তু মহাজনী আওতার বাইরেও পেশাদার ভিক্ষুকদের বহু বহু কারবার আছে এবং সে-সব কারবার নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় এক-একটি বা একাধিক ভিক্ষুক দলপতির কর্তৃত্বে। সহরের ইতস্তত পড়ো জমির একান্তে, বস্তি অঞ্চলের আশেপাশে, হাট-বাজার, ষ্টেশন, বন্দর ও দেবাস্থানের আনাচে কানাচে ছেঁড়া চট, ভাঙা টিন ও দর্মা দিয়ে তারা গড়ে তোলে এক-একটা অস্থায়ী আস্তানা এবং তারি মধ্যে কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকা নিয়ে বাস করে। এই সব ছেলে-মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করে চাল-কাপড় এটা-সেটা সংগ্রহ করে আনে। সেই ভিক্ষার্জিত চাল-ডাল রান্না হয় একসঙ্গে, একসঙ্গেই খাওয়া দাওয়া হয়। সেদিক থেকে এই সব ডেরায় এক ধরণের আদিম সমাজতান্ত্রিকতার রূপ দেখা যায়। কিন্তু দলের অন্তর্গত নারী ও বালিকাদের ওপর দলপতির কর্তৃত্ব এবং খবর্দারীর হিসাব নিলে দেখা যাবে, এরা প্রত্যেকেই এক-একটি হিটলার বিশেষ। দলপতি কোনদিন ভিক্ষায় বের হয় না। সে আপন ডেরায় আসন গেড়ে বসে থাকে। তার আশ্রিত ও চরানুচরেরা যায় চতুর্দিকে ভিক্ষা করতে, অথবা ফরমায়েস মতো মাল-মশলা সংগ্রহ করতে। কারুকে আনতে হবে তার জন্যে একটা নেবু।

কারুকে একটু তামাক। কারুকে ছুটো পেয়েক এবং বলাই বাহুল্য, এগুলি চুরি করে আনতে হবে। এ ছাড়া কারুকে তার পা টিপতে হবে, কারুকে হাওয়া করতে হবে, কারুকে বা অন্যভাবে তৃপ্তি দিতে হবে। অণুমাত্র ব্যতিক্রম হলেই যে শাস্তি, তা কোন জেলও কল্পনা করতে পারে না।

এই রকম ভিক্ষুকের দলভুক্ত একটি বালিকাকে একদিন রাজপথে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখে, তদন্তে জানা যায় যে সর্দার দলের প্রত্যেককে রোজ আট আনা করে এনে দিতে হবে বলেছে। যারা বড় মেয়ে তারা তাই দেয়। ছেলেরাও চুরি করে আট আনা দশ আনা এনে দেয়। কিন্তু ছোট মেয়েরা পারে না। তাই লোহা পুড়িয়ে তাদের তিন জনকে সর্বাঙ্গে আজ সর্দার ছেঁকা দিয়ে দল থেকে বিদায় করে দিয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে দলের এগারোটি ছেলে-মেয়ে ও নারীর প্রত্যেকের ওপর সর্দারের অধিকার অবাধ। সে যখন যাকে খুসী যে-কোন কাজে নিযুক্ত করতে পারে। যে-কোন রকম অকাজ কুকাজ করে পয়সা কামিয়ে আনার হুকুম আছে প্রত্যেকের ওপর এবং প্রত্যেকেই সে জন্যে যথাশক্তি চেষ্টাও করে। কিন্তু সব সময় তাতে সার্থক হয় না। যেমন হয়নি এই মেয়েটি এবং তার ফলেই ছেঁকা খেয়েছে। ব্যাণ্ডেল জংসনে ভিক্ষানিরত একটি বছর এগারো বয়সের বালিকাকে দেখে জেরায় জানতে পারি যে তাকে এক ব্যাপারী বীরভূমের এক মেলা থেকে ভুলিয়ে আনে এবং প্রথম কিছুদিন তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করে, তারপর তাকে এক ভিক্ষুকের কাছে বেচে দেয়। এই ভিক্ষুক নানা জনকে ডেকে এনে, তার সঙ্গে রাত্রিবাস করায় ও তা থেকে পয়সা কামায়। এই ভিক্ষুকের আস্তানায় আরো একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে ছিল। তাদেরও নানা জঘন্য উপায়ে অর্থাহরণ করতে এবং ভিক্ষুক-মনিবের সম্পদ বৃদ্ধি করতে হত। আর একটি অর্ধমৃত বালককে একবার পথ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ভিক্ষুক আস্তানায় সে প্রহারে মরণাপন্ন হয়েছিল। একটি মেয়ের মৃত্যুর কথাও শুনেছি এই রকম একটি ভিক্ষুক বালিকার মুখে।

এই সব ভিক্ষুকের ডেরায় অনেক সময় পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দেবার জন্যে দাগী চোর এবং গুণ্ডারা এসে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। তারা দলভুক্ত বালক-বালিকাদের ওপর যথেচ্ছ জবরদস্তি চালায় এবং কোন কোন বালক-বালিকার রিপোর্ট থেকে অনুমান করতে পেরেছি যে দু-একজন দুষ্কৃতকারী এই আবহাওয়া থেকে 'ব্লু ফটোগ্রাফ' তোলে এবং সে জন্যে বেশ

দু-পয়সা খরচও করে। রকমারি যৌন দুষ্ক্রিয়ার চিত্র অন্যান্য জায়গার মতো এই সব আড্ডা থেকেও সংগৃহীত হয়ে চোরা ব্যাপারীদের হাতে হাতে সহরের অলি-গলিতে চালু হয় কি না, সেটা অনুসন্ধানের বিষয়।

পেশাদার ভিক্ষুকদের এই সব আড়তে অনুসন্ধান করলে, দেখা যাবে সেখানে যে-সমস্ত ছেলে-মেয়ে এবং বয়স্ক নর-নারীর দেখা পাওয়া যায়, তারা প্রত্যেকেই কোন সময় সমাজ-জীবনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর কোন-না-কোন দুর্বিপাকে তারা সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং কোন সমাজসম্মত বৃত্তির অভাবে ভিক্ষাকে বৃত্তি স্বরূপ নিয়েছে এবং সেই বৃত্তিকে লাভজনক করার জন্যে দয়া উদ্রেকের রকমারি কৌশল তারা বিজ্ঞান হিসাবে আয়ত্ত করেছে। ক্রমে এ থেকেই এসেছে পাইকারী হিসাবে ব্যবসা জাঁকিয়ে তোলার বুদ্ধি। দৃশ্যত কায়িক শ্রম ও বাধ্যতামূলক জীবিকার বন্ধন থেকে মুক্ত এবং দুর্নীতি ও অসদাচারের উত্তাপে সঞ্জীবিত বলে, ভিক্ষাবৃত্তি সমাজভ্রষ্টদের অনেকের কাছেই আগে একটা লোভনীয় বৃত্তিরূপে গণ্য হয়। কিন্তু এই বৃত্তির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার পর যখন দেখা যায়, এতে স্বাধীনতা নেই, স্বস্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, তখন অপছন্দ করলেও আর ফিরে আসার উপায় থাকে না। মহাজনী আওতায় যে ভিক্ষাবৃত্তি চলে, সেখানে ত নয়ই। আত্মস্বতন্ত্র দল হিসাবে যে ভিক্ষা ব্যবসা চলে, সেখানেও অবস্থা একই। কাজেই নগর জীবনের অন্তরালে গোপন পাপরূপেই পেশাদার ভিক্ষুকরা দিনের পর দিন শক্তি সঞ্চয় করছে এবং দরিদ্র ও বিত্তহীন সমাজের বেশ বড় একটা অংশ নিরুপায় বাধ্যতায় তার আওতায় এসে পড়েছে। লোকালয়ে অস্বাস্থ্য ও দুর্নীতি বিস্তার করা, বিকৃত আসক্তিকে সযত্নে লালন করা, হাজার হাজার সম্ভাবনীয়তাপূর্ণ কিশোর জীবনকে নৈষ্কর্ম্য ও অধঃ-পতনের পঙ্কে নিমজ্জিত করা, আর যা-কিছু অন্যায় পাইকারী ভিক্ষাবৃত্তি থেকে উৎসারিত হচ্ছে, তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই বিষয়টির প্রতি সতর্ক মনোনিবেশ করা দরকার।

পেশাদার ভিক্ষুকরা মোটের ওপর একটা বৃহৎ শ্রেণী হলেও, তাদের মধ্যে আবার দুটো উপ-শ্রেণী আছে। এক দল ব্যাধি ও শারীরিক অকর্মণ্যতার দরুণ শ্রমসাধ্য কাজের অযোগ্য বলেই ভিক্ষাকে বৃত্তি রূপে গ্রহণ করে। আর এক দল সুস্থ ও কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, কোন রকম উৎপাদনমূলক শ্রম না

করে, স্বেচ্ছায় ভিক্ষুকের জীবন বরণ করে নেয়। প্রথম দলের সমস্যা বোঝা অবশ্য কঠিন নয়। অন্ধ, খঞ্জ, মূক, বধির, বিকলাঙ্গ, কিংবা গলিত কুষ্ঠ বা এমনি কোন কদর্য রোগে আক্রান্ত হতভাগ্যদের, অথবা উন্মাদ ও জড়বুদ্ধিদের অন্নবস্ত্র দিয়ে পালন করার দায়িত্ব এদেশে রাষ্ট্র নেয়নি। স্বল্পবিত্ত গৃহস্থের পক্ষেও তাদের ঝক্কি পোহানো অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। এ অবস্থায় ভিক্ষা ছাড়া প্রাণধারণের জন্যে আর কি-বা তারা করতে পারে? কিন্তু যারা অনায়াসে উৎপাদন মূলক শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জন করতে পারে এবং সেই শ্রমে দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি করতে পারে, তারাও স্বেচ্ছায় ভিক্ষুকের জীবন স্বীকার করে নেয় কেন, এটাই বিস্ময়! বলা বাহুল্য, পেশাদার ভিক্ষুক বলতে প্রকৃত পক্ষে বোঝায় এদেরই। অন্ধ, আতুর, কুষ্ঠী বা বিকলাঙ্গেরা নিছক পেটের দায়ে ভিক্ষা করে। তাদের ও ছাড়া অন্য উপায় নেই! কিন্তু শত-সহস্র পথ সামনে অবারিত থাকা সত্ত্বেও যখন নীরোগ দেহ নর-নারীরা এই পথে অন্ন সংগ্রহ করা শ্রেয় মনে করে, তখন বুঝতে হবে, কোন বিশেষ ধরণের প্রবণতা বা মৎলবের প্রেরণাই তাদের এই পথে নিয়ে এসেছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ভিক্ষুক সমাজের ভেতর এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এদের অনেকেই ঘর-সংসার ও স্ত্রী-পুত্র বর্জন করে স্বেচ্ছায় নাম-গোত্রহীন ভিক্ষুকের জীবনে এসে ঢুকেছে। সাধারণত গোটা তিনেক কারণ পেয়েছি এই গৃহ-বৈরাগ্যের। হয় কোন গুরুতর অন্যায় করে, পুলিসের দৃষ্টি এড়াবার কৌশল হিসাবে এরা ভিক্ষুকতা গ্রহণ করেছে। নয় ভিক্ষুক-জীবনে দায়িত্বহীন দ্বিধা-সঙ্কোচহীন স্বাধীনতা ভোগের উদ্দেশ্য নিয়ে এই দল ঢুকেছে। নয় সমাজ-বন্ধন মুক্ত পথের জীবনে বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করার অপূর্ব সুযোগ মিলবে, এই মনে করে প্রচলিত সমাজ-জীবনকে পায়ে ঠেলে, দৈন্য, দারিদ্র্য ও গ্লানিকে খুসী মনে স্বাগত করে নিয়েছে।

কথাটা শুনলে একটু অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের গতি-প্রকৃতি যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা নিশ্চয় জানেন যে দুষ্প্রবৃত্তি ও বিকৃতাসক্তির তাড়নায় সুখ-সমৃদ্ধির জীবনকে পেছনে ফেলে, নিরাবরণ রিক্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় খুব কম নয়। কিন্তু দুনিয়ার নজীরে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নেই। আমি দেশের কথাই

বলছি। পেশাদার ভিক্ষুকদের পশ্চাদনুসরণ করে এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েই এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে তাদের মধ্যে শতকরা বিশ জনও নিছক অন্নের ধান্ধায় ভিক্ষার আশ্রয় নেয় নি। কষ্টে-স্বষ্টে দিন চলার মতো সম্বল অনেকের ছিল। কোন-না-কোন রকম কাজ-কারবার করেও অনেকে দিনাতিপাত করত। তারপর হঠাৎ একটা কিছু হয়েছে এবং তার ধাক্কাতেই সমাজ-জীবন থেকে ছিটকে তারা একেবারে ভিক্ষুক জগতে এসে পড়েছে। সেই একটা কিছু, হয় কোন রকম খুন, জালিয়াতি বা লুঠতরাজের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে, নয় ভয়াবহ কোন পারিবারিক অন্যায় করে বিপন্ন হয়েছে, তারপর বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে লোকালয় থেকে এবং জানা-চেনার গণ্ডীতে না থাকার উদ্দেশ্যে সমাজ-বহির্ভূতদের মধ্যে আস্তানা পেতেছে। মনিব-হত্যা, সহোদরা-গমন, কন্যা-গমন, জাল মুদ্রা নির্মাণ, কত রকম সামাজিক ও নৈতিক অপরাধের প্রতিক্রিয়া পেশাদার ভিক্ষুকতায় রূপান্তর লাভ করেছে, তার খবর কজন রাখেন?

কিন্তু সব চেয়ে বেশী পাওয়া গেছে, বিকৃতাসক্তির টানে লোকালয় ও সমাজ-শাসন ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই জীবনকে মেনে নেওয়ার দৃষ্টান্ত। প্রচলিত জীবনে পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলার কড়াকড়ি ষোল-আনা এড়িয়ে চলা ও যথেচ্ছ ভাবে কামনা চরিতার্থ করার সুযোগ কোথাও নেই। কাজেই প্রবল বিকৃতাসক্তির উৎপাতে যারা মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে, তারা দুষ্প্রবৃত্তির দায়ে শেষ পর্যন্ত সমাজ ও সভ্যতাকে অস্বীকার করে ভিক্ষুকতায় নেমে আসে। নয়ত এদেরই মতো সমাজ-বহির্ভূত পেশাদার গুণ্ডাদের দলে গিয়ে ঢোকে। সাধারণত নিম্নবিত্ত চাষী, মজুর ও গরীব গৃহস্থ ঘরের লোকদের এই দলে দেখা যায়। সময় সময় ভদ্রঘরের ছেলের দেখাও যে না পাওয়া যায়, তা নয়। আত্মপরিচয় এরা খুব কম ক্ষেত্রেই দিতে চায়। কাজেই এদের সামগ্রিক ইতিহাস সংগ্রহ করতে হলে, যথেষ্ট সতর্কতা ও কৌশল দরকার। নগর জীবনের উপকণ্ঠে, নয়ত কোন বৃহৎ শিল্প-কেন্দ্রের উপান্তে ভাঙা টিন ও ছেঁড়া চটের অস্থায়ী ডেরা বানিয়ে তার ভেতর নানা দিক-দেশের ও বেশ-বয়সের ভিক্ষুক নর-নারী দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা এবং সেই সুযোগে অনুসন্ধান চালানো সহজ কাজ নয়। তবে শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে পারলে, বিমুখ হওয়ার কারণ নেই।

এই রকমের একটা আস্তানায় বছর পঁচিশ বয়সের একটি স্বাস্থ্যবতী কদর্য-

কদর্যদর্শন তরুণীকে দেখেছিলাম। আগাগোড়া সে কইথী হিন্দীতে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মুখ ফসকে একটা দুটো বাংলা কথা বেরিয়ে পড়ল। তারপর জেরার মুখে জানা গেল যে সে বাঙালীর মেয়ে, হিন্দুস্থানী ভিখারীদের দলে থেকে তাদের ভাষা ও ঢং-ঢাং আয়ত্ত করে নিয়েছে। তার ইতিহাস মোটের ওপর এই : সে এক গোয়ালা গৃহস্থদের বৌ। দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় এক অহিন্দু মিস্ত্রীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে আসে। কিন্তু লোকটি কয়েক দিন মাত্র একত্র থাকে, তারপর তাকে একরাত্রে পথে ফেলে পালায়। তখন এক স্বাস্থ্যবান হিন্দুস্থানী ভিখারীকে ডেকে স্বেচ্ছায় সে তার হাতে আত্মসমর্পণ করে ও তার সাহচর্যে থাকতে থাকতেই কালক্রমে পেশাদার ভিখারিণীতে পরিণত হয়। একে জিজ্ঞাসা করি, সুযোগ সুবিধা দেওয়া হলে, সে আবার গৃহস্থ জীবনে ফিরে যেতে এবং শিষ্টভাবে দিনপাত করতে চায় কিনা! সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, না, আমি ত বেশ আছি। কারু তোয়াক্কা রাখি না। কোন কিছুর ধার ধারি না। মেগে পেতে খাই, যেখানে খুসী সেখানে থাকি। ঘরে ফিরে যাব কোন দুঃখে? বলা বাহুল্য, এই উক্তি শুধু এর মুখে শুনিনি। এটা ভিক্ষুক বৃত্তিতে স্থিরনিবদ্ধ নর-নারী অনেকেরই কথা। কাজেই বুঝতে হবে, বাইরে থেকে পেশাদার ভিক্ষুকদের জীবনকে যত দীন, দুঃস্থ ও বেদনাদায়কই মনে হক, তাদের নিজেদের কাছে এই গ্লানি-ক্লেদ ও দুঃখ-বেদনার আড়ালে এমন কিছুর প্রলোভন থাকে, যা ওরা সমাজ-জীবনে পায়নি।

আর একটা ঘটনা দিয়েও আমার এই সিদ্ধান্তের পোষকতা করতে পারি। দক্ষিণ কলিকাতার অধুনা-সমৃদ্ধ কোন অঞ্চল তখনো বস্তীঘেঁষা ছিল। শীতকালে সেখানে সার্কাস ও কার্নিভাল হত। বছরের অবশিষ্ট সময়ে সারা তল্লাট এমনি পড়ে থাকত। তারি আনাচে কানাচে ডেরা বেঁধে রকমারি জাতের ভিখারী বাস করত। একদিন কি ব্যাপারে মনে নেই, পাড়ার ছেলেরা ভিখারীদের ওপর ক্রুদ্ধ হয় ও তাদের ঠেঙানি দেওয়ার মৎলবে ছোট গোছের একটা আস্তানায় গিয়ে ঢোকে। একটি আধা-প্রৌঢ় ভিখারী ও একটি বছর বারো বয়সের বালিকাকে সেখানে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে। দুজনকে টানতে টানতে সদর রাস্তায় নিয়ে এসে, বেদম প্রহারের পর যখন জেরা সুরু করা হল, লোকটি বলল, উ আমার বহু আছে। মেয়েটির পরণে লাল ঘাগরা, গলায় পলার মালা, চোখে কাজল। কিন্তু মাথায় চুল তার পুরুষের মতো করে ছাঁটা, তাতে দিব্যি পুরুষের মতো টেরীও। তাকে নাম জিজ্ঞাসা করাতে

বলল, দেউকী। গালাগালি ও জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল যে দিউকী মেয়ে নয়, ছেলে এবং হিন্দুস্থানী নয়, ওড়িয়া।

আর একটা ঘটনাও আমার সংগ্রহে আছে। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির গাড়ী-বারান্দার নীচে কয়েক বৎসর আগে এক বর্ষার রাত্রে দুটি পথ-ভিখারী, একটি হৃষ্টপুষ্ট যুবক ও কটি মধ্যবয়স্ক স্ত্রীলোক, এসে আশ্রয় নেয়। হঠাৎ তাদের মা ও ছেলে মনে হবার কারণ ছিল। কিন্তু দণ্ডায়মান আর এক ব্যক্তি লক্ষ্য করলেন, তাদের আচরণটা যেন কেমন-কেমন। তখন তিনি তাড়না সুরু করলেন। প্রথমে ছেলেটি বলল, তারা স্বামী-স্ত্রী। তারপর স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তার বয়সের অসমানতা দেখিয়ে দেওয়া হলে, বিব্রত হয়ে বলল যে সে-ও নারী এবং দুজনে তারা অনেক দিনের বন্ধু। পরণে তার ছেঁড়া হাফ-পাৎলুন, গায়ে ততোধিক ছেঁড়া গেঞ্জী, বুকের ওপর শক্ত করে বাঁধা একটা গামছা। মাথার চুলগুলো খুঁট খুঁট করে কাটা। নাম বলল ভেমুলা (বিমলা ?)। বাড়ী বিলাসপুরে। অন্য স্ত্রীলোকটি বাংলা অঞ্চলের, বোধহয় হাওড়া বা মেদিনীপুরের। উভয়ে কারখানার কুলি ছিল, সেখান থেকে দুজনে সম্বন্ধের সূচনা এবং শেষ পর্যন্ত কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ।

ভিক্ষুকদের যে সমস্ত কদর্য অভ্যাস ও আচরণের কথা এতক্ষণ বলা হল, হয়ত তা ভয়াবহ কিছু নয়। কিন্তু সত্যকার ভয়াবহ এবং রীতিমতো কুৎসিত বা ঘৃণ্য অভ্যাসের পরিচয়ও প্রচুর পাওয়া যাবে। ইতিপূর্বে আমি ধর্ম-ভিক্ষুকদের প্রসঙ্গে তার কতকগুলো দিক উদ্‌ঘাটিত করেছি। অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব মতে যাকে ক্লেদাসক্তি বলা যাবে, এদের মধ্যে পর্যাপ্ত ব্যাপ্তি দেখেছি তার। নোংরা অপরিচ্ছন্ন জায়গায় বসবাসে, বাসি-পচা ও পরিত্যক্ত খাদ্য ভক্ষণে, আঁস্তাকুড়, নর্দমা ও শ্মশান-ঘাট থেকে কুড়োনো জামা-কাপড় পরিধানে এদের খুসী থাকতে দেখেছি। ফেলে দেওয়া পাঠার ছাল, মাছের কাঁটা-কানকো, পচা আলু-বেগুন এরা অম্লান বদনে উদরসাৎ করে। ডাষ্টবিন, নর্দমা এবং সহরতলীর ময়লা-মুল্লুক হাঁটকে পাওয়া জিনিষ-পত্রকে এরা আসবাব রূপে গণ্য করে। যৌন-রুচিতেও দেখেছি এদের একই রকম ক্লেদাসক্তি। ঘৃণ্য ক্ষতে খসে পড়ছে এমন স্ত্রীলোককে এরা পরমানন্দে সহচরী রূপে নেয়। শীর্ণ কঙ্কালসার অভুক্ত বালিকাকে এরা যদৃচ্ছ কুকর্মে ব্যবহার করে। ব্যাধিতে ভয় নেই, বিপদে দৃকপাত নেই, অপরাধে সঙ্কোচ নেই। যত্রতত্র আহার, যত্রতত্র মল-মূত্র ক্ষেপ, তারি সঙ্গে যৌনাচার, জুয়া খেলা, গান, মুশায়ারা, মারামারি

নিয়ে এরা আত্মস্বতন্ত্র এক-একটা জাতি রূপেই মূল জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করে।

নগরের পথে যখন অন্ধ নারীর হাত ধরে কোন সুস্থ যুবক টিনের কৌটা এগিয়ে দেয় পথচারীদের সামনে, কিংবা বিক্ষতদেহ কোন নারীকে ঠেলা-গাড়ীতে বসিয়ে ঠেলতে ঠেলতে কোন চৌ-রাস্তার মোড়ে নিয়ে এসে, তারস্বরে চীৎকার করে একটি পুরুষ বা নারী জন-সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, কিংবা গলিতদেহ কোন বালককে কাঁধে বা পিঠে নিয়ে ট্রাম-যাত্রীদের কাছে পয়সা ভিক্ষা করে, তখন কেউ কি ভাবতে পারেন যে এদের পরিচয় মাত্র এই টুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়? এরা অনেক ক্ষেত্রে কেউ কারু আপন জন নয়। হয়ত এক দেশ বা জাতির লোকও নয়। এক পক্ষের দৈহিক অসামর্থ্যকে আর এক পক্ষ আপন জীবিকার্জনের পন্থা স্বরূপ গ্রহণ করেছে এবং তারি কৌশল হিসাবে নকল সম্পর্কের ফাঁদ পেতে জনগণকে ঠকাচ্ছে। সতর্ক অনুসন্ধানে এই সব সম্পর্কের রহস্যভেদও কিছু কিছু করা গেছে।

একটি অন্ধ বালিকার হাত ধরে মাঝে মাঝে প্রায়-বৃদ্ধ এক ভিখারী কোন কলেজ-সংলগ্ন পার্কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকত। নিজেকে সে বাতে পঙ্গু এবং মেয়েটিকে তারি অন্ধ মাতৃহীন কন্যা বলে চালাত। একদা কালিঘাট-ফলতা রেল লাইন ধরে পদব্রজে যেতে যেতে, একটা অপরিচ্ছন্ন আড়াল মতো জায়গায় দুজনকে এমন অবস্থায় দেখা গেল, যাতে বোঝা গেল যে ওরা পিতা-পুত্রী ত নয়ই, মেয়েটি বাংলা দেশেরও নয়। আর একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোককে মাঝে মাঝে দেখেছি, কালিঘাট ও অন্যান্য স্থানে অনেকের কাছে পয়সা ভিক্ষা করতে। সঙ্গে তার একটা পনেরো-ষোল বছরের আধ-পাগলা মতো ছেলে থাকত। সে বলত তারি ছেলে। একদিন ছেলেটা দেখলাম স্ত্রীলোকটিকে নির্দয় ভাবে প্রহার করছে এবং সে-ও কদর্যতম ভাষায় গালি-গালাজ করছে। তথ্য যা আবিষ্কৃত হল, তাতে জানা গেল যে ঐ বালকের একাধিকার লঙ্ঘন করে স্ত্রীলোকটি নাকি এক পায়খানা সাফ-করা কাহারের সঙ্গে কুকার্য করেছে। তারি পরিণতি হল এই কলহ ও মারামারি।

কিন্তু কেবল নকল সম্পর্কের ফাঁদ পাতাই এদের একমাত্র কৌশল নয়। রূপ-সজ্জায় এবং ভাবের অভিব্যক্তিতেও এরা কোন বড় অভিনেতার চেয়ে কম যায় না। যত অন্ধ, খঞ্জ, বধির বা বিকৃত বুদ্ধি ভিখারীকে সর্বদা হাটে-বাজারে ও পথে-ঘাটে দেখা যায়, তাদের সকলেই যে সত্যি সত্যি বিকলাঙ্গ নয়, তার

প্রমাণ বহুবার পেয়েছি। একটি অন্ধ ফকিরবেশী ভিখারী মাঝে মাঝে ভিক্ষায় আসত। লুঙ্গীপরা অবস্থায় সেই ব্যক্তিকে একদিন সাদার্ণ এভেন্যুতে ঘুঁড়ি ওড়াতে দেখলাম। দক্ষিণ হস্তের পেটিতে পরীর উল্কি এবং ওপর-পাটির সামনের ছুটি দাঁতে পেতলের পেরেক দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। তারপর কথা বলিয়ে নিঃসংশয় হলাম। আর একটি জড়বুদ্ধি বুড়ী আসত অ্যা-অ্যা করে ভিক্ষা চাইত। তার নাম আমরা দিয়েছিলাম ল্যালা। একদিন তাকে দেখলাম, দিব্যি কথা বলছে এবং সঙ্গে তার একটি মাঝ-বয়সী স্ত্রীলোক। এ ছাড়া ধুনো ও মেটে-সিঁদুর তেলে গুলে চটচটে মতো করে পায়ের গোছে লাগিয়ে, তার দুই প্রান্তে কালো কুটকুটে ন্যাকড়ার পটি জড়িয়ে কৃত্রিম ঘা তৈরী করা, নাকের বা চোখের ওপর তিসির ডেলা লাগিয়ে কুশ্রী আব তৈরী করা, পেট-কাপড়ের তলায় মালসা বেঁধে উদুরী সৃষ্টি করা, চোখের তারা উল্টে অন্ধ সাজা · অনেক রকম কৌশলই পিছু নিয়ে নিয়ে ধরতে পারা গেছে। বোবা, কালা এবং খোঁড়া সাজার অভিনয় ত হর-হামেশাই দেখেছি। কাজেই সব আতুরই আতুর নয়, এটা মনে রাখতে হবে।

অবশ্য প্রকৃত আতুরও আছে। কিন্তু অনেক সময়ই তারা ভিক্ষা করে যা পায়, তার উপসত্ব তারা ভোগ করে না, করে এই সব মৎলবী ভিক্ষুকরা। এরাই এদিক-সেদিক ঘুরে তাদের সংগ্রহ করে আনে এবং দুটি দুটি খেতে দিয়ে, তার বিনিময়ে তাদের দিয়ে ভিক্ষে করিয়ে নেয়। মধ্য কলকাতার পথে একটা মাথামোটা ক্ষতাকীর্ণ দেহ ছেলেকে একটা ছেঁড়া চটে বসিয়ে, গোটা কয়েক আধলা-পয়সা নিজেই তার সামনে ছড়িয়ে দিয়ে, আড়ালে একটি বলিষ্ঠ লোককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে দেখেছি বহুদিন। এই রকম একটি শীর্ণ মেয়েকেও দেখেছি। তার একটা হাত নেই, একটা চোখেও পুরু ব্যাণ্ডেজ। কৌতূহল বশত কাছে বসে সস্নেহে জেরা আরম্ভ করলাম। জানা গেল যে নগদ পাঁচ টাকা মূল্যে কিনে নিয়ে একটা লোক তাকে দিয়ে এই করাচ্ছে। তার হাতটা সত্যিই নেই, কিন্তু চোখের বাঁধনটা নকল। লোকটা তাকে খেতে দেয় না, মারে এবং অন্যান্য জুলুমও নাকি করে। কিন্তু সমগ্র ইতিহাস পাওয়ার আগেই মেয়েটা বলল, তুমি চলে যাও বাবু। ওই সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাকে এখনি মারবে। যাঁকে দেখলাম, তিনি মূর্তিমান একটি যমদূত বিশেষ। কাজেই আর কিছু না জেনে চলে আসতে হল।

এই রকম আরো অনেক ঘটনাই আছে, যার সাধারণ পরিচয় এই অধ্যায়ের

গোড়ায় বলা হয়েছে। কি ভাবে গরীব ছেলে-মেয়ে ভিক্ষুক-দলে এসে পড়ে, তাদের নিয়ে কি ভাবে কারা ভিক্ষার কারবার চালায় এবং তারি আড়ালে রকমারি যথেচ্ছাচার, তার অনেক দিকই দেখিয়েছি তাতে। কিন্তু সব পেশাদার ভিক্ষুকই তা বলে এই ভাবে ক্লেদ ও পঙ্কের ভিতর নেমে যায় না, বা নাগরিক জীবনের উপান্তে নিক্ষিপ্ত আবর্জনার সামিল হয়ে থেকে, তারি আড়ালে জীবন ধারণ ও দুষ্প্রবৃত্তি তোষণ করে না। সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও, সুকৌশলে শিষ্ট সমাজের গায়ে গা লাগিয়ে থাকে এবং একটা কোন জুতসই অজুহাতে ভালো উপার্জন করে, এমন ভিক্ষা-ব্যবসায়ীর সংখ্যাও কম নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা ভিক্ষা করে, আমি তাদের কথা বলছি।

পীর, ফকির, দরবেশ, মুসকিল-আসান প্রভৃতি ধর্ম-ভিক্ষুকের মুসলিম সংস্করণ এবং বাউল, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, উদাসী, ক্ষ্যাপা প্রভৃতি হিন্দু সংস্করণ যে আসলে একই বস্তু, এ বোধহয় সহসা মনে হয় না অনেকের। এরাও কোন রকম উৎপাদনমূলক শ্রম করে না। চামর, চিমটা, বাতিদান, যাহক একটা কিছু হাতে নিয়ে গৃহস্থ বাটীতে এসে হানা দেয় এবং কীর্তন, ভজন, পীরের গান ও জারী শুনিয়ে চাল, কাপড় ও পয়সা আদায় করে নিয়ে যায়। অনুসন্ধানে দেখা যাবে, এরাও গার্হস্থ্য জীবন পিছনে ফেলে স্বেচ্ছায় ভিক্ষুকের জীবনে এসেছে এবং প্রকাশ্যে ভিক্ষা ও আড়ালে অনাচার ও বিকৃতাচার করে বেঁচে আছে। একাধিক ডাকাতির মামলায় এই শ্রেণীর ধর্ম-ভিক্ষুককে জড়িত হতে দেখেছি। এ ছাড়া ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক, বশীকরণ, গর্ভপাত, শত্রুনিধন ইত্যাদির জন্যে শেকড়-বাকড়, মাদুলী, কবচ বিতরণ করা, চরিত্রহীন নর-নারীকে গোপনে গুম্ভন, বাজীকরণের বন্ধ-ধন্ধ শিখিয়ে দেওয়া, এসবও এদের অনেকের নিয়মিত অভ্যাস। বলাই বাহুল্য, হরিনাম বা কালিনাম বা পীর-মহিমার আড়ালেই এই সব দুষ্কৃতির ব্যবসা সমাজে চলে যাচ্ছে।

কোন ভদ্রমহিলা মৃতবৎসা রোগের প্রতিকারে এই রকম এক পীরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। পীর তাঁকে ঔষধ দিতে স্বীকৃত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এক চিমটি ধুলো হাতে নিয়ে, তাতে গোটা দুই ফুঁ লাগিয়ে, তাঁকে কটিদেশ অনাবৃত করতে বলে। প্রথমটা তিনি অস্বীকৃতা হন। পীর তাতে বলে, পড়া ধুলো উদ্দিষ্ট স্থানে প্রক্ষেপ না করে যদি নষ্ট করি, তাহলে সর্বনাশ হবে। ভিটে জ্বলে যাবে। স্বল্পবুদ্ধি গৃহস্থ বধূ নিরুপায় ভাবে সম্মত হলেন। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে বুঝলেন তিনি যে পীর একটা প্রতারক ছাড়া আর কিছুই নয়! এই শ্রেণীর

আধা-তান্ত্রিক আধা-ফকির ভাবাপন্ন ভিক্ষুকরা মাঝে মাঝে লাউয়ের কালো খোলা হাতে, পদ্মবীজের তসবী গলায়, লোকালয়ে আসে এবং এই রকম বা অন্য অনেক রকম ধাপ্পাবাজীর দ্বারা পয়সা কামিয়ে নিয়ে যায়। জ্যোতিষী, সন্ন্যাসী, বাকসিদ্ধ, উদাসী বা জাতিস্মর সেজে আপাত দৃষ্টিতে বিশ্বাস্য দুচারটি কথা শুনিয়ে মহা-মহা বিজ্ঞ লোককে তাক লাগিয়ে দেয়, এমন ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটতে দেখেছি। প্রকৃত পক্ষে এরা সবাই পেশাদার ভিক্ষুক এবং এই ছদ্মবেশের অন্তরাল ভেদ করলে দেখা যাবে, এরা যে জীবন যাপন করে, তা দুর্নীতি, অন্যায় ও অনাচারে পরিপূর্ণ।

এক উদাসী কোন কলেজের ছাত্রকে ইচ্ছামাত্রে যে-কোন মেয়েকে আয়ত্ত করার উপযোগী মন্ত্র দেবার নাম করে, এক বস্তির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঔষধ খাইয়ে কি ভাবে পাগল করে দেয়, তার বিবরণ অন্যত্র বলেছি। এক বৈষ্ণব নিরাপদ প্রসবের ঔষধ বলে এক প্রথম-প্রসূতিকে এমন শেকড় দিয়েছিল, যার ফলে ভ্রূণচ্যুতি ও রক্তস্রাবে তাঁর মৃত্যু হবার উপক্রম হয়েছিল। এই সব ধর্ম-ভিক্ষুকদের কতক কতক ডেরার ভেতরকার খবর যা পেয়েছি, তাতে দেখেছি, সে-সব স্থানে বদমায়েসি ও ইতরতার অবাধ চর্চা চলে। বহু দুষ্ট প্রকৃতির লোক এই সব আস্তানার সন্ধান জানে এবং রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে সেখানে যাতয়াত করে।

এক বাউলের কাছ থেকে খাঁটি গ্রাম্য গান উদ্ধারের আশায় তার ডেরায় গিয়েছিলাম। সেখানে শাড়ীপরা এক যুবককে দেখলাম। তার গোঁফ কামানো, সিঁথেয় সিঁদুর, হাতে চুড়ি। বলল, আমার প্রকৃতি। বহু ফন্দি-ফিকির করে তার কাছ থেকে শুধু বাউল গানই বের করা গেল না, বাউল সমাজে নানা প্রক্রিয়ার 'শাস্ত্রসম্মত' তত্বও বের করা গেল। এই যুবকের নাম দেওয়া হয়েছিল মালতী। এ ছাড়া আর একটি তরুণ 'প্রকৃতি'ও ছিল তার, কিন্তু তার সাক্ষাৎলাভ আর ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। এই শ্রেণীর ধর্ম-ভিক্ষুকদের একটি নারী-সংস্করণও আছে। ভৈরবী, মাতাজী, গোঁসাইনী, নানা নামে তারা চলে। ইতিপূর্বে তাদের কথা আমি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। তাদেরও নেশা এবং পেশা একই। কালিঘাট অঞ্চলে খড়ম-পরা এই রকম এক বছর-পঁয়ত্রিশ বয়সের মাতাজীকে প্রত্যহ একদল ইতর ব্যক্তির সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে বসে গাঁজা খেতে এবং যৎপরোনাস্তি কুকথা বলতে দেখেছেন আশা করি অনেকেই। ঘাটেই একদা তার বসবাস ছিল। স্নানান্তে বহু কুল-মহিলা তার কাছে দাঁড়িয়ে

তত্ত্বকথা শুনতেন। কথাটা, মুলাটা পূজাস্বরূপ দিয়ে, কেউ কেউ স্বামী পরিত্যক্তা কন্যা বা ভগিনীকে এনে গোপনে মায়ের দয়া ধরিয়ে নিয়ে যেতেন, এমন খবর পেয়েছি। আবার কোন কোন দুষ্ট বালক বা যুবক তার ঘরে ঢুকে রাত কাটাত, এমন কথাও লোকে বলেছে। রাজ্যের পাগলী এবং ভিখারিণী বালিকা সংগ্রহ করতে অভ্যস্ত আর এক উদাসিনীকে দেখেছি। এই আশ্রিতাদের দিয়ে পয়সা উপার্জন করানোর দুর্নাম তাঁর চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং প্রধানত এই জন্যেই পাড়ার লোক তাঁকে শেষ পর্যন্ত মার-ধোর করে পাড়া ছাড়া করে। এঁরও এক সময় খুব পসার ছিল এবং বহু লোক সাধারণের অজ্ঞাত নানা ব্যাপার নিয়ে এঁর কাছে দরবার করত এবং সেজন্যে মোটা দক্ষিণা দিত। করতাল বাজিয়ে ভিক্ষা করতে অভ্যস্ত এক বৈষ্ণবী মাঝে মাঝে আসত এবং বয়স্কা গৃহিণীদের কৃষ্ণকথা শোনাত। এরি ভিতর একটু বেচাল প্রকৃতির পুরুষ দেখলে, সে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করত এবং তার হেপাজতে রক্ষিত মেয়ে জুটিয়ে দেবার আশ্বাসে অগ্রিম বখশিস দাবী করত। প্রতারিত এক ব্যক্তির হাতে তাকে লাঞ্ছিত হতে দেখেই ব্যাপারটা এক দিন জানাজানি হয়ে যায়।

কিন্তু আর পুঁথি বাড়াব না। মোটের ওপর পেশাদার ভিক্ষুক সমাজের পরিচয় এই। প্রথমে যাদের কথা বলেছি, তাদের সঙ্গে এদের প্রভেদ এই যে এরা খোলাখুলি ভিক্ষা না করে, জন-কল্যাণের ভাঁওতা দিয়ে ভিক্ষা করে এবং প্রকৃতপক্ষে সমাজভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও, ভাঙাচোরা ভাবে একটা গার্হস্থ্য জীবনের কাঠামো বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করে। বিবাহিত পতি-পত্নী বা পুত্র-কন্যা এদের অনেকেরই নেই। কারু কারু রক্ষিতা বা রক্ষিত আছে। কিন্তু বেশীর ভাগেরই আছে রকমারি দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মতো সঙ্গী বা সঙ্গিনী। তারা এদের অন্নে প্রতিপালিত হয় এবং এদের শাসন ও সংরক্ষণের গণ্ডীতে বন্দীস্বরূপ থেকে, এদের ও এদের মক্কেলদের বদখেয়াল মিটিয়ে তার বিনিময়ে মোটা টাকা কামিয়ে দেয়। এই শ্রেণীর সর্দার ভিক্ষুকদের কারুকে কারুকে কালক্রমে ধনী হয়ে পড়তে দেখা গেছে। একজন বাড়ীও কিনেছিল। অবশ্য আর এক শ্রেণীর ভিক্ষুকও দেখা যায় এবং তারাও পেশাদার। তাদের ঘর-বাড়ী আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে, এমন কি, কিছু কিছু টাকা-পয়সাও আছে। তারা কেউ কাছা গলায় দিয়ে মাতৃশ্রাদ্ধের জন্যে ভিক্ষা চায়। কেউ মুখে খড় এবং হাতে সরা নিয়ে গো-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে পয়সা ভিক্ষা

চায়। ভদ্রসন্তান বেকার হয়ে পড়েছি বা ছেলেরা ও স্ত্রী সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এই বলে দয়া ভিক্ষা করে, এমন ভিক্ষুকও আশা করি সকলেই দেখে থাকবেন। এই রকম সৌম্যমূর্তি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে এসপ্ল্যানেডের ট্রামডিপোয় অল্পদিন আগেও দেখা যেত। দক্ষিণ কলিকাতায় তাঁর নিজের বাড়ী আছে এবং বাড়ীর অবস্থাও স্বচ্ছল। বলাই বাহুল্য, এটাও একটা বিকৃত মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। নিজেকে ভিক্ষুক সাজিয়ে তার আড়ালে কোন অবদমিত ইচ্ছা চরিতার্থ করাই এর আসল উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুলি-মুল্লুক

নাগরিক সভ্যতার প্রয়োজনে বন্দর, শিল্পকেন্দ্র, ডক, রেল-ইয়ার্ড, খনি, চা-বাগান ইত্যাদি যতই প্রসার লাভ করছে, ততই প্রবল অন্ন-সমস্যার তাড়নায় ভূমিহীন কৃষক ও কারিগর সমাজ স্ব-স্ব দেশ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নগরে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এখানে তারা কেউ বা বাঁধা মজুরীর শ্রমিক রূপে, কেউ বা স্বাধীনজীবী দিন-মজুর রূপে অন্নাহরণ করে। বাঁধা মজুরীর শ্রমিকদের জন্যে মালিকরা কুলিবস্তী বানিয়ে দেন। সেখানে মেয়েরা মেয়েদের এবং পুরুষরা পুরুষদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। আবার স্ত্রী-পুরুষে একত্র হয়ে বাস করে, ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর-সংসার করে, এমনও আছে। দিন-মজুরদের বৃত্তি এবং বাসস্থান নির্বাচনের দায়িত্ব তাদের নিজেদের। যারা কল-কারখানায়, রেলে, মিউনিসিপ্যালিটিতে ফুরণের কাজ করে, অথবা ফেরিওয়ালা, ঝাঁকামুটে, রিক্সা-টানিয়ে রূপে খুচরো রোজগার করে, তাদের কতকাংশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সুলভ ভাড়ার আস্তানায়, নয়ত খাটালে আর পাঁচজন সমব্যবসায়ীর সঙ্গে দল বেঁধে বাস করে। কতক বা গলি-ঘুঁজির অন্ধকারে কোন রকমে মাথা গুঁজে থেকে দিন কাটায়।

কি কুলিবস্তিতে, আর কি এই সব প্রাইভেট শ্রমিক পল্লীতে, অশিক্ষা, অপরিচ্ছন্নতা, দারিদ্র্য ও কদাচারের তাণ্ডব লীলা চলতে দেখা যায়। এদের বেশীর ভাগই সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পূর্ণ রূপে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে সহরে আসে, তাই পিছু-টান এদের একদম থাকে না। তারপর যে আবহাওয়ায় এরা জীবিকাহরণ ও বসবাস করে, তাতে কোন শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতার বাঁধনও নেই। স্বভাবতই এরা অতীত ও ভবিষ্যৎহীন, সুরুচি ও সংস্কারহীন একদল যথেচ্ছজীবী নর-নারীতে পরিণত হয়। অর্থের জন্যে কতকটা শ্রম না করলে নয়, তাই সেটা করে। অবশিষ্ট সময় এরা অতিবাহিত করে মদ্যপান, ইতরতা ও গুণ্ডামিতে। বলা বাহুল্য, জীবিকার্জনের পন্থা, জীবন-যাপনের পদ্ধতি এবং বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক প্রভাবই এদের এই রকম ছন্নছাড়া, নীতি-শৃঙ্খলাহীন অমানুষে পরিণত করে।

আগে বস্তি-শ্রমিকদের কথা বলি। এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই বিবাহিত। যারা বিবাহিত, তারাও আপন আপন সংসারের দায়িত্ব অনায়াসে

অস্বীকার করে চলে এসেছে। অথবা শ্রমিক-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হবার পর অবস্থাগতিকেই তার সংস্রব চ্যুত হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখেছি, অনেক মেয়েই প্রথম স্বামীর সঙ্গে সহরে এসেছিল রোজগার করতে। তারপর হয় স্বামী তাকে ফেলে পালিয়েছে, নয় সে-ই অন্য কোন লোকের সঙ্গে সংসর্গ স্থাপন করে স্বামীকে বর্জন করেছে। স্বামী-স্ত্রী রূপে ঘর পাতিয়ে যারা বসবাস করছে, অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তারাও অনেকে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী নয়। সাময়িক খেয়ালে দুটি স্ত্রী-পুরুষ একত্র হয়ে ঘর বাঁধে, তারপর যে মুহূর্তে খেয়াল মিটে যায়, সেই মুহূর্তে একজন আর এক জনকে ফেলে চলে যায়। এই ভাবে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংস্রব থেকে যে সমস্ত সন্তান-সন্ততি জন্মায়, কি পিতা আর কি মাতা, কেউ বেশী দিন তাদের জন্যে দায়ী থাকে না। হাতে-পায়ে একটু ডাঁটো হলেই, তারা বাপ-মায়ের সংসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হয়ত বাপ-মা কোথায় যায়, তা টেরই পায় না। তারপর নাম-গোত্র-হীন বস্তি-শিশু রূপে তারা ইতস্তত চেয়ে-চিন্তে বড় হতে থাকে। পরবর্তী কালে এরাই আবার নূতন শ্রমিক গোষ্ঠীর সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং একই পথে নিজেদের পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করতে থাকে।

বস্তি অঞ্চলে সুনীতি ও সদাচার বলে কোন কিছুর বালাই নেই। দুর্নীতি ও নোংরামি দিয়েই সেখানে জীবন সুরু হয়। আট দশ বছর থেকে পনের-ষোল পর্যন্ত বয়সের যত ছেলে-মেয়ে বস্তি অঞ্চলে দেখা যায়, তারা পিতা-মাতার পালনাধীনেই থাক, আর নিরাশ্রয়ই হক, প্রত্যেকেই তাড়ি খায়, গুণ্ডামি করে এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের অনাচার কদাচারে অংশীদার হয়। বস্তিঅঞ্চলের দূষিত আবহাওয়ায় মানুষের রুচি তার স্বাভাবিক প্রবণতা হারিয়ে ফেলে বলেই এটা হয়, অথবা সমাজবদ্ধ জীবনে যে নিয়ম-শৃঙ্খলার ভয়ে মানুষ রকমারি দুষ্ট ইচ্ছা দমন করে চলতে বাধ্য হয়, তার অভাবেই এখানকার নর-নারীরা বিকৃতি ও বিরুদ্ধ আচারকে এমন সহজ ব্যাপার মনে করে, সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে এটা নিঃসন্দেহ যে অত্যন্ত অল্প বয়স থেকে বস্তি অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা বয়স্কদের কার্য-কলাপ চোখের ওপর দেখতে অভ্যস্ত হয় বলেই, তাদের মন থেকে এ সম্বন্ধে ভয় ও সঙ্কোচের ভাব দূর হয়ে যায়। এমন কি, যথাসময়ের আগেই এ বিষয়ে তারা রীতিমতো আগ্রহশীলও হয়ে ওঠে। সেই সুযোগটাই দুষ্কৃতাচারীরা নিয়ে থাকে, যার ফলে সমস্ত বস্তিঅঞ্চলেই বালক-বালিকাকে দেখা যায় কুক্রিয়ায় অতিশয় পোক্ত হতে।

এই সব অন্যায় শুধু যে বস্তির পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। বস্তিবাসিনীরাও এ সব বিষয়ে কম পটু নয়। অল্প বয়স্ক ছেলেদের প্রলুব্ধ করে অধঃপাতে দেওয়া এবং বালিকা ও যুবতীদের কুপথে আকর্ষণ করা তাদেরও প্রতিদিনের অভ্যাস। অবশ্য পুরুষের অন্যায় অনাচারকে এরা যতটা কাজের কাজ হিসেবে গণ্য করে, নারীর আচরণকে তা করে না। পুরুষের নাবালিকায় উপগত হওয়া এদের মতে পৌরুষের পরিচায়ক, পক্ষান্তরে নারীর নাবালকে আসক্তি এদের কাছে নিন্দা ও কটূক্তির বিষয়। পুরুষেরা ত বটেই, যারা এই কাজ করে, নারীরাও তাদের সম্বন্ধে যা-তা মন্তব্য করে! কিন্তু করলে কি হবে? জিনিষটার চল ওদের মধ্যে এত বেশী যে খুঁজলে বোধহয় এ থেকে ষোল-আনা মুক্ত নারী শতকরা তিন-চার জনের বেশী পাওয়া যাবে না। স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্র ঘর পেতে বাস করছে, অথবা সত্য সত্যই স্বামী-স্ত্রী, এমন সমস্ত নর-নারীও সুযোগ সুবিধা পেলেই এ-সব করে বসে।

সবাই জানেন, বস্তিঅঞ্চলের অনাচার ব্যভিচার নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি ও দাঙ্গা-কাজিয়া প্রচুর হয়ে থাকে। একজনের স্ত্রীকে বা প্রণয়িনীকে বা কাঙ্ক্ষিত বালককে আর একজন ভাগিয়ে নিলে, তা নিয়ে প্রচণ্ড ঠ্যাঙাঠেঙি হয়। মেয়েরাও স্বামী বা প্রিয় ব্যক্তি হস্তচ্যুত হলে, মারামারি বাধাতে কসুর করে না। এমন কি, প্রিয় সঙ্গিনী নিয়েও মেয়েতে মেয়েতে চুলোচুলি বাধার দু-চারটি ঘটনা সংগ্রহ করা গেছে। কিন্তু মজা এই যে ঝগড়া-ঝাঁটি বা লাঠালাঠি যাই হক, শেষ পর্যন্ত সব কিছুকেই এরা সহজ বলে অনুমোদন করে নেয়। জীবনের ভিত্তি যেখানে সমাজ স্বীকৃত নয়, সম্পর্কের বন্ধনও সেখানে স্বভাবতই শিথিল। তাই সাময়িক ভাবে যে যাকেই ভালোবাসুক, আর যে যাকে নিয়েই বসবাস করুক, নূতনত্বের সুযোগ পেলে পুরাতনকে পায়ে ঠেলতে কারু বাধে না।

সাধারণ ভাবে এই হল বস্তি-মুল্লুকের স্থূল পরিচয়। এদের মধ্যে যে-সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসতার, অথবা অনুচিত গমনের যে-সমস্ত ঘটনা ঘটে থাকে, তার কথা এখানে বললাম না। মালিক বা ওপরওয়ালাদের তৃপ্ত্যর্থে দেহদান করে, অথবা তদুপযোগী মেয়ে সরবরাহ করে, কি ভাবে স্ত্রী-পুরুষকে চাকরি রাখতে হয়, অথবা গোপনে টাকা খেয়ে মাঝে মাঝে এক ঝাঁক মেয়েকে তাদের অজ্ঞাতসারে কি ভাবে মেয়ে-ব্যবসায়ীদের খপ্পরে তুলে দেওয়া হয়, তার বিবরণও আপাতত অপ্রকাশ রইল। চা-বাগান, ডক,

রেল-ইয়ার্ড ও কল-কারখানার আভ্যন্তরীণ জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকার জন্যে সে-কাহিনী কিছু কিছু পরে বলতে চেষ্টা করব।

রিক্সাওয়ালা, ঝাঁকা-মুটে, ফড়িয়া বা হকারের ব্যবসায়ে যারা জীবিকার্জন করে, অথবা যারা ঘোড়ার গাড়ী, গোরুর গাড়ী, বা বাস-ট্যাক্সি চালায়, কিংবা দুধ বিক্রী করে, চা-বিস্কুট অথবা ঝাল-চানার দোকান দেয়, তারাও অনেকে বস্তি শ্রমিকদের মতো পরিবারচ্যুত এবং সমাজ বহির্ভূত সম্প্রদায় রূপে বিভিন্ন সহরের অলি-গলি ও আনাচে-কানাচে বসবাস করে, এ আশা করি সবাই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু বস্তি-কুলিদের মতো নিঃসম্পর্কে স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকার মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে বাসের সুযোগ নেই বলে, এদের পক্ষে যথেচ্ছ ভাবে চলার সুযোগ নেই। জীবিকা ও বাসস্থানের মতো সহযোগী আহরণেও এদের অনিশ্চয়তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়।

যারা এদের মধ্যে একটু ভালো রোজগার করে, যথা বাস ও ট্যাক্সি চালকরা, কিংবা গোরু-মহিষের খাটল ওয়ালারা, তাদের অনেক সময় সমদল-বর্তীদের নিয়ে এক-একটা আড্ডা গড়ে তুলতে দেখা যায়। এই সব আড্ডায় সময় সময় এরা যৌথ-প্রতিপালনে একটা দুটো স্ত্রীলোক রাখে। এ ছাড়া নিম্নশ্রেণীর পতিতালয়ে যাওয়ার অভ্যাসও এদের অনেকের থাকে। কিন্তু এদের সব চেয়ে বেশী আসক্তি দেখা যায় অন্যদিকে। অধিকাংশ এই শ্রেণীর বৃত্তিজীবীকেই একটা করে বেতনভুক বালক সহকারী রাখতে দেখা যায়। প্রকার ভেদে তারা কেউ বাসে, ট্যাক্সিতে, কেউ বা খাটালে, নয়ত একটা কিছুর দোকানে কাজ করে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী রোজগার তারা করে অনাচারের কারবারে। এই বালক সহকারী নিয়ে সময় সময় এদের মধ্যে রক্তারক্তি হয়ে থাকে। দু-একটা ছেলে প্রাণও হারিয়েছে।

কিন্তু খুচরো রোজগারের স্বল্প সঞ্চয় নিয়ে যাদের বেঁচে থাকতে হয়, যেমন হকার, রিক্সাম্যান, ফেরীওয়ালা প্রভৃতি, যৌথ-প্রতিপালনে রক্ষিতা রাখার বা বেতনভুক বালক সহকারী পোষার সামর্থ্য তাদের নেই। তারা নিজেরা যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়ে অন্নাহরণ করে, যত্রতত্র চট বা কম্বল বিছিয়ে পড়ে থাকে। তারা তাই পথে-ঘাটে সুযোগ-সুবিধা মতো সহচর বা সহচরী সংগ্রহ করে থাকে। অনেক সময় দেখেছি, দেবস্থান, রেল-ষ্টেশন ও হাট-বাজারের আশেপাশে ভ্রাম্যমান ভিখারিণী, পথের পাগলী, বা এই ধরণের বাতিল স্ত্রীলোককে এরা এদিক-সেদিকে নিয়ে যায়। অনেক সময় আবার রাজপথে

ভিক্ষানিরত সহায়-সম্বলহীন বালক-বালিকাদের সঙ্গেও এদের ঘনিষ্ঠ হতে দেখা যায়।

বস্তি অঞ্চলের শৌচাগার, ডক, মাল-গুদামের গ্যাং-ওয়ে, রেল-ইয়ার্ডের বা ময়লা-মুল্লুকের ফাঁকা জায়গা, এই সবই হল স্বল্পবিত্ত দিন-মজুর ও তাদের সঙ্গীদের সম্মেলন স্থল। গভীর রাত্রে যাঁরা সহরের পথে আনাগোনা করেন, তাঁরা হয়ত দেখেছেন নিদ্রিত গৃহস্থবাটীর গাড়ী-বারান্দার নীচে, জনহীন গলির কোণে, এমন কি, কোন দোকানের ঝাঁপের আড়ালে, অথবা জনহীন নগরের ফুটপাথেও অধিক রাত্রে সময় সময় এরা কি জীবন যাপন করে।

এই সমস্ত নাম-ঠিকানাহীন অনিশ্চিতজীবী শ্রমিকদের একটা স্ত্রী-সংস্করণও দেখা যায়। গোড়ায় তারা হয়ত সহরে এসেছিল কোন না-কোন ব্যক্তির সঙ্গে রুজি-রোজগারের ধান্দায়। তারপর যে ভাবেই হক, গড়াতে গড়াতে একদিন বৃত্তিহীন, পরিচয়হীন শ্রমিক শ্রেণীতে এসে দাঁড়িয়েছে। এরাও গলি-ঘুঁজির অন্ধকারে কোন একটা পোড়ো বাড়ীতে, নয়ত কোন খাটাল বা আস্তাবলের একান্তে মাথা গুঁজে দিন কাটায় এবং ঘুঁটে বেচে, টুকিটাকি ফলমূল বেচে, নয়ত এখানে-সেখানে যুরণ খেটে পেটের ভাত করে। বয়স সম্ভাব্যতার সীমানায় থাকা পর্যন্ত এরা নিজেদের অনুরূপ পুরুষ জুটিয়ে, তার সঙ্গে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাস করে এবং বলাই বাহুল্য যে এই ভাবে কিছু অর্থোপার্জনও করে। তারপর বয়স বেশী দূর এগিয়ে গেলে, যখন খরিদ্দার মেলে না, তখন এরা ধরে অন্যপথ। সমাজ জীবনের ঝটতি-পড়তি পুরুষদের জুটিয়ে তখন এরা প্রবৃত্ত হয় রকমারি অনাচারে। ঐ সব দুষ্কৃত-কারীদের হাতে রাখার জন্যে উৎকোচ হিসাবে এরা তাদের জন্যে নাবালক ছেলে-মেয়েদের ভুলিয়ে এনে দেয়।

আর এক শ্রেণীর স্বাধীনজীবিনী স্ত্রীলোকদের মাঝে মাঝে দল বেঁধে সহরে আসতে দেখা যায়। এই সব দলে সময় সময় একটা দুটো পুরুষ থাকলেও এবং অনেকের কোলে শিশুসন্তান দেখা গেলেও, এদের কারুরই কিন্তু স্বামী বা সংসার নেই, নির্দিষ্ট বা নির্ভরযোগ্য কোন জীবিকাও নেই। রাজপথে, গৃহস্থপল্লীর অভ্যন্তরে, ষ্টেশনে, দেবস্থানে, এরা যা-তা দিয়ে একটা করে অস্থায়ী ডেরা বানিয়ে বাস করে এবং এখানে-সেখানে ধামা, ধুচুনি বা ডালা, কুলো বিক্রী করে বেড়ায়। সময় সময় কুকুর বা বাঁদর ছানা বিক্রী করে, তা-ও দেখেছি। সাধারণত এরা বেদে নামে পরিচিত। কিন্তু

অনুসন্ধানে জেনেছি, এরা সকলেই অন্নসমস্যার তাড়নায় সমাজ-জীবন থেকে উৎখাত হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর আত্মরক্ষা ও জীবিকার্জনের প্রয়োজনে দলবদ্ধ হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন একটা জায়গায় স্থায়ী ভাবে বসবাসের ইচ্ছাই হয়ত এদের গোড়াতে থাকে। কিন্তু জীবিকা-হরণের ধারাবাহিক অনিশ্চয়তা এদের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। ক্রমে তাই থেকে এরা যাযাবর শ্রেণীতে পরিণত হয়। তখন কোন একটা জায়গায় টিঁকে থাকা বা কোন একজন লোকের সঙ্গে জীবন যাপন করা আর এদের কারু দ্বারা হয়ে ওঠে না। এদের দলে খুব কম সংখ্যক পুরুষ মানুষ যা দেখা যায়, তা জোগাড় হয় এদের এই বিরামহীন পথ-চলার ভিতরেই। এই সব পুরুষ এদের দলে থাকে নিতান্তই ভারবাহী ও প্রজনন কার্যের সহকারী রূপে এবং এরা দলের সাধারণ সম্পত্তি স্বরূপ। এরা কেউ পরিশ্রম করে না, সবাই শুয়ে বসে দিন কাটায়, নয়ত পোষা কুকুর ও বাঁদরকে সহবৎ শেখায়। মেয়েরাই এদের রোজগার করে খাওয়ায় এবং বলাই বাহুল্য, তার বিনিময়ে এদের উপর যৎপরোনাস্তি প্রভুত্ব করে।

লোকমুখে শুনেছি, এরা জন্মনিরোধ, গর্ভপাতন, শুক্রধারণ ইত্যাদির উপযোগী টোটকা দাওয়াই ও শেকড়-বাকড় বিক্রী করে এবং যৌন রোগের চিকিৎসক রূপে রোগগ্রস্তদের নানা উপদেশ বাৎলে দিয়েও নাকি পয়সা আদায় করে।

ধন-বণ্টনের অসাম্য ও সমাজ-বিন্যাসের অসঙ্গতি এই সব মানুষের জীবনের ভিত্তিমূল এমনি শিথিল করে ফেলেছে যে স্ত্রী-পুরুষে সমাজবদ্ধ হয়ে, শিষ্ট জীবন যাপন আজ তাদের মধ্যে খুব বড় একটা অংশেরই শক্তির বাইরে চলে গেছে। নাগরিক সভ্যতার পরিপোষক রূপে বন্দর, বাণিজ্য কেন্দ্র ও কল-কারখানা যতই বাড়ছে, ততই ধনতান্ত্রিক সমাজে পাইকারী ব্যবসায়ের উৎপাদক ও যোগানদার রূপে এই সব সমাজভ্রষ্ট নর-নারী দলে দলে নগর-জীবনে এসে জড়ো হচ্ছে, আর উৎকেন্দ্রিক জীবন ও দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় দিনে দিনে বিকৃতি ও বৈকল্যের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এদের বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিয়ে থাকে। তাই সেখানে তারা মানুষের জীবন যাপন করতে পারে, যার অভাবে এদেশে তারা পশুর অধম হয়ে পড়ছে।

সমাজ ও পারিবারিক সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন শ্রমিক সমষ্টির কথা আগেই বলেছি। তারা কি অবস্থায়, কি আবহাওয়ার মধ্যে দিন যাপন করে এবং সেই আবহাওয়া অনিবার্য ভাবে তাদের কি করে কদাচার, অনাচার ও দুষ্কৃতির দিকে আকর্ষণ করে, তা-ও বলেছি সেই প্রসঙ্গে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই ভূমিহীন, সমাজহীন মজুর সমষ্টির ভিতর বাঙালীর সংখ্যা কম। বাংলা দেশের দীন দরিদ্রেরা প্রধানত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। যার ভূমি নেই, সে-ও গ্রামে থেকে অন্যের জমিতে ভাগে-বর্গায় চাষ করে কায়ক্লেশে অন্ন সংগ্রহের চেষ্টা করে। নেহাৎ নিরুপায় হলে, তবেই সহরে এসে মুটে, মজুর বা ফড়িয়ার বৃত্তি গ্রহণ করে। কিন্তু তার সংখ্যা খুব অল্প। এই শ্রেণীর ভূমিহীন, বিত্তহীন বাঙালী যে হারে চোর-ডাকাত হয়, ভিখারী, বৈষ্ণব, বাউল, ফকির হয়, তার তুলনায় বৃত্তিজীবী কুলি হয় অনেক কম। এটা হয়ত বাঙালী চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য। কুলি-মুলুক সম্বন্ধে এদেশে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তাতে ভিক্ষা বা বেশ্যাবৃত্তির দ্বারা জীবিকাহরণকেও তারা কুলি হওয়ার চেয়ে ভালো মনে করে। তাছাড়া কল-কারখানার হাড়ভাঙা খাটুনিকে যে তারা ভয় করে বিশেষ রকম, এটাও বহুজনের জবানবন্দীতে পেয়েছি।

বস্তুত এই অক্ষমতা ও অন্ধ স্বাজাত্যভিমানের ফলেই শ্রমিক-জগতের প্রতিযোগিতায় বাঙালী পিছিয়ে পড়েছে। বিহারী, উত্তর প্রদেশী, নাগপুরী, তেলেঙ্গী, ওড়িয়া ও পাঞ্জাবীই বাংলার কল-কারখানা, বন্দর, ডক, রেলপথ অধিকার করে আছে। তাদের বেশীর ভাগেরই না আছে আপন জাতি ও জন্মভূমির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ, না পেরেছে তারা এদেশের সঙ্গে কোন রকম নাড়ীর যোগ স্থাপন করতে। স্বভাবতই তাদের মধ্যে কোন রকম সামাজিক বা নৈতিক সংস্কারের বালাই নেই। ব্যভিচার, বজ্জাতি, গুণ্ডামি, সর্বশ্রেণীর দুষ্কৃতিকে তারা তাই প্রাত্যহিক কর্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে।

তাদের এই আত্মচেতনাহীন অবস্থাটা যে পুঁজিপতিদের কাম্য, এ অবশ্য বলাই বাহুল্য। কারণ এই অবস্থার সুযোগেই তাদের শ্রম-শক্তিকে স্বল্পতম মজুরীর বিনিময়ে দিনের পর দিন শোষণ করা সহজ হচ্ছে। ইদানীং ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের মাধ্যমে এদের সংহত ও সংস্কৃত করার কিছু আয়োজন হয়েছে। কিন্তু চাহিদার অনুপাতে তার আয়োজন এত কম যে এখনো পর্যন্ত মজুরী-বৃদ্ধির প্রয়োজনে ধর্মঘট করানো ছাড়া, শ্রমিকদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্যে তাঁরা আর কিছুই করে উঠতে পারেন না।

যাই হক, বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে শ্রমিক-জগৎ নিজস্ব ভাবেই একটা জগৎ এবং সে-জগৎ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও অনাচারে বিধ্বস্ত। নোংরা ঘিঞ্জি, অপরিচ্ছন্ন বস্তিতে তাদের বাস। ন্যূনতম অন্ন-বস্ত্রও তাদের জোটে না। কোন ক্রমে বেঁচে থেকে একদিকে তারা করে ধনতন্ত্রের পরিসর স্ফীত, অন্যদিকে করে লাম্পট্য, খুনোখুনি ও কদাচার করে সামাজিক সংহতির বনিয়াদ শিথিল। যৌনবিকারের ভয়াবহ অতিশয্য যে এ জীবনে অনিবার্য হবে, এ ত বলাই বাহুল্য। এমন কোন অন্যায় ও অনাচার নেই, যা এরা অনুষ্ঠান না করে এবং যা দিনের পর দিন অবাধে অনুষ্ঠিত হয় বলেই, এ মুল্লুকে সাধারণ ঘটনা রূপে গৃহীত না হয়! ইতিপূর্বের অনুচ্ছেদে এই সব অনাচার ও ও বিকৃতাচারের প্রকৃতি নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করেছি। কতকগুলো বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে এবার বিষয়টির স্বরূপ বিশ্লেষণ করব।

খড়গপুরের কুলিধাওড়ায় এক পঞ্চায়েতী বিচার দেখেছিলাম। বিষণ আর ভালুয়া নামক দুই পিতা-পুত্রে পরস্পর কাজিয়া করে পঞ্চায়েতে হাজির হয়। বিষণের অভিযোগ, ভালুয়া তার আপন ভগিনী রামদুলারীর ধরম নাশ করেছে। ভালুয়ার অভিযোগ, বিষণ তার আপন কন্যার সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। রামদুলারীকে তলব করা হল। সে স্বমুখেই কবুল করল যে মায়ের মৃত্যুর পর থেকে পিতা ও ভ্রাতা উভয়ে তাকে জোরপূর্বক নিপীড়ন করে আসছে এবং যে-কেউ তাকে বিবাহ করতে চায়, তাকেই বিধিমতো ভাবে বাধা দিচ্ছে। পঞ্চায়েত উভয় আসামীকে পঁচিশ ঘা করে পাদুকা দণ্ড দিল এবং রামদুলালীর সঙ্গে অন্য একটি যুবকের বিবাহের অনুমতি দিল। বিবাহ উৎসবে হাজির হবার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু পঞ্চায়েতের নির্দেশক্রমে সকলের সামনেই উক্ত যুবক যখন তার ভাবী পত্নীকে হাত ধরে গুমটির দিকে নিয়ে গেল তখন সকলেই তাতে উল্লাসে ছা-রা-রা-রা করে উঠল, এ দেখে এসেছি। লাকমিনি নামক আর একটি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোককে একদিন মাথা মুড়িয়ে গলায় পায়খানার ঘটি বেঁধে, কুলিরা খোলার বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল। অনুসন্ধানে জানা গেল যে সে তার সতীন বেটা কদমার সঙ্গে অনাচারে লিপ্ত। পর পর তিনবার হুঁসিয়ারী দেওয়া সত্ত্বেও নাকি ওরা অনুচিত ব্যবহার বন্ধ করেনি। তার ফলে কদমাকে আপাদমস্তক ঠেঙিয়ে টাট্টিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে এবং লাকমিনিকে লোকালয়ের বাইরে বের করে দেওয়া হচ্ছে। লাকমিনিকে জেরা করে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু কদম কিছুই গোপন করল না।

সে বলল, দারু উরু পিলে তার মেজাজ ঠিক থাকে না। তখন তাকে প্ররোচিত করা হলে, সে কি করবে? কদমার গায়ে লোহার শিক পুড়িয়ে গোটা দশেক ছেঁকা দেওয়া হয়, তারপর প্রায় অর্ধ-মৃত অবস্থায় পায়খানায় ফেলে রাখা হয়। জানি না এরপর ওরা কোথায় গিয়েছিল বা ওদের কি অবস্থা হয়েছিল।

জঘন্যতম যৌনাপরাধের নিদর্শন বলেই এই দুটো ঘটনা এখানে উল্লেখ করলাম। অন্যের স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে ব্যভিচার করার এবং তা নিয়ে ঠেঙা-ঠেঙি বাধার, বা বলপূর্বক অন্যের স্ত্রী ও মেয়ে ছিনিয়ে নেওয়ার এবং তার ফলে রক্তারক্তি হওয়ার ঘটনা এই মুল্লুকে এত বেশী ঘটে যে তার বিবরণ দিতে গেলে, একখানি বইয়ে কুলিয়ে উঠবে না। মোটের ওপর মনে রাখতে হবে যে এই মুল্লুকে প্রচলিত গার্হস্থ্য আদর্শের বনিয়াদ অত্যন্ত শিথিল। এত শিথিল যে সর্বাপেক্ষা দুরতিক্রম্য সম্বন্ধের গণ্ডীকেও এখানে মানুষ নির্বিচারে লঙ্ঘন করে বসে। একটা অস্পষ্ট শালীনতার সংস্কার মনের ভেতর চাপা থাকে বলেই, এই সব ক্ষেত্রে ওরা একটা পঞ্চায়েতী বিচার বা দণ্ডদানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু প্রাত্যহিক অভ্যাস তার অনুকূল নয় বলেই, তা ওদের চিত্তে কোন দাগ ধরায় না। স্বভাবেও কোন পরিবর্তন ঘটায় না। যে আবহাওয়ায় ওরা মানুষ হয়, বসবাস করে, তার প্রভাব কোথায় যাবে? আসলে অন্ধ প্রবৃত্তির হাতে ওরা অসহায় বলির পশুর মতো। আপন আচরণের জন্যে দায়িত্ব নেবার মতো আত্ম-চেতনাই ওদের নেই। ওরা অনেকে ঠিক জানেও না এগুলো কেন অন্যায়।

হুগলি অঞ্চলের কোন মিলের সংলগ্ন বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক গুমটিতে এক বছর-দশেকের রোরুদ্যমানা বালিকাকে প্রায় ষাট বৎসর বয়স্ক কোন মুসলমান কুলির হাত থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রহার-বিব্রত ঐ বৃদ্ধ বলল যে সে ওকে দু-রোজের ফুরণে এক টাকা দরমাহা দিয়েছে! এক রোজ এখনো বাকী। সেটা উশুল করে নেবেই সে, কিছুতেই ছাড়বে না। এ জন্যে সে ফাটকে যেতেও রাজী। শেষে আট-আনা পয়সা ফেরৎ দিয়ে, তাকে বিতাড়িত করা হল। আর মেয়েটি সেখানে দাঁড়িয়ে মুখ ভেংচে তাকে লাথি দেখাতে লাগল।

একটি পশ্চিমা ছেলে কোন কুলি-ধাওড়ায় ছুরিকাহত হলে, হাঁসপাতালে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে ছুরিকাঘাতের কারণ স্বরূপ- সে বলে

যে এক মুলকী আদমির রক্ষিত রূপে সে এত দিন ছিল। কিন্তু এখন সে তার সংস্রব ছিন্ন করে অন্য এক নেপালী বাবুর সঙ্গে দোস্তি করেছে, এতেই রাগ করে দেহাতী তাকে ছুরি মেরেছে। জেরা ও জিজ্ঞাসায় জানা যায় যে সে তার বেওয়া ভাউজীর সঙ্গে দেশ থেকে আসে। তারপর ভাউজী এক ব্যক্তির সঙ্গে ভেগে গেছে। এখন সে একা। বয়লাটে কাজ করে। সম্প্রতি বোখার হওয়ায় তার দরমাহা নেই, তাই অন্যভাবে তাকে বাঁচার কথা ভাবতে হচ্ছে। বদন বা চেহারা খারাপ হয়ে যাওয়ায় অনেকেই তাকে কাজ দিতে চায় না। কেউ কেউ চাইলেও, দক্ষিণা অতি সামান্য দেয়। তাকে গৃহস্থবাড়ীতে চাকরের কাজ দিতে চাওয়া হল। সে রাজীও হল। কিন্তু দিন দশেকের মধ্যে দেখা গেল, নিজের যৎসামান্য তৈজসপত্র নিয়ে, না বলেই সে উধাও হয়েছে। গৃহবিচ্যুত যাযাবর জীবনে ঘরের বন্ধন সহ্য হল না।

পুরুষসমাজের মতো নারীসমাজেও অনুসন্ধানে অনেক আশ্চর্য ও অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। দু-একটি বলছি। বছর পঁচিশের এক বিলাসপুরী কামিনকে এক বাঙালী মজুর সঙ্গিনী রূপে পাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায় অনুরূপ বয়সী আর একটি কামিন এমন ভাবে মেয়েটিকে অধিকার করে ছিল যে যুবকটি কিছুতেই আর কাছে ভিড়তে পারে না। ওরা দুজনে এক কামরায় থাকত, এক বিছানায় শুত, এক সঙ্গে চাকরি ত করতই। পুনঃ পুনঃ আবেদনে বিচলিত হয়ে, অবশেষে মেয়েটি যুবকটিকে বলে যে সে যদি তার বান্ধবীর সঙ্গেও ভাবে রাজী থাকে, একমাত্র তাহলেই সে তার প্রার্থনা রাখতে পারে। যুবকটি রাজী হয়, যদিও অন্য স্ত্রীলোকটিকে তার মোটেই মনে ধরে না। তাকে সে বর্জন করারই চেষ্টা করে। শেষে তাই নিয়ে একদিন ঝগড়া ও মারামারি বেধে যায়। তার অভিপ্রেত প্রেমিকা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে, একখানি কুর্ণিক দিয়ে সজোরে তাকে আঘাত করে এবং লোকটিকে তার ধাক্কায় আহত হয়ে হাঁসপাতালে যেতে হয়। এই লোকটির বক্তব্যে পাওয়া যায় যে মেয়ে দুটিতে ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, মান, অভিমান, সবই হত ঠিক দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার মতো, আবার সব কিছুর অবসানে দুজনে মিলনও হত প্রগাঢ় ভাবে। যুবকটি ওদের বলত 'চিপটি'।

এই রকম 'চিপটি'দের কাহিনী আরো কয়েকটি পাওয়া গেছে। পিয়ারী নাম্নী এক বালিকাকে তার মা একদিন ঝাঁটাপেটা করছিল। কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে, ক্রুদ্ধ মা বলল, কত তাজা-তাজা জোয়ান ছোকরা ওকে

পেতে চায়। পয়সা, খাবার, খোসবাই তেল দিতে চায়। কিন্তু পোড়ামুখী কিছুতেই রাজী হবে না। জোর-জুলুম করে কারুর সঙ্গে ঘরে আটক করলে ডুকরে চেঁচিয়ে একশা করবে। ওর শুধু যত রাজ্যের পুরুষ-পরিত্যক্ত আধ-বুড়ীর সঙ্গে ভাব। ও তাদের সঙ্গে হরদম চিপটানি করবে, আর দু-খিলি পান, দুটো পয়সা, এই নিয়ে ঘরে আসবে। এ রকম মেয়েকে অকারণ ভাত খাইয়ে পয়সা নষ্ট করায় লাভ কি? মেয়েটির বয়স বড় জোর চোদ্দ। বিধিমতো জেরা-জিজ্ঞাসায় সে কবুল করল যে সে জনা তিনেক মেয়ের সঙ্গে এ পর্যন্ত সম্পর্ক করেছে বটে, তবে তাদের কেউ বুড়ো নয়, কারু ঘা-সুজাক নেই। কথ-প্রসঙ্গে সে বলল, চিপটানি বিদ্যাটি তার মায়েরও অবিদিত নয়। আসলে এখন সে তাকে 'রাণ্ডী' বানাতে চায়, তাতে ও রাজী হচ্ছে না, তাইতেই মা এমন অত্যাচার করছে!

একটি প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স্কা উড়িয়া কামিন একটি বছর পনেরো বয়সের খোট্টা ছেলেকে অন্ন-বস্ত্র দিয়ে প্রতিপালন করত। ছেলেটির খাওয়া-পরা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তার গরজের অন্ত ছিল না। তাকে সেবা করতেও সে কসুর করত না। ছেলেটা তবু বিনা কারণেই মাঝে মাঝে তাকে ছেড়ে পালাত। একদিন রথের মেলায় পলাতক ছেলেটাকে পেয়ে, স্ত্রীলোকটি হৈ-চৈ করে এমন কাণ্ড বাধিয়ে দিলে যে অল্পক্ষণেই তাদের চারপাশে মজা-বিলাসীদের ছোটখাটো একটা জনতা জমে গেল। তারা ব্যাপারটা কি জানতে চাইলে, স্ত্রীলোকটি বলল, আপন ইজ্জত ডুবিয়ে, পয়সা খুইয়ে, ওর জন্যে সে ফতুর হয়েছে। এখন বেইমান কিনা তাকে ছেড়ে পালাতে চায়। ওকে সে মেরেই ফেলবে, তারপর নিজেও মরবে। ছেলেটি বলল, ও একটা বুড়ী, একটা ভৈঁসী, ওর সঙ্গে সে আর থাকতে চায় না। ও জোর করে তাকে কেন আটকে রাখতে চায়? জনতার ভিতর থেকে হাসি-টিটকারি চলতে লাগল। স্ত্রীলোকটির তরফ থেকেও রোদন ও গালাগালি চলল অফুরন্ত ধারায়। অবশেষে শ্রীমানের দয়া উদ্রিক্ত হল। বিশ্রী একটা শব্দ উচ্চারণ করে সে বলল, চল তবে··মেলা থেকে এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনে তার হাতে দিয়ে, স্ত্রীলোকটি প্রেমময়ী সাধ্বীর মতো গটগট করে তার সঙ্গে চলতে সুরু করল। আর চারিদিক থেকে লোকেরা হেসে, হাততালি দিয়ে, এই অসমবয়সী প্রেমিক যুগলকে সম্বর্ধিত করতে লাগল। এই জাতীয় ঘটনা কুলি-মুল্লুকে যাঁদের ঘনিষ্ঠ আনাগোনা আছে, তাঁদের অনেকেরই কিছু-না-কিছু জানা আছে।

অন্যান্য অনাচারের ঘটনাও এই সব মহলে, বিশেষত দেশ-ঘর থেকে উৎখাত এবং নানা স্থানে বেদিয়া-হাঘরী রূপে বিক্ষিপ্ত নর-নারীর সমাজে কম ঘটে না। হাওড়ার কোন সুরকি-কলের সন্নিকটবর্তী ডোবার ধারে ঘোটকী পীড়নের অপরাধে দুটি যুবক ধৃত হয়। উত্তম-মধ্যম প্রহারের ফলে উভয়ে কবুল করে যে তারা এ কাজ করে। এ কাজ তারা কেন করে, তার উত্তরে একজন বলে, সে শুনেছে, এতে বেমার সারে। মুখে ধুচুনি পরিয়ে দরজা-বন্ধ ঘোড়ার গাড়ীর ভেতর কুকুরী পীড়ন নিরত এক মিস্ত্রীকে পুলিশ ধরেছিল। এই কাজের কৈফিয়ৎ স্বরূপ লোকটি বলে যে কুকুরীটিকে সে খাইয়ে দাইয়ে বড় করেছে। সে তার এটুকু কাজে না লাগলে চলবে কেন? তাছাড়া এতে দোষ কি? সে ত কোন মানুষকে ধরে নি, কোন নারীকেও বে-ইজ্জত করেনি! টালিগঞ্জ রেলপুলের সন্নিহিত বস্তী-এলাকায় ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে শূকরী ব্যবহারে প্রবৃত্ত এক ধাঙড় যুবককে ধরা হয়েছিল। সে বলে যে তাদের সমাজে এ ব্যাপার বহুল পরিমাণে চলিত আছে। তার কথায় এটা-ও জানা যায় যে মেহ ও গর্মির চিকিৎসা হিসাবে শূকরী নিয়োগকে ওরা প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে করে। বলাই বাহুল্য, পশুর প্রতি উৎপীড়ন এবং লোকালয়ে অসদৃষ্টান্ত প্রসারের অপরাধে এরা সকলেই দণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু যতদূর মনে হয়, বিবেক-বুদ্ধির আচ্ছন্নতা বশত এরা কেউ বোঝেনি, এদের আচরণে অপরাধ হয়েছে কি হয়নি।

নারীদের মধ্যেও এই কু-অভ্যাসের কিছু কিছু নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। হেস্উডের লেখায় দেখা যায়, পশ্চিম বঙ্গের কোন মফস্বল সহরে ডাক-বাংলো সংশ্লিষ্ট শৌচাগারে এক মেথর তরুণীকে তিনি কুকুর নিয়োগ করতে দেখেন কলকাতার উপকণ্ঠে কোন মাঠের ওপর ষাঁড়ের স্খলিত শুক্র তুলে নিয়ে এক ঘুঁটেওয়ালীকে আপন দেহে লেপন করতে দেখার আর একটি ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রথমটিকে তিনি বলেছেন, বঞ্চিত নারীর আচরণ। আর দ্বিতীয়টিকে বলেছেন, কোন রতিজ ব্যাধির জন্যে গ্রাম্য চিকিৎসা ব্যবস্থার অনুগমন। কলকাতার কোন হাঁসপাতাল সংলগ্ন (এবং তৎকালে পরিত্যক্ত) বেদিয়াদের ছাউনিতে একদা কয়েক টাকা বখশিসের বিনিময়ে কোন বদ-চরিত্র লোককে এক হা-ঘরী রমণী পোষা কুকুরের সঙ্গে যৌনাচারের দৃশ্য দেখিয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে, নিরুপায়ের উপায় রূপে, যৌন ব্যাধির প্রতিষেধ রূপে এবং অসুস্থ তৃপ্তির উপকরণ রূপে এই সমাজে অন্যান্য অপরাধের মতো

কিছু পরিমাণ পশু ব্যবহারও প্রচলিত আছে। গৃহপালিত পশুর অবিচ্ছিন্ন সাহচর্য এর একটা কারণ হতে পারে। কারণ চাষী-গৃহস্থদের মধ্যেও এ সবের চলন আছে, এমন খবর পেয়েছি। ওরা পশুকে ঠিক পশু রূপে দেখে না। দেখে অনেকটা আত্মীয় রূপেই। স্বভাবতই আসক্তি চরিতার্থ করার সঙ্গী হিসেবে পশুকে ওরা ঘৃণ্য বা উপেক্ষণীয় মনে করে না।

সংস্কৃতিমান ভদ্রসমাজের সঙ্গে এ বিষয়ে ওদের রুচিগত পার্থক্য অল্প নয়। কাজেই ভদ্রসমাজে এই ব্যাপার হলে, সেটা যত বড় বিকৃতাচার বলে গণ্য হবার যোগ্য, ওদের ক্ষেত্রে বোধহয় ঠিক তত বড় নয়। এই অপরাধে ধৃত ও লাঞ্ছিত আসামীদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করে দেখা গেছে, অনুষ্ঠিত ব্যাপারের কুশ্রীতা, ঘৃণ্যতা বা অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা বেশ অস্বচ্ছ। যারা অন্যায় বলে স্বীকার করেছে, তারাও একে ব্যভিচার, বলাৎকার বা সম-গমনের তুলনায় যথেষ্ট নির্দোষ আচরণ রূপে অভিহিত করেছে। কেউ কেউ ঔষধার্থে সুরাপানের মতো চিকিৎসার্থে পশু-নিয়োগ অনুচিত নয় বলেও সাফাই গেয়েছে। বলা বাহুল্য, এ সবই অসুস্থ মনোবৃত্তির ক্রিয়া এবং এজন্যে দায়ী অনগ্রসর সমাজ-চেতনা, অশিক্ষা ও অমানুষিক আবহাওয়া, যা ওদের জীবনে প্রায় অনিবার্য বললেই চলে।

সপ্তম অধ্যায়

গুণ্ডা জগৎ

নাগরিক সভ্যতা যতই বিস্তার লাভ করছে, ততই এক দিকে যেমন সমাজ-জীবনের উপরতলায় সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে তেমনি নীচুতলায় অন্যায় ও অনাচার শতমুখে বিস্তার লাভ করে চলছে। গ্রাম্য-জীবনের কাঠামো ভেঙে পড়ায় হাজার হাজার নর-নারী অন্নের সন্ধানে ঘর-বাড়ী, চাষ-বাস ও কাজ-কারবার ফেলে সহরে চলে আসছে। অফিস-আদালত, কল-কারখানা, শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্যকেন্দ্র গুলির ক্রমবর্ধিত চাহিদাই তাদের টেনে আনছে নগরে। কিন্তু উপরতলায় সুষ্ঠু ভাবে জীবিকাহরণের সুযোগ-সুবিধা সকলের হচ্ছে না। কতক লোক প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত বেকার হয়ে পড়ছে। অথচ উৎকেন্দ্রিক গ্রাম্য সমাজের মধ্যে ফিরে যাওয়ার সামর্থ্যও আর তাদের থাকছে না। তখন বাধ্য হয়েই তারা গিয়ে আত্মগোপন করছে নীচু তলায়। চুরি, জুয়াচুরি, জালিয়াতি, গুণ্ডামি, বে-আইনি মাদক ও মেয়ে বিক্রী ইত্যাদির ব্যবসা এই থেকেই দিনের পর দিন পুষ্টিলাভ করে চলেছে।

এই যে সুবৃহৎ একটি সম্প্রদায়, এরা নগর, বন্দর ও শিল্প-কেন্দ্রের আশে-পাশে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে এবং পুলিশ ও জন-সাধারণের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দিনের পর দিন আপনাদের ব্যবসা চালায়। নানা বিভ্রান্তিকর কৌশলের আশ্রয়ে এরা লোকালয়ে এসে ঢোকে এবং এমন চাতুর্য ও সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের কাজ-কর্ম চালায় যে খুব কম ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে তা ধরা যায়। উপরতলার জীবনে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রয়োজনে যা-কিছু আধুনিকতা সম্মত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার বিশালতা ও বৈচিত্র্যের ছবিটাই আমরা বাইরে থেকে দেখি। কিন্তু তারি আনাচে কানাচে যে কত হাজার হাজার দুষ্কৃতি-পরায়ণ ওৎ পেতে বসে আছে, যান্ত্রিক সভ্যতার পাইকারি উৎপাদনে কিছুমাত্র সহযোগিতা না করেই, আড়াল থেকে তার ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নেবার বিচিত্র ফিকির আঁটছে, তা টের পাওয়া যায় শুধু নীচুতলার খবর নিলে।

চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি গ্রামেও হয়। কিন্তু গ্রামে সে সবই হল এক-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কোন লোক বা কয়েকজন লোক সাময়িক

উদ্দীপনায় এই সব অপরাধ করে, কিন্তু এ-সব জিনিষ সেখানে পেশা বা ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হতে পারেনি। অনুসন্ধানে দেখা যাবে, অনেক সময় দারিদ্র্যই গ্রাম্য লোককে এই জাতীয় অপরাধে প্ররোচিত করে। অনেক সময় নারী-লালসা অথবা ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের প্রতি আক্রোশও পিছন থেকে এই সব অপরাধের উদ্দীপনা জোগায়। সহরেও এ-সব অপরাধ বিচ্ছিন্ন ঘটনা রূপে ঘটতে দেখা যায়, কিন্তু তার পরিমাণ কম। সহরে সবচেয়ে বেশী যা হয়, সে হল সঙ্ঘবদ্ধ দুর্নীতি ও জুয়াচুরির কারবার এবং তা চলে পাইকারি ব্যবসা হিসাবে। অদৃশ্য রোগ-বীজাণুর মতো তা আমাদের চারদিকে থাবা বাড়িয়ে রয়েছে এবং একটু সুযোগ পেলেই, এক লাফে এসে ঘাড় মটকে ধরছে। এ জিনিষ শুধু সহরেই আছে। গ্রামে কদাচিৎ দেখা গেলেও, তা সহর থেকেই আমদানি হয় বুঝতে হবে।

অবশ্য নাগরিক জীবনে বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থাপনার অভাব ও ধন-বণ্টন ব্যবস্থার অসাম্যই এজন্যে দায়ী। যারা সমাজ-জীবনের ওপরতলায় স্থান সংগ্রহ করে আর পাঁচজনের মতো সমাজ স্বীকৃত উপায়ে বাঁচার সুযোগ পেল না, সমাজকে আড়াল থেকে বিধ্বস্ত করার স্পৃহা তাদের প্রবল হওয়া আশ্চর্য নয়। তার সঙ্গে স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতা যুক্ত হলে ত আর কথাই নেই! দুষ্কৃতির মাদকতা একবার আস্বাদ করলে আর ফেরার পথ থাকে না, তখন অন্যায়ের আকর্ষণই মানুষকে বৃহত্তর অন্যায়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। এই ভাবেই দিনের পর দিন নীচুতলার প্রসার বেড়ে যাচ্ছে এবং তা থেকে জুয়াচুরির ব্যবসা দিকে দিকে সহস্র হাত বাড়িয়ে লোকালয়ে সর্বনাশ করছে।

শিল্প-বাণিজ্যে যে দেশ যত উন্নত, সে দেশে নীচুতলার প্রতাপ তত বেশী। আমাদের দেশে শিল্পবিস্তার কমই হয়েছে। কিন্তু এরি মধ্যে গোপন পাপের ব্যবসায় যেভাবে জাঁকিয়ে উঠেছে, তা রীতিমতো দুশ্চিন্তার কথা। আরো ভয়ের কথা এই জন্যে যে প্রাণপণ চেষ্টাতেও এর মূলোচ্ছেদ করা যাচ্ছে না, যেহেতু মূলের সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। জালমুদ্রা তৈরী, বে-আইনি মাদক বা মেয়ে চালানি, নিষিদ্ধ জিনিষ তৈরী ও বিক্রী, উদ্দেশ্যমূলক খুন ও জুয়াচুরি ইত্যাদির অপরাধে সময় সময় অবশ্য দু-চার জন ধরা পড়ে। কিন্তু যত লোক এই সব কাজে নিযুক্ত আছে, তার বেশীর ভাগই ধরা পড়ে না এবং তা পড়ে না বলেই, এর স্রোতও কোনদিন বন্ধ হয় না। ব্লু-ফোটো, অশ্লীল বই ও রবারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবসা পুলিশের সন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়েই চলে,

যেমন চলে নাবালক ছেলে-মেয়ে বিক্রীর বা অশ্লীল সিনেমা দেখানোর ব্যবসা এবং জুয়া, ব্ল্যাকমেলিং ও মেয়ে বের করার ব্যবসা। সোনার 'বার' বলে সন্ধ্যার অন্ধকারে বোকা লোককে পেতলের শিক বিক্রী করা থেকে সুরু করে, ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে, তার দ্বারা প্রলুব্ধ পথচারীকে আপন আস্তানায় এনে সর্বস্বান্ত করা পর্যন্ত, রকমারি অন্যায়ের ব্যবসাই পূর্ণোদ্যমে চলে। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের নামে জাল চিঠি দেখিয়ে, টাকা হাতানোর, কিংবা কোন ভূয়া প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সেজে, চাকরি করে দেবার আশ্বাসে পয়সা আদায় করার ব্যবসা, অথবা পকেট-কাটা, ছিঁচকে চুরি ইত্যাদির ব্যবসাও যে কত ব্যাপক, সে ত আর বলারই প্রয়োজন নেই।

অথচ সমাজ-জীবনের উপর তলায় চোখ বুলিয়ে, এই মুল্লুকের বিন্দু-বিসর্গও জানার উপায় নেই। জানা যাবে কি করে? এদের গতিবিধি এমনি সতর্ক, ঘাঁটিগুলি এমনি সচল ও পরিবর্তনশীল যে ঘটনার আধঘণ্টা পরে গিয়েও, কোথাও এদের পাত্তা পাওয়া যায় না। সকলের চোখে ধূলো দিয়েই এরা আশেপাশে সরে দাঁড়ায় এবং সেখান থেকে আবার সুকৌশলে কারবার চালাতে থাকে। ব্যবসা এদের কত ব্যাপক, তা সমাজের যে-কোন দিকে অনুসন্ধান চালালেই বোঝা যাবে। লম্পটমহলে অশ্লীল বই, রবার নির্মিত কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও 'নীল ছবি'র আদান-প্রদান হতে দেখা যায় প্রচুর। 'অভিজ্ঞ' লোকের মুখে নিষিদ্ধ সিনেমা দেখার, অথবা কোকেন, চরস ও পঞ্চ-রঙের গুপ্ত আড্ডার বিবরণও শোনা যায় অনেক। কিছু-কিছু মালপত্র দেখারও সুযোগও হয় আশা করি অনেকেরই মাঝে মাঝে। এছাড়া চোরাই মাল কিনতে গিয়ে প্রতারিত হওয়ার, পথ-প্রেমিকার পিছু নিয়ে বিপন্ন হওয়ার, ভদ্রবেশী সঙ্গী বা সহযাত্রীর ওপর আস্থা স্থাপন করে নিঃশেষিত-পকেট হওয়ার বিবরণ ত হরহামেশাই শোনা যায়। এমন কি, এই সব দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে কিছুদিন বা অনেক দিন বন্দী থেকেছেন, পরে কোন কৌশলে মুক্তি লাভ করেছেন, সে রকম নর-নারীর আত্মকাহিনী জানার সুযোগও নেহাৎ কম হয় না। কিন্তু মজা এই যে কোন ক্ষেত্রেই আপ্রাণ চেষ্টা করেও ঘাঁটিয়ালদের আবিষ্কার করা যায় নি, বা যায় না।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে এদের ব্যবসা সমাজ-দৃষ্টির আড়াল থেকে পরিচালিত হলেও এবং এই ব্যবসায়ে নিয়োজিত লোকেরা প্রকৃত পক্ষে সমাজ বহির্ভূত সম্প্রদায় হলেও, এদের ভেতর শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির

অভাব নেই। তালা কাটার যন্ত্র তৈরী থেকে সুরু করে, জাল টাকা বা জাল নোট তৈরী, যৌনোপকরণ তৈরি, অশ্লীল ছবি বা সিনেমা তৈরী পর্যন্ত, সমস্ত কাজই যথেষ্ট বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। অঙ্গসজ্জার দ্বারা চেহারা পরিবর্তন বা বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করবার মতো ফিকির উদ্ভাবনও কম ধী-শক্তির পরিচায়ক নয়। সুতরাং বুঝতে হবে যে অপরাধ-প্রবণ শিক্ষিত ব্যক্তিরাই কোন-না-কোন বাস্তব কারণে শিষ্টসমাজ থেকে পিছু হঠে গিয়ে, নীচুতলায় আশ্রয় নেয় এবং সেখান থেকে গুণ্ডা, গাঁট-কাটা, চোর, ছ্যাঁচড়দের সঙ্গে দল পাকিয়ে, তাদের হাত দিয়ে অন্যায়ের ব্যবসা চালায়। গুণ্ডা নামধারী ইতরজন হল তাদের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র, কিন্তু পিছনে মস্তিষ্ক রূপে আছে বিকৃতরুচি ভদ্রজনই। যে-কোন বড় ঘটনার প্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণ করলেই এটা বোঝা যাবে।

শিক্ষিত ভদ্রসন্তান শিক্ষা ও সদাচারের মর্যাদা লঙ্ঘন করে, কেন যে এই ভাবে অন্যায় অনাচারের দ্বারা লোকালয়ের সর্বনাশ করে, তার রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে, অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের, বিশেষত অপরাধ-বিজ্ঞানের আদিসূত্র গুলির সন্ধান করতে হবে। কারণ শিক্ষিত ভদ্রসন্তান দারিদ্র্য দশায় পড়ে অনাহারে প্রাণ দিয়েছেন, এমন ঘটনা যেমন যথেষ্ট পাওয়া যাবে, তেমনি সম্পন্ন ভদ্রসন্তান স্বেচ্ছায় শিষ্টবৃত্তি পরিহার করে নীচুতলার কারবারে ঢুকেছেন, এমন নজীরও কম মিলবে না। কিন্তু ওদিককার আলোচনা আমার প্রয়োজন বহির্ভূত। আমি শুধু এই মুল্লুকে প্রচলিত রকমারি বিকৃতি ও অপরাধের গতি-প্রকৃতি নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করব।

আসলে এই মুল্লুকের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণের মনে স্পষ্ট ধারণা না থাকাই যে বেশীর ভাগ স্থলে বিপদের কারণ হয় এবং এদের ব্যবসাও যে প্রধানত এই সুযোগেই বেঁচে থাকে ও বল সঞ্চয় করে, এটা জেনে রাখা ভালো। নইলে নিজের অজান্তেই শয়তানী চক্রে পা দিয়ে কে কখন বিপন্ন হবেন, তার স্থিরতা নেই। একটি যুবক বর্তমান দশকের কিছু আগে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংলগ্ন কুইন্স এভেন্যু দিয়ে আসার মুখে, একদিন রাত্রি আন্দাজ দশটায় একটি সুন্দরী তরুণীকে একা ঘোরা-ফেরা করতে দেখেন। তরুণীটি তাঁর কাছে এগিয়ে এসে এমন হাব-ভাব দেখান, যাতে যুবকটি বিভ্রান্ত হন। তারপর তাঁকে প্রলুব্ধ করে তরুণী রেস-কোর্সের অভ্যন্তরে গিয়ে ঢোকেন, পিছু পিছু যান যুবকটি। যথাকালে তিনি বুঝতে পারলেন, সেটি মেয়ে নয়, ছেলে।

ইতিমধ্যে বলিষ্ঠদেহ দুই ব্যক্তি দু-দিক থেকে এসে যুবকটিকে চেপে ধরল এবং বেদম প্রহার করে, তাঁর ঘড়ি, বোতাম, কলম ও চশমা ছিনিয়ে নিল। যুবকটি কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। পরে ঐ স্থানে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এবং বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়েও দুষ্কৃতকারীদের কিন্তু আর পাত্তা পাওয়া যায় নি।

আর এক রকম দুর্ভোগ হয়েছিল একটি বালকের। একটি পায়জামা পরা যুবক একদিন তাকে একটি দামী ফাউণ্টেন দেখায় এবং মাত্র এক টাকায় সেটা বিক্রী করতে রাজী হয়। ছেলেটি বলে যে তার কাছে মাত্র চার-আনা আছে। লোকটি তাতেই তাকে কলমটা দিয়ে দেয় এবং বলে, আগামী কাল এখানে থাকলে, তাকে সে একটা ভালো ঘড়িও এই রকম সস্তায় দিতে পারবে। লুব্ধ বালক পরের দিন ঠিক সেই জায়গায় এসে হাজির হয় এবং লোকটিকে দেখতে পায়। লোকটি তাকে বলে, রাস্তায় মেলা লোক, কেউ হয়ত সন্দেহ করবে। তার চেয়ে তার ডেরায় গিয়ে নিলেই ভালো হয়। তাছাড়া অনেক ঘড়ি আছে, সে ইচ্ছা মতো যে-কোনটা পছন্দ করে নিতে পারবে। বালকটি তার পশ্চাদনুসরণ করে এক বস্তির ভিতর এসে ঢোকে। সেখানে স্নান করার একটা ঘেরা হাউজের মধ্যে তাকে অপেক্ষা করতে বলে, লোকটি বেরিয়ে যায় এবং একটু পরে আরো দুটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে আসে। অত্যাচার ও নিপীড়নে যখন সে মৃতপ্রায়, তখন আগের দিনে কেনা তার কলমটি ত বটেই, গায়ের জামাটা পর্যন্ত খুলে নিয়ে, তারা তাকে স্নানের চৌবাচ্চায় নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। অবশেষে বালকটি গভীর রাত্রে খালি-গায়ে বাড়ী ফিরে আসে।

এক ভদ্রলোক রাত্রি আন্দাজ ন-টার সময় লেকের ধারে বসেছিলেন। কোন ফাঁকে এক ভদ্রবেশী যুবক এসে তাঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমায় এবং অল্পক্ষণের কথা-বার্তাতেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। সে বলে যে তিনি যদি একশো টাকা জোগাড় করতে পারেন, তাহলে এখনি সে তাঁকে হাজার টাকা পাইয়ে দিতে পারে। কি করে, ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে। সে বলল যে সে জুয়ার এমন একটা কৌশল জানে, যাতে জিত হবেই। প্রতি দশটাকা বাবদ একশো হিসাবে বাজী ধরে সেই কৌশল মাফিক খেললে, ঘণ্টা খানেকেই হাজার টাকা নিশ্চিত উঠে আসবে। বলেই সে ফ্ল্যাস খেলার বিশেষ একটা ধরণ ব্যাখ্যা করতে স্থরু করল এবং যেখানে এই খেলা চলে, সেখানে তাঁকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করল। ভদ্রলোক প্রথমটা একটু

দো-মনা হন। তারপর ট কা জোগাড় করে পরের দিন ঐ স্থানে তার সঙ্গে দেখা করতে স্বীকৃত হন। নির্দিষ্ট দিনে যুবকটি তাঁকে রেল লাইন ধরে মাঝেরহাট বরাবর নিয়ে যেতে সুরু করে। পিছু-পিছু একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে যাচ্ছিল। তাকে ভদ্রলোক সাধারণ পথিক বলে মনে করেন। কিন্তু যথা-কালে তিনি বুঝতে পারেন যে সে উক্ত যুবকের দোসর। নির্জন মাঠে যুবকটি তাঁকে বলল, দেখুন, জুয়া-টুয়া কিছু না, বুঝতেই ত পারছেন ··তা কৈ আপনার একশোটা টাকা দিন ত। ভদ্রলোক বেশ একটু হতভম্ব হয়ে যান এবং ভূত-গ্রস্তের মতো টাকাটা তার হাতে তুলে দেন। সে তখন তাঁর হাতে একটা কাগজের প্যাকেট তুলে দিয়ে বলে, এই নিন, চুপচাপ চলে যান। টঁ্যা-ফোঁ-করলে মুস্কিল হবে। ভদ্রলোক পরে প্যাকেট খুলে দেখেন, তার ভিতর চলতি পথের হ্যাণ্ডবিল ও বাজে কাগজের একটা তাড়া ভাঁজ করা রয়েছে।

সব ঘটনাই অনেকটা এক জাতের এবং এ রকম ঘটনায় পড়ে বিব্রত হয়েছেন, এমন লোক আশা করি ঢের আছেন। শুধু পুরুষ নয়, নারীর ভাগ্যেও অনুরূপ দুর্ভোগ যথেষ্ট হয়ে থাকে। বছর ত্রিশ বয়সের একটি সুশ্রী স্ত্রীলোক কোন গৃহস্থবাড়ীতে ঝির কাজ করত। একদিন সকালে সে কাজে আসছে, এমন সময় এক ছোকরা বাবু তাকে ডেকে তার সঙ্গে আলাপ জমাতে সুরু করে এবং কথাপ্রসঙ্গে কোন সুন্দরী তরুণীর একখানি ফোটো বের করে তাকে দেখায় ও বলে যে ইচ্ছা করলে, এই রকম ফোটো তুলিয়ে সে প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারে, যেহেতু তার চেহারা সুন্দর এবং সুন্দর মেয়ের ছবি বাজারে যথেষ্ট দামে বিক্রী হয়। মেয়েটি বলে, তার টাকা নেই। ছবি তোলাবে কি করে? লোকটি তাতে আত্মীয়তা করে জানায় যে ছবি তোলাতে পয়সা লাগে না। বরং যে তোলায় তাকেই অনেক পয়সা দেওয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে, তার ছবি এমনি তোলা হবে এবং প্রত্যেক ছবির দরুণ তাকে দশটা করে টাকা দেওয়া হবে। নির্বোধ তরুণীর প্রলুব্ধ হতে দেরী হল না। সে তার সঙ্গে এল এক গুদাম-বাড়ীর অন্ধকারে এবং বলা বাহুল্য, স্বেচ্ছায় শয়তানের কবলে ধরা দিল। সেখানে তাকে এবং তারি মতো আর একটি স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে, এক দল দুর্বৃত্ত, চেঁচালে খুন করা হবে বলে ভয় দেখিয়ে, নানা কুশ্রী অনুষ্ঠানের ছবি তুলতে লাগল। প্রহারে ও নিপীড়নে জর্জরিত মেয়ে দুটিকে রেখে, লোকগুলি নিজেদের জিনিষ-পত্র নিয়ে চলে যাচ্ছিল। অনেক কান্নাকাটি

করায় শেষ পর্যন্ত তারা তাদের পরিধেয় বস্ত্রগুলো ফিরিয়ে দিল, কিন্তু গহনাপত্র দিল না। বহু কষ্টে মেয়ে দুটি নিজেদের ঠিকানায় ফিরে আসে।

আর একটি বছর-তেরো বয়সের গরীব মেয়েকে পথে পেয়ে, এক ব্যক্তি তাকে হোটেলে চাকরী করে দেবে বলে, বদমায়েসদের আড্ডায় এনে বিক্রী করে দেয়। যে তিনটি লোক তাকে কেনে, মেয়েটিকে নিয়ে তারা ক্রমাগত তিন বৎসর নানা স্থানে ঘোরে, তার ওপর ষৎপরোনাস্তি অত্যাচার করে এবং সেই সঙ্গে জুয়া ও রকমারি প্রতারণায় নানা জনকে নানা স্থানে সর্বস্বান্ত করে। শেষে মেয়েটি তাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে এক গৃহস্থের বাড়ী এসে আশ্রয় নেয় এবং তাঁদের কাছে আপন দুঃখের কাহিনী বিবৃত করে। অনুরূপ অবস্থায় নিপতিত আর একটি মেয়েকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয়। তার বয়স আরো কম। তাকে সার্কাস দেখানোর নাম করে একটি অচেনা স্ত্রীলোক কোন আড্ডায় নিয়ে যায় এবং সেখানে দুটি লোককে ডেকে এনে, পয়সার বিনিময়ে তাকে তাদের হাতে তুলে দেয়। দুর্বৃত্তদের উপদ্রবে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গেলে, তাকে তারা অনেক দূরে এক পথে ফেলে পালায়। সেখান থেকে মেয়েটিকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন তার দেহ-নিঃসৃত রক্তে পরিধেয় বস্ত্রের অর্ধেকটা রঞ্জিত দেখা যায়। সবিশেষ চেষ্টা করেও ঐ স্ত্রীলোকটির বা আড্ডাটির কোন হদিশ বের করা যায় নি।

সাধারণত দেখা যায়, একটু অল্প-বুদ্ধির লোক বা অভাবী লোককেই দুর্বৃত্তেরা এই ভাবে লোভের জাল বিস্তার করে আপন আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসে। ওদের শঠতার মর্ম বুঝতে না পেরে, তারা গোড়াতে সরল ভাবে ধরা দেয়। তারপর চেষ্টা করলেই বা আর অব্যাহতি কোথায়? এই দুর্বৃত্তদের গতিবিধির ভিতর জন-মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করার ও তদনুযায়ী কৌশলের ফাঁদ বিছানোর নৈপুণ্যটা লক্ষ্য করার মতো। তবে কৌশলের সঙ্গে বল-প্রয়োগের ঘটনাও কম ঘটে না।

কোন সম্পন্ন যুবক একদা এক সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে মোটর যোগে যশোর রোড ধরে অনেক দূরে চলে যান ও সেখানে পথে গাড়ী থামিয়ে, সঙ্গিনীটিকে নিয়ে মাঠে গিয়ে বসেন। ইতিমধ্যে আর একটি মোটর সেখানে এসে হাজির হয় এবং তা থেকে বেরিয়ে দু-জন লোক পিস্তল উঁচিয়ে চোখের নিমেষে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। আর দু-জন লোক এসে যুবকটিকে ধরে ও তাঁকে যথেচ্ছ ভাবে প্রহার করতে থাকে। বলে, দু-হাজার টাকা জিম্মা দিলে, তবে তাঁকে

ছাড়া হবে। কি ভাবে দিতে হবে, তারও উপায় তারা বাংলে দেয়। একটি লোক চিঠি নিয়ে সরাসরি তাঁরই গাড়ীতে তাঁর বাড়ী যাবে। তাতে শুধু লেখা থাকবে, 'আমি বিপদে পড়েছি, অবিলম্বে এই লোকের হাতে দু-হাজার টাকা দেবেন'। আর কিছু না। টাকা নিয়ে সে লোক ফিরে এলে, তবে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। যুবক তাতে সম্মত হলেন না। ফলে লোক দুটি তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার সুরু করল। অবশেষে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এর দু-দিন পরে এক স্থানে ভাঙাচোরা অবস্থায় তাঁর গাড়ীটি, অন্য স্থানে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় সেই মেয়েটিকে পাওয়া যায়। আর যুবকটিও শেষ পর্যন্ত বাড়ীতেই ফিরে আসেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তাঁর বেশ কিছুদিন লাগে। সুস্থ হয়ে তিনি দেখলেন, তাঁর আধা-অঙ্গে বিচিত্র অশ্লীল উল্কি চিত্রিত হয়েছে, যা তিনি প্রাণপণ চেষ্টাতেও ওঠাতে পারেন নি।

কোন ভদ্রলোকের বাড়ী একদিন দুপুর বেলা অফিসের পথে তিনি গুরুতর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাঁসপাতালে নীত হয়েছেন, এই মর্মে প্যাণ্টকোটধারী এক যুবক এসে খবর দেয় এবং বাড়ীর লোকদের অবিলম্বে সেখানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করে। ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কুমারী কন্যা উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন। তারপরই সে তাঁদের আপন গাড়ীতে তুলে নিয়ে দৌড় আরম্ভ করে। পথে এক-এক করে আরো তিন ব্যক্তি গাড়িতে ওঠে এবং এবং সব শুদ্ধ চারজন পিস্তল দেখিয়ে, তাঁদের সহরের বাইরে নিয়ে যায়। সেখানে অনেক দিন উভয়কে এক বস্তির ভিতর আটকে রেখে, বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিয়ে তারা টাকা রোজগার করতে থাকে। পরে কোন দয়াবান লম্পটের অনুগ্রহেই তাঁরা মুক্তি পান। এই মহিলাদের ওপর শুধু উপদ্রব করেই ওরা ক্ষান্ত হয় নি, সম্পূর্ণ নিরাবারণ করে বেত্রাঘাত, লাঠি জাতীয় একটা কিছু অনুপ্রবিষ্ট করা, নিতম্ব, উরু ও কটিদেশে ছেঁকা দেওয়া প্রভৃতি অহেতুক নৃশংসতাও করেছে। কন্যাটিকে একবার ছুরিকাঘাত করার ঘটনাও ঘটেছিল।

শুধু যৌনাচারেই এদের দুষ্কৃতির পরিসমাপ্তি নয়, অহেতুক নিষ্ঠুরতাতেও এদের জুড়ী নেই। দংশনের দ্বারা ক্ষত উৎপাদন, জোর পূর্বক গুপ্তকেশ উৎপাটন, উরু ও নিতম্বে অস্ত্রাঘাত, এসিড দাহন, নানা বীভৎস আচরণের অভ্যাসই আছে এদের। ঠিক এ রকম না হলেও, পুরুষের ওপর নির্যাতন এবং নৃশংসতাও কম হয় না। এক জনের জননেন্দ্রিয় দড়ির সাহায্যে কয়েক ঘণ্টা বেঁধে রাখা হয়েছিল। আর এক জনের পায়ুদেশে দগ্ধ সোলা প্রবেশ

করানো হয়েছিল। ঐক জনকে পৌনপুনিক কৃত্রিম মৈথুনে বাধ্য করার ফলে তার মূত্রপথ দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। এ ছাড়া নিষ্ঠুরতার অংশ রূপে দু-একটি নারী বা নর হত্যার ঘটনাও ঘটেছে। বিষ খাওয়ানো, ছুরিকাঘাত, স্পর্শ-কাতর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত, নানা উৎপাতে প্রাণ হারিয়েছিল তারা।

কোন চায়ের দোকানে কর্মনিরত বালক এক গুণ্ডা-দল কর্তৃক ধৃত হয়ে কলকাতা থেকে মথুরা পর্যন্ত চলে যায়। এই দলটি চোরাই মাদক, চোরাই মেয়ে, জাল মুদ্রা, অশ্লীল বই, গর্ভ-পাতনের ওষুধ, কৃত্রিম ক্রিয়ানুষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, অনেক কিছুর কারবার করত। কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত, নানা স্থানে তাদের গোপন ঘাঁটি আছে এবং এক স্থানের সঙ্গে আর এক স্থানের সংযোগ রক্ষা করার জন্যে ছদ্মবেশে একদল আড়কাঠি সর্বদা ইতস্তত আনাগোনা করছে, এই রকম অনেক তথ্য তার কাছে পাওয়া যায়। কতকগুলি ছেলে ও মেয়ে গুম করা থেকে আরম্ভ করে, পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করার জন্যে মুষ্ক-চ্ছেদন পর্যন্ত, বহুবিধ ভয়াবহ দুষ্কৃতির বিবরণই বালকটির ভাষণে ব্যক্ত হয়। এই বালকটিকে এক সর্দার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ করেছিল এবং তাকে স্ত্রীলোকোচিত সাজ-সজ্জা করে এবং অলঙ্কার পরে তার সঙ্গে বসবাস করতে হত। এই রকম 'পুরুষপত্নী' নাকি ওদের অনেকের ছিল এবং 'দাম্পত্য' অধিকারের সততা রক্ষা না করায়, একটি বালককে নাকি প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়েছিল। দল থেকে পলাতক হয়ে নানা কৌশলে এই বালকটি শেষপর্যন্ত দেশে ফেরে। কিন্তু কিছুদিন বেশ থাকার পরই তার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। সর্বদা 'ধরলো' 'ধরলো' করে সে আতঙ্কিত হতে থাকে। অবশেষে সদ্যনির্মিত একটি বাড়ীর ভেতর থেকে একদিন তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। সম্ভবত আত্মহত্যা করেছিল।

গুণ্ডা-জগতে প্রচলিত বিকৃতি ও নৃশংসতার নানা দিকের পরিচায়ক রূপে এই বালকের কাহিনী অত্যন্ত মূল্যবান। পকেট মারার অভিযোগে ধৃত এবং শিশু-জেল ও After-Care-Socitey থেকে মুক্ত আর এক বালকের বিবৃতিতেও গুণ্ডা-মুল্লুকের দু-চারটি বীভৎস কাহিনী জানা গেছে। সে যে দলে ছিল, তার ভেতর একটি স্বাস্থ্যবতী তরুণী থাকত। সে পুরুষের মতো চুল ছাঁটত, হাফ প্যান্ট পরত, বুকে বেশ শক্ত করে একটা গামছা বাঁধত। বাইরে থেকে তাকে পুরুষের মতো দেখাত এবং আচার-ব্যবহারও তার ছিল ষোল-আনা পুরুষের মতো। ছুরি চালানো, পকেট মারা, চোরাই মাল বিক্রী, সব কিছুতে সে ছিল

যেমন নিপুণ, তেমনি নিপুণ ছিল পথের নিরভিভাবক মেয়েদের আড্ডায় জুটিয়ে আনায়। মুংরী বলে একটা বছর চোদ্দ বয়সের হা-ঘরী মেয়ে তার বৌ রূপে পরিচিত ছিল। তাকে সে স্বামীর অধিকারে শাসন ও পালন করত। বালকটির উক্তিতে জানা যায় যে মুংরীর ওপর দলের আর এক ব্যক্তির লুব্ধ দৃষ্টি নিপতিত হচ্ছে দেখে, সে একদিন নিঃশব্দে তাকে নিয়ে দল ছেড়ে যায়। তারপর আর তাকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, দলটিকেই পাওয়া যায় নি আর।

আগেই বলেছি যে এই সমস্ত দুর্বৃত্ত নীচুতলায় আত্মগোপন করে, সেখান থেকে এমন কৌশলে উপরতলায় ব্যবসা চালায় যে তার অন্ধি-সন্ধি খুব কম ক্ষেত্রেই আবিষ্কার করা যায়। ওরা ক্রমাগত ঘাঁটি ও বেশ-বাস পরিবর্তন করে, সেটাই অবশ্য প্রধান কারণ। তাছাড়া আক্রান্ত ও বিব্রত গৃহস্থ-সমাজ অধিকতর বিপদের ভয়ে বা লজ্জার দায়েও অনেক সময় সব ব্যাপার চেপে যান। আর কতক লোক দুষ্ট অভিসন্ধী বশে গোপনে এদের সঙ্গে সহযোগিতা করে, এ জন্যেও বহু ক্ষেত্রে অপরিচয়ের যবনিকা ভেদ করা যায় না।

এই গোপন সহযোগিতাটা কি ভাবে করা হয়, তার কয়েকটা উদাহরণ এখানে দেওয়া যাক। এক অবিবাহিতা তরুণী কৃত্রিম জননেন্দ্রিয় বা Consolator ব্যবহার কালে তাঁর ভ্রাতৃবধূর হাতে ধরা পড়েন। বস্তুটি কোথা থেকে সংগৃহীত হল জিজ্ঞাসা করে, তিনি জানতে পারেন যে কোন ছাত্রী-বান্ধবী নাকি তাঁর ও তাঁর চেনা-শোনা আরো কয়েক জনের কাছে এই জিনিষ বিক্রী করে গেছে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ঐ ছাত্রীটি সন্দেহজনক চরিত্রের মেয়ে এবং নানা দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ আছে। আর এক ভদ্রলোক ভারতের নানা দর্শনীয় স্থানের এবং কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থিত দেবমূর্তির পোষ্টকার্ড সাইজ ফোটো বিক্রী করতেন। এরি আড়ালে তিনি তরুণীদের মধ্যে ন্যক্কারজনক চিত্রাবলী লুকিয়ে বেচতেন। ধৃত হয়ে তিনি প্রকাশ করেন যে কোন পতিতার এবং তার মালিকের কাছ থেকে তিনি এই সব ছবি শতকরা ত্রিশ টাকা কমিশনের বেচার জন্যে নেন। ঐ পতিতাকে অবশ্য উল্লিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায় নি। কোন শিক্ষিতা তরুণী এক আদর্শবান যুবকের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের ভিতর দিয়ে পরিচিত হয় এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব

স্থাপন করে। ঐ যুবকটি তার বাড়ীতে যেত এবং বাড়ীর সকলেরও বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছিল। সঙ্গত কারণেই তাই মেয়েটিকে তার সঙ্গে মেলা-মেশা করতে এবং এখানে-সেখানে যেতে দেওয়া হত। কোন স্থানে রুশ-বিপ্লবের একটি ছায়াচিত্র গোপনে দেখানো হচ্ছে বলে, যুবক একদিন তরুণীটিকে একটি আড্ডায় নিয়ে যায়। সেখানে ছায়াচিত্র একটা দেখানো হল বটে, কিন্তু তা রুশবিপ্লবের নয়, ছবিটি একটি ব্লু-ফিল্ম। এক নরাধম মগুপ কি ভাবে একদা তার কোন গুরুজন স্থানীয়ার দৈহিক পবিত্রতা হানি করে, তারি কুৎসিত কাহিনীর পটভূমিতে রচিত একটি নির্বাক চলচ্চিত্র। শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না ভদ্র তরুণী মহাবিপন্ন বোধ করতে লাগল। উঠে আসার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যুবকটি কিছুতেই ছাড়ল না। এ নিয়ে সে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল এবং অভিনয়ান্তে কতকটা স্নায়বিক উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে, কতকটা বা জোর করেই, তরুণীটিকে গৃহান্তরে নিয়ে গিয়ে সে তাঁর ধর্ম নষ্ট করল। অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে যুবক কয়েক ঘণ্টার জন্যে এই সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যে শ্রদ্ধা ও পবিত্রতার সঙ্গে প্রেমাকর্ষণ করলে, এই গুণবতী তরুণীকে সে স্থায়ী জীবন-সঙ্গিনী রূপে পেতে পারত, তার সুযোগ সে হারাল। তার স্থানে পেল অকৃত্রিম ঘৃণা, শুধু আপন দুষ্ট অভিরুচির জন্যে এবং সে অভিরুচি এত কদর্য রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, শুধু নীচুতলার ব্যাপারীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল বলে।

গুণ্ডা-জগতের আমি মাত্র একটা দিকেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। কিন্তু এই জগতের পরিসর এত বড় এবং সামগ্রিক ভাবে এই নীচুতলার জগৎ ভেতর থেকে দেশের সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির এত বেশী ক্ষতি করছে যে এর সকল দিকের স্বরূপ এবং প্রকৃতি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার। আশার কথা যে পুলিশ কর্মচারী মহলেও সমাজ-বিজ্ঞানের এই দিকটি নিয়ে আলোচনার উদ্যম দেখা দিয়েছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এই মুল্লুকের প্রসঙ্গ আলোচনায় বাইরের লেখকদের এমন ভাবে অন্ধকারে হাতড়ে ফিরতে হবে না।

সব শেষে একটা কথা বলে রাখা দরকার। গুণ্ডামি, জুয়াচুরি, মেয়ে চালানি, মাদক চালানি, অশ্লীল চিত্র ও যৌনোপকরণ চালানি, আর যা-কিছু নীচুতলার ব্যবসা নগর-জীবনে প্রবাহিত আছে, তার ব্যাপ্তি মাত্র কোন একটা দুটো সহরেই আবদ্ধ নয়। তার ছোট ছোট স্থানীয় সংস্করণ যেমন আছে, তেমনি

আছে বড় বড় আন্তঃপ্রাদেশিক, এমন কি, আন্তর্জাতিক সংস্করণও। বাংলার মেয়ে অপহৃত হয়ে সিন্ধু বা সিংহলে চালান হয়ে যায়। চীন বা জাপানে উৎপন্ন অশ্লীল চিত্র বাংলায় চলে আসে। ফ্রান্স বা আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ যন্ত্র কলকাতায় আমদানি হয় এবং তা দিয়ে বিশেষ বিশেষ জিনিষ তৈরী হয়। পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার মাদক দ্রব্য রপ্তানি হয় ভারতে ও অন্যান্য দেশে। ভারতের নিষিদ্ধ পণ্য আবার যায় সেই সব মুল্লুকে। অথচ এমনি সতর্কতার সঙ্গে চলে এই কারবার যে কাষ্টমস, পুলিশ, গোয়েন্দা, কেউ এর গতি-বিধি টের পায় না, এর পথ রোধও করতে পারে না। দেশে-বিদেশে গা ঢাকা দিয়ে, এই ব্যবসা চালাচ্ছে হাজার হাজার আড়কাঠি। তাদের ভেতর প্রায় সব জাতি ও সব দেশের নর-নারীরই কিছু-না-কিছু অংশ আছে এবং কোটি কোটি টাকার লেন-দেনও হচ্ছে তাদের হাত দিয়ে।

সমস্যা এতই বড় যে এই বে-আইনী ব্যবসার স্রোত বন্ধ করবার জন্যে বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘ একদা এই উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন নিযুক্ত করেছিলেন। সে কমিশন অন্যান্য দেশের মতো প্রাচ্য মুল্লুকও ঘুরে গেছেন। কিন্তু সমস্যা অব্যাহতই রয়েছে। আমি যতটুকু দেখিয়েছি, সে হল সমগ্র সমস্যার একটা ভগ্নাংশ মাত্র। অখণ্ড ভাবে এর ব্যাপকতা ও গুরুত্ব চিন্তা করে বাঘা বাঘা সমাজ-বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত যন্ত্র-সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়েছেন। নূতন রাষ্ট্রিক ও অর্থনীতিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে ব্যক্তি-মানুষকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন এর প্রতিকার আছে কিনা সন্দেহ !

অষ্টম অধ্যায়

গণিকা জগৎ

কাম-জীবনে একনিষ্ঠার অভাব হলে, সতীত্বের আদর্শ অনুসারে নারীকে পতিতা বলা যেতে পারে। কিন্তু পতিতা বা বেশ্যা বলতে আমরা সেই সমস্ত পেশাদার নারী বুঝি, যারা জীবিকার বিনিময়ে যৌনাধিকার বিক্রী করে। এরা আত্মস্বতন্ত্র ভাবে একটা সমাজ এবং প্রচলিত সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই এরা বাস করে। সমাজ-জীবনের ওপরের স্তরে আনা-গোনা ও চলা-ফেরা করলেও, প্রকৃত পক্ষে এরা নীচুতলার জীব এবং শিক্ষিত ও রুচিবান ভদ্রসমাজ এদের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানেন না। সমাজ-জীবনের অন্তর্ভুক্ত থেকেই যারা গোপনে নানা জনের সঙ্গে অনাচার করে এবং তা থেকে অর্থ উপার্জন করে, তাদের প্রচলিত নাম ঘুষকী। বলা অনাবশ্যক যে এরাও বেশ্যাই। তবে প্রকাশ্য ভাবে যারা বেশ্যাবৃত্তি করে, তাদের সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে এরা যতটা সম্ভব গার্হস্থ্যনীতি মেনে চলে এবং বাইরের ভদ্রয়ানিটুকু সহজে নষ্ট হতে দেয় না।

মোটের ওপর প্রকাশ্যে হক, আর গোপনেই হক, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন যারা করে, তারা কিন্তু আসলে সমাজেরই মেয়ে। অনুসন্ধানে দেখা যাবে, সমাজ-জীবন থেকে নানা কার্য-কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদিন বেশ্যা-জীবনে এসে পড়েছে, তারপর শত চেষ্টা করেও আর পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি। অথবা এই জীবনের কুশ্রীতা ও কদাচারে এমনি অভ্যস্ত হয়েছে যে নিজেরা ইচ্ছা করেই একে মনে-প্রাণে স্বাগত করে নিয়েছে। আমাদের দেশে অবিবাহ, অবাঞ্ছিত বিবাহ, বাধ্যতামূলক বৈধব্য ইত্যাদির দাপট কত এবং তা থেকে কত অনায়াসে নারীর পদস্খলন হতে পারে, তা সকলেই জানেন। এই পদস্খলনের জন্যে আমাদের সমাজ পুরুষকে কোন দণ্ড দেয় না, কিন্তু নারীকে সে আদৌ ক্ষমা করে না। কাজেই বয়স্থা কুমারী, তরুণী বিধবা কিংবা বিড়ম্বিত-বিবাহ সধবা কোন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এবং তার ফলে গর্ভসঞ্চার বা অনুরূপ কোন বিপত্তি বা কেলেঙ্কারী হলে, আর তাদের সমাজে স্থান হয় না। যে-সমস্ত পুরুষের সংস্রবে বিপাকের সৃষ্টি হয়, সমাজ তাদের সম্পর্কে উদাসীন বলে, তারা সহজেই আপন দায়িত্ব এড়িয়ে

যেতে পারে। কিন্তু বিপন্ন নারীর তখন একমাত্র উপায়, শিক্ষা-দীক্ষা থাকলে স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জন করা। না থাকলে ভিক্ষা ও দাসীবৃত্তি করে অন্নাহরণ করা, অথবা প্রাণ-ধারণের অপরিহার্য প্রয়োজনেই পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হওয়া। যে সমাজে যথাসময়ে মেয়ের বিবাহ হওয়া দুষ্কর, অকালে স্বামী বিয়োগ হলে বা কোন কারণে বিবাহ অসার্থক হলে, যে সমাজ নারীকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করে নৈতিক পবিত্রতার সপ্তম-স্বর্গে ওঠার অবাস্তব নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই দিতে প্রস্তুত নয়, ন্যূনতম ভুল-ত্রুটি ও পদস্খলনের জন্যে সে যখন দণ্ড ধারণ করে, তখন অধিকাংশ বিপথগামী মেয়েই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং নিজেকে জাহান্নমে নামিয়ে দিয়েই সমাজের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে। এই ভাবেই বেশ্যাবৃত্তির বিস্তার হয়ে চলে।

পূর্বে বলেছি, বেশ্যাদের অনেকেই গৃহস্থঘরের মেয়ে। কেউ কেউ সম্পন্ন ঘরেরও। কেউ ছিল বয়স্থা কুমারী, কেউ বাল্য বিধবা, কেউ বা মাতাল, দুশ্চরিত্র, অমানুষ, অথবা পুরুষত্বহীন স্বামীর স্ত্রী। তারপর পারিবারিক চক্রের কারু না কারু প্রলোভনে পড়েছে, কিংবা ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় নিজেরাই কারুকে প্রলুব্ধ করেছে এবং তার ফলে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, কিংবা নিজেরাই পালিয়ে এসেছে। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে মেয়েরা যাদের সঙ্গে পালিয়ে আসে, খেয়াল মিটে গেলে তারা একদিন তাদের পথে ফেলে পালায়। কিংবা অন্য কোন হীনচরিত্র ব্যক্তির হিল্লে লাগিয়ে দিয়ে নিজেরা সরে পড়ে। তারপর এই ভাবে গড়াতে গড়াতেই একদিন তারা এসে পেশাদার পতিতালয়ে বন্দী হয়।

অরক্ষিত গ্রামাঞ্চল থেকে যে-সব কুমারী, সধবা, অথবা বিধবা নারীকে দুর্বৃত্তেরা বলপূর্বক হরণ করে এনে পতিতাদের কাছে বিক্রী করে, অবস্থা-বিপাকে বাধ্য হয়ে তারাও অনেকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে। হীনচরিত্র ব্যক্তির সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হয়ে যারা গৃহত্যাগ করে, তারাও অনেক সময় পণ্যরূপে পতিতালয়ে বিক্রী হয়। এছাড়া পিতা-মাতাহীন, সহায়-সম্বলহীন, পথ-কুমারী ও ভিক্ষুক-বালিকাকে পতিতারা অন্ন-বস্ত্র দিয়ে প্রতিপালন করেও যৌবনাগমে তাদের পতিতা বৃত্তিতে নামিয়ে টাকা কামাতে থাকে। কদাচিৎ ব্যবসায়ী পতিতাদের গর্ভজাত কন্যারাও পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে। কিন্তু সাবালিকা হবার আগে অর্থাৎ আঠারো বছর পার হবার আগে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ আইনে নিষিদ্ধ বলে, এই সব নাবালিকার বেশ্যাবৃত্তি গোপনে চলে।

জানাজানি হলে, এ-সব স্থলে পুলিশ হানা দিয়ে মেয়েকে নিয়ে যায় এবং সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত আপন হেপাজাতে কিংবা কোন উদ্ধারাশ্রমে আটক রাখে।

যে ভাবেই পতিতা বৃত্তিতে নারীর আবির্ভাব হক, পতিতা-জীবন তাদের নিজেদের দিক থেকে যেমন অপরিসীম দুঃখের, সমাজের দিক থেকে তেমনি নিদারুণ বিপদের। পতিতালয় গুলির মালিকানা কর্তৃত্ব থাকে এক বা একাধিক বর্ষীয়সী ব্যবসায়-ভ্রষ্ট পতিতার হাতে, যাদের চলতি নাম বাড়ীওয়ালী। বহু গুণ্ডা ও দুর্বৃত্ত তাদের অন্ন-বস্ত্রে ও অর্থ-সহযোগিতায় পুষ্ট হয়। এরাই আড়কাঠি রূপে চতুর্দিক থেকে ছলে বলে মেয়ে সংগ্রহ করে এনে বাড়ীওয়ালীর ব্যবসায় জাঁকিয়ে তোলে। এই গুণ্ডা সম্প্রদায়ের বিষয় আগেই বলেছি। সুতরাং এখানে আর পুনরুক্তি করব না। বাড়ীওয়ালী সম্বন্ধেও বেশী কিছু বলার নেই। তারা প্রতিপাল্য পতিতাদের ন্যূনতম খাদ্য-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে, তার বিনিময়ে তাদের দিয়ে যতটা পারে রোজগার করিয়ে নেয়। স্বভাবতই পতিতাদের রুচি-অরুচি, স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য, পাত্র-অপাত্র, কোন কিছু সম্বন্ধে নিজস্ব অভিমত খাটনোর স্বাধীনতা নেই। যে-কোন খরিদ্দারের যে-কোন রকম খেয়াল-খুসী অপ্রতিবাদে মেটাতে তারা বাধ্য। যেহেতু প্রতিবাদের ফলে খরিদ্দার অসন্তুষ্ট হলে, বাড়ীওয়ালীর পোষ-মানা গুণ্ডার হাতে নির্মম দণ্ড পেতে হয়। প্রতিদিনই যে-কোন লোকের যদৃচ্ছ নিপীড়ন তাদের সহ্য করতে হয়। ক্লান্তি, ব্যাধি, অনিচ্ছা, কোন কারণে খরিদ্দার ফেরানোর উপায় নেই। এই ভাবেই তারা সিফিলিস, গনোরিয়া প্রভৃতি যৌনরোগে এবং যক্ষ্মা, ক্যানসার প্রভৃতি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে জীবন শেষ করে।

আগেই বলেছি যে প্রত্যেক পতিতালয়ে বাড়ীওয়ালীর অন্ন-বস্ত্রে পুষ্ট একদল বদমায়েস পোষা থাকে। এরা শুধু মেয়ে সংগ্রহেই বাড়ীওয়ালীর সহায়ক নয়, এরা পতিতালয়ে বসে এমন কোন দুষ্কার্য নেই, যা না করে। জালমুদ্রা তৈরী, বে-আইনী মদ তৈরী, ব্লু-ফটো বা ফিল্ম তৈরী, চোরাই মাল বিকি-কিনি, জুয়া ও স্ফূর্তি খেলা, যাবতীয় অন্যায় এবং অনাচারই পতিতালয়ে অন্ধকারে পাইকারি হারে অনুষ্ঠিত হয় এদের মাধ্যমে। তাছাড়া নিরভিভাবক পুরুষহীন বেশ্যালয়গুলির এরাই মুরুব্বি। এরাই পতিতাদের ধন-প্রাণ পাহারা দেয় এবং মেয়েদের সায়েস্তা রাখে। কাজেই কি পতিতাদের আর কি

তাদের খরিদ্দারের, সকলেরই ধন-প্রাণ নির্ভর করে সম্পূর্ণ রূপে এদের করুণার ওপর। অনেক সময় এই করুণার বীভৎস প্রকাশও হতে দেখা যায়।

লোকালয়ের স্বাস্থ্য ও শুচিতা নষ্ট করা, বহু পাপকে গোপনে লালন করা, শত শত সম্ভাবনীয়তাপূর্ণ নারী-জীবন নিষ্ফল পঙ্গু করে দেওয়া, আর যা কিছু বিপর্যয় পতিতা বৃত্তির অনিবার্য পরিণাম, তার কথা ভেবেই অনেকে আইনের সাহায্যে পতিতা বৃত্তি বন্ধ করে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু সচরাচর যে-সমস্ত কারণে নারী বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে, সমাজ-জীবন থেকে তার উচ্ছেদ ভিন্ন এর স্রোত কোনদিন বন্ধ হবে না। তাছাড়া ব্যবসা থেকে উৎখাত পতিতাদের ভদ্র জীবনের মধ্যে পুনর্বিন্যাসেরও ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে আইনকে ফাঁকি দিয়ে তলায় তলায় অন্য আকারে বেশ্যাবৃত্তি চলতে থাকবে। অর্থাৎ এজন্যে চাই সমাজ-জীবনের আমূল সংস্কার। বিলম্বিত কৌমার্য ও বাধ্যতামূলক বৈধব্যের অবসান হলে এবং অবাঞ্ছিত বিবাহ বাতিলের ও পুনর্বিবাহের অধিকার মঞ্জুর হলে, নারীর পদস্খলনের সম্ভাবনা আপনিই কমবে। আর তথাকথিত কৌলীন্যের হাত একটু ঢিলে করে, আদর্শভ্রষ্টা বা বিপথগামিনী মেয়েদের ঘরে তুলে নেবার ও মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেবার বুদ্ধি জাগ্রত হলেও, বর্তমান পতিতারা অনেকে সৎজীবন যাপনের সুযোগ পাবে। কোন কোন পতিতা রূপ-লাবণ্যের বৈশিষ্ট্যে বা গান বাজনার কৃতিত্বে থিয়েটার ও সিনেমা কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজ-কাল ভদ্র-সমাজে উন্নীত হবার সুবিধা পাচ্ছে এবং বলাই বাহুল্য তা পাচ্ছে, কোন-না-কোন অনুরাগী খরিদ্দার বা 'বাবু'র সহযোগিতায় এবং বাড়ীওয়ালীকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে। কিন্তু বেশীর ভাগই বাড়ীওয়ালীর খবর্দারীতে বেশ্যালয়ের বন্দী-নিবাসে নিরুপায় ভাবে বেঁচে আছে। তাদের উদ্ধারের জন্যে কোন ব্যাপক পরিকল্পনা কবে হবে বা হবেই কি না কে জানে!

কেউ কেউ বলেন, পতিতা বৃত্তি গার্হস্থ্য জীবনের ভারসাম্য রক্ষার একমাত্র উপায় এবং নগর, বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের সহস্র সহস্র স্ত্রী-সঙ্গ-বঞ্চিত পুরুষের কর্মশক্তি অব্যাহত রাখারও একমাত্র উপায়। কাজেই ও থাকতেই হবে। নইলে অনুচিত গমন, ব্যভিচার ও বলাৎকারে সমাজ-শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত হবে। আমরা মনে করি, গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ-বিপর্যয়ই পাতিত্যের প্রধান কারণ, সুতরাং পাতিত্য জীইয়ে না রেখে, সমাজকে আমূল ঢেলে সাজাই প্রকৃত সমাধান। আর সে কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবার সময় আজই।

কিন্তু সমগ্র ভাবে পতিতালয় বা পতিতা-জীবন আমার আলোচনার অন্তর্গত নয়। আমি পতিতা-মুল্লুকের অন্ধকার নীচুতলায় কত রকম অন্যায় ও অনাচার প্রচলিত আছে এবং কি-কি কারণে সেগুলো সম্ভব হয়েছে, তার আলোচনাতেই এ অধ্যায় সীমাবদ্ধ রাখব। শুধু সাধারণ ভদ্র নর-নারীর এই জগৎ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন ধারণা না থাকতে পারে মনে করে, আমাকে এই দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করতে হল।

যাইহক, পতিতা ও পতিতালয় সম্পর্কীয় আলোচনা প্রসঙ্গে আগে খরিদ্দারদের কথা বলি। সমাজবদ্ধ জীবনে, বিশেষত তথাকথিত ভদ্র-জীবনে বেপরোয়া কামতৃপ্তির সুযোগ কম। অথচ অবস্থা নির্বিশেষে অধিকাংশ নর-নারীর মনেই আছে কোন-না-কোন রকমের বেয়াড়া খেয়াল, যা চরিতার্থ না হলে তৃপ্তি লাভ হয় না। যাদের পারিবারিক জীবনে এদিককার চরিতার্থতা অলভ্য নয়, তারা মোটের ওপর হয়ত সুখী। কিন্তু সে-রকম সুখী নর-নারীর সংখ্যা কম। অতৃপ্ত কামবাসনা অন্তরে গোপন করতে করতে, বেশ কিছু নারীরই হিষ্টিরিয়া বা উন্মাদনা দেখা দেয়। কারু কারু পদস্খলন হয়। কেউ কেউ কলহ-বিবাদ, শুচিবায় ও পারিবারিক অশান্তির কারণ স্বরূপ হয়ে সংসার-জীবন দুঃসহ করে তোলে। পুরুষের ওপর ঠিক এ রকমের প্রতিক্রিয়া অবশ্য বেশী হয় না। তার কারণ পুরুষ সমাজকে ফাঁকি দিয়ে নানা ভাবে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা করতে পারে। সে চরিতার্থতার প্রধান অঙ্গই হল পতিতাগমন। সেখানে সঙ্কোচের প্রশ্ন নেই, সম্ভ্রমের বালাই নেই, পরিণামেরও ভাবনা নেই। উপরন্তু নগদ মূল্য দিয়ে সর্ববিধ বদ-খেয়াল মেটানোর অবাধ অধিকার রয়েছে। সুতরাং সে সুযোগের পূর্ণাঙ্গ সদ্ব্যবহার তারা না করবে কেন ?

পতিতাগামীদের ভেতর যদিও অবিবাহিত, বিবাহিত, বিপত্নীক, সর্বশ্রেণীর লোকই পাওয়া যাবে, তবু অনুসন্ধানে দেখা যাবে যে বিবাহিত খরিদ্দারের সংখ্যাই অধিক। এত অধিক যে অন্য দুই শ্রেণীর খরিদ্দারের সংখ্যার দ্বিগুণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। আর লক্ষণীয় যে পতিতারাও তাদেরই খরিদ্দার হিসাবে বেশী পছন্দ করে। অবিবাহিত, বিশেষত অল্পবয়স্কেরা যায় পতিতাদের সঙ্গে প্রেম করতে। কিন্তু পতিতারা প্রেমের ধার ধারে না। তারা বরং প্রেমকে ভয় করে। কারণ তারা জানে, তাতে ব্যবসার সর্বনাশ। আর বিপত্নীকেরা যায়, তাদের কাছে সেবা,

মমতা ও দাক্ষিণ্য আদায় করতে, যা তারা কারুকে সহজে দিতে প্রস্তুত নয়। কাজেই অবিবাহিত বা বিপত্নীক খরিদ্দারের পতিত সমাজে তেমন আদর নেই। তাদের অভিজ্ঞতা নাকি এই যে অবিবাহিতের সঙ্গে প্রেমের ছলা-কলা না করলে এবং বিপত্নীকের পা টিপে বা গায়ে হাত বুলিয়ে না দিলে, দ্বিতীয় দিন আর তারা আসে না। আবার এদিক থেকে তাদের খুশী করলেও নাকি বিপদ। তারা কিছুতেই আর সঙ্গ ছাড়তে চায় না। দিবা-রাত্রি পায়ে পায়ে ঘোরে। যে-কোনটাই ব্যবসা হিসাবে অলাভজনক। পক্ষান্তরে বিবাহিত ব্যক্তি যারা আসে, তারা আসে নিছক বদ-খেয়ালের বশবর্তী হয়ে এবং সেই সব খেয়াল যৎপরোনাস্তি চরিতার্থ করেই চলে যায়। এই আনা-গোনায় তাদের নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার যেমন অভাব নেই, তেমনি বখশিস দেনে-ওয়ালা হিসাবেও তারাই নাকি সেরা বাবু। সুতরাং তাদের তৃপ্ত করতেই পতিতারা সব চেয়ে বেশী যত্নবান হয়।

খরিদ্দারের শ্রেণী-নির্ণয় হিসাবে এই মাপকাঠি ষোল-আনা নির্ভরযোগ্য হয়ত নয়। কিন্তু পতিতা সমাজে যাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি খুব বেশী, দেখা গেছে, তাদের মধ্যে বিবাহিত লোকের সংখ্যাই সর্বাধিক। পতিতাদের খরিদ্দার হল মোটামুটি দু-রকমের। এক খুচরো বা ছুটো, আর বাঁধা বা টাইমের বাবু। এই টাইমের বাবু অনেকেই বিবাহিত এবং পুত্র-কন্যা পরিবৃত সংসারে তাঁদের বাস। তাঁরা কেউ বঞ্চিত মানুষ নন। তবু তাঁরা কেন পতিতালয়ে যান? যান শুধু নানা ধরণের বদ-খেয়াল চরিতার্থ করার নেশায়।

কতকগুলি স্বীকৃতি উল্লেখ করছি। এক মর্যাদাবান ভদ্রলোক কোন পতিতাকে প্রভূত অর্থের বিনিময়ে প্রত্যহ সন্ধ্যায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। এই পতিতাটি যেমন কুৎসিত, তেমনি কলহপ্রিয়। তা সত্ত্বেও সে তাঁর এমন কতকগুলো কুশ্রী অভ্যাস চরিতার্থ করত, যা তাঁর সুন্দরী ও বিদুষী পত্নীকে দিয়ে হবার নয়। অভ্যাসগুলো তিনি প্রথম শিক্ষা করেন কতক গুলি বিলেতী ছবি দেখে। আর একজনেরও অনুরূপ স্বীকৃতি আছে। তিনি পতিতালয়ে যেতেন পতিতাকে বিবস্ত্র করিয়ে এবং স্বয়ং পরিচ্ছদ বর্জন করে তার সঙ্গে হুড়োহুড়ি করতে, স্নান ও পান-ভোজন করতে। এর অধিক আর কিছু তিনি করতেন না, দূষিত ব্যাধির ভয়ে। আর এক ভদ্রলোক তাঁর অনুগত পতিতাকে দিয়ে আরো দুটি-তিনটি পতিতাকে প্রতিদিন তার ঘরে ডাকিয়ে আনতেন। তারপর উচ্চ পরিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে,

তাদের সকলকেই তিনি বিশ্রী ভাষায় কৃত্রিম কলহে প্রবৃত্ত করাতেন। তারা চরম ইতরতার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি ও মারামারি করত, আর তিনি সেই দৃশ্য উপভোগ করতেন। এই পতিতাদের অনৈসর্গিক অনুষ্ঠানও তিনি উপভোগ করতেন। এ সবের অনেক ছবিও তিনি তুলেছিলেন. যার কিছু-কিছু এক সময় আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে।

কোন ধনী ব্যক্তি হাজার টাকার বিনিময়ে নিজের পোষা পতিতাকে গৃহ-পালিত কুকুরের সঙ্গে কুক্রিয়ায় নিরত করেছিলেন। এই রকম ঘটনা আরো আছে। একমাত্র পতিতালয়ই যে এই কাজের পক্ষে সর্বোত্তম স্থান, তাতে আর সন্দেহ কি? সর্বশেষে উদাহরণ দেব আর এক ব্যক্তির। ইনি শিক্ষিত এবং দায়িত্বশীল কর্মে নিয়োজিত। এঁর প্রবল আসক্তি ছিল নাবালিকাদের ওপর। তারি সহায়ক রূপে ইনি এক পতিতাকে খাড়া করেছিলেন। সে প্রচুর খাদ্য ও পয়সা দিয়ে পথের বালিকাদের ভুলিয়ে এনে নিজের কাছে রাখত এবং তাদের উৎসর্গ করে দিয়ে বাবুর তৃপ্তি সাধন করত। এই ভাবে এক-একটি বালিকা আটদিন দশদিন আটক থাকার পর ফরমায়েস হত আর একটা আনার এবং তার জন্যে আবার নতুন পরিশ্রমিকের ব্যবস্থা হত। পতিতালয়ের মালিকরা খরিদ্দারের এই সব বদ-খেয়ালের খবর ভালো করেই জানে। তারা তাই এ সব উপকরণ নিজেরাও কিছু-কিছু সংগ্রহ করে রাখে।

অনেক পতিতালয়ে পরিচারক রূপে কিছু-কিছু নাবালক ছেলে ও মেয়ে থাকতে দেখা যায়। এই সব ছেলে কালক্রমে গুণ্ডা ও মেয়ে পতিতায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অপরিণত বয়সেই এরা পতিতালয়ের বিষাক্ত আবহাওয়ায় থেকে সব রকমের দুক্রিয়ায় দীক্ষা লাভ করে। ছেলেরা নর-পশুদের কবলে আত্মসমর্পণ করা থেকে সুরু করে, গুপ্তচিঠি বহন, চোরাই মাল বিক্রী, পথ ও পার্ক থেকে প্রলুব্ধ করে খরিদ্দার সংগ্রহ করে আনা পর্যন্ত, সব রকম কাজেই রীতিমতো দড় হয়ে ওঠে। মেয়েরাও দশ, এগারো, বারো বছর বয়সেই পতিতাবৃত্তির প্রাথমিক সোপানগুলি পার হয়ে যায়। মদ্যপান, সংসর্গ দান, অশ্লীল কলহ, ব্লু-ফিল্মে অভিনয়, কোন কাজেই তাদের বিশেষ অপটুতা দেখা যায় না। আইনে নাবালিকার বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ, তাই তাদের রাখা হয় পরিচারিকা রূপে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বদ লোকের বদ-খেয়াল মেটানো এবং ভাবী পতিতার দলপুষ্টি করাই হল তাদের জীইয়ে রাখার আসল উদ্দেশ্য।

পতিতালয়ের নিয়মিত খরিদ্দাররা সবাই এটা জানে। এই সব নাবালক ছেলের নাম হল চৈ এবং মেয়ের নাম হল চুটকী। বেশ্যালয়ে এই পারিভাষিক ব্যবহার করলে অভিজ্ঞ লোক সকলেই বোঝে।

সাধারণত বে-ওয়ারিশ পথের ছেলে-মেয়েদেরই প্রলুব্ধ করে আড়কাঠিরা নিয়ে এসে এই কাজে লাগায়। কদাচিৎ অপহৃত মফঃসলের বালক-বালিকার ভাগ্যেও এ বিপত্তি ঘটতে দেখা যায়। তাছাড়া দুরবস্থাগ্রস্ত গৃহস্থের বা ঘুষকীদের সন্তানরাও জীবিকা এবং ভাবী শিক্ষার জন্যে অনেক সময় এই কাজে নিয়োজিত হয়। কোন-কোন পতিতালয়ে বিকৃত-রুচি খরিদ্দারের তৃপ্ত্যর্থে পেশাকর বালকরা নারীসুলভ সাজ-সজ্জা করে হাজির হয় এবং সর্বভাবে নারীর ভূমিকা অভিনয় করে, এ অনেকে জানেন আশা করি। ধনী-গৃহের আদুরে দুলালদের বখাবার জন্যে মোসাহেব গোষ্ঠী তাদের পতিতালয়ে নিয়ে এলে, সাধারণ চুটকীদের এগিয়ে দেওয়া হয় তাদের সঙ্গে ইয়ার্কি-মস্করা করতে। অবশ্য পূর্ণবয়স্ক, এমন কি প্রবীণ খরিদ্দারেরও চুটকী অনুরাগের প্রভূত নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে।

তদন্তে দেখেছি, এই সব ছেলে-মেয়ের মধ্যে অল্প বয়স থেকেই কেমন একটা আরোপিত যৌন-তৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে। এমনি একটি ছেলে তার জবানবন্দীতে বলে যে নিজেকে নারী কল্পনা করতে, তার গোড়ায় অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হত। ভয়ও হত। কিন্তু ক্রমে এতে তার এমনি আসক্তি জন্মে যায় যে পরবর্তী কালে সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে বহু ব্যক্তিকে কুক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করেছে। আর একটি ছেলে বলে যে মাতাল দুর্বৃত্তের উৎপাত-উপদ্রবের মধ্যে সে কেমন একটা অশুচি আকর্ষণ অনুভব করে, যা অনভিপ্রেত মনে হয় না। অবশ্য সমস্ত স্বীকৃতিতেই দেখেছি যে ছেলেদের আগে জোর করে এই কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে এবং তা করেছে পতিতালয়ের গুণ্ডারা। তারপর সেটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে।

নাবালিকাদের স্বীকারোক্তিও অনুরূপ। একটি দশ-এগারো বছরের অনাথা মেয়ে বলে যে তাকে গ্রাম থেকে একটি লোক খেতে পরতে দেবার নাম করে কলকাতায় নিয়ে এসে যে বাড়ীতে ওঠায়, সেটা হল পতিতালয়। বাড়ীওয়ালী তাকে ভালো জামা-কাপড় দেয়, আদর-যত্ন করে এবং ভবিষ্যতে অনেক গয়না-গাঁটি দেবে বলে আশ্বাস দেয়। তারপর ক্রমে তাকে এক-এক রাত্রে এক-একটি পতিতার ঘরে প্রবেশ করানো সুরু হয়। সেখানে তার উপস্থিতিতে

আগত ব্যক্তিরা পতিতাদের সঙ্গে কদর্য অনুষ্ঠান সমূহ করতে থাকে। প্রথম প্রথম সে ভয় পেত। ক্রমে ভয় ভেঙে গেল। অবশেষে এ ব্যাপারে তার আগ্রহ জন্মাতে লাগল। কোন কোন কার্যে পতিতাদের নির্দেশ ক্রমে সে সহযোগিতাও করতে আরম্ভ করল। তারপর কোন পতিতার পরামর্শ ক্রমে একদিন এক ব্যক্তি তার ওপর ক্রিয়ায় উদ্যোগী হলে, সে আর আপত্তি করল না এবং এ জন্যে পাওয়া পারিশ্রমিকটা সে বাড়ীওয়ালীর অগোচরে আত্মসাৎ করল। এরপর সেই পতিতার সঙ্গে পরামর্শ করে, গোপনে সে প্রত্যহ কিছু-কিছু উপার্জন করতে লাগল। কিন্তু বাড়ীওয়ালীকে বেশী দিন ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হল না। তখন থেকে তার ওপর খরিদ্দার 'বসানো'র দায়িত্ব ন্যস্ত হল।

আর একটি নাবালিকা বলে, সে প্রথমে পরিচারিকা রূপে পতিতালয়ে আসে। তাপপর একদিন দুপুরে ছাদে কাপড় মেলতে গিয়ে সে দেখে, রাত্রিবেলার এক বাবু সেখানে বসে রোদ পোহাচ্ছে। ঐ লোকটি তাকে সস্নেহে কাছে ডাকে এবং রকমারি খবর জিজ্ঞাসা করতে থাকে। শেষে তার তিন টাকা বেতন শুনে করুণায় বিগলিত হয়ে বলে যে সে (মানে মেয়েটি) ইচ্ছা করলে, আরো অনেক টাকা রোজগার করতে পারে। কি ভাবে, মেয়েটি প্রশ্ন করল। উত্তর স্বরূপ লোকটি তাকে স্থানোচিত পরামর্শ দিল এবং নগদ প্রাপ্তির উপায়টাও হাতে-হাতেই বুঝিয়ে দিল। এরপর ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে অল্পদিনেই সে শিশু-গণিকায় পরিণত হল। প্রথমে সেই লোকটি, তারপর একে একে অনেক লোক তার খরিদ্দার তালিকাভুক্ত হল।

প্রথমানুষ্ঠানের ফলে দীর্ঘদিন শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকার এবং ভয় বশত আর এ-কাজে সম্মত না হওয়ায় নির্দয় প্রহার লাভের ঘটনাও অনেক মেয়ের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। প্রথমানুষ্ঠানের জন্যে পতিতালয়ে সাধারণত একটা অনুষ্ঠান হয়, তার সাঙ্কেতিক নাম বেধন (ভেদন ?)। এই অনুষ্ঠানে যে নায়কতা করে, বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে হয় তার জামাই সুবাদ। অনেক টাকা ও জামা-কাপড় ভেট দিয়ে তাকে এ কাজ করতে হয় এবং করতে হয় অপরাপর পতিতার অনুমোদন নিয়ে। এই ভেদনের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান রূপে অনাহত কুমারীর আগে একটা বিবাহ দেওয়া হয়, ছুরি, কাঁচি, কাটারী, এমনি কোন একটা অস্ত্রের সঙ্গে। তাতে উলু ও শঙ্খধ্বনি দিয়ে এবং ছড়া কেটে পতিতারা উৎসব করে। এই কাজে যোগ্যতার্জন ত্বরান্বিত করার জন্যে সিক্ত সোলা প্রয়োগের রীতি পতিতালয়ে ব্যাপক ভাবে চলিত আছে।

পতিতালয়ের অন্যায় অনাচার এই টুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। বীভৎসতম ন্যক্কারজনকতা ও কঠিনতম নৃশংসতার পরিচায়ক আরো যে কত ঘটনা হয়, তা বহু পাকা লোকেরও জানার সুযোগ হয় না। এক ব্যক্তি হাজার টাকার প্রতিশ্রুতিতে কোন পতিতার বক্ষদেশ কামড়ে প্রভূত রক্তপাত ঘটিয়েছিল। আর এক ব্যক্তি পতিতাদের উরু, নিতম্ব ও অন্যান্য অঙ্গে দংশন করে সেই স্থান থেকে নিঃসৃত রক্ত চুষে নিত। এজন্যে পতিতা সমাজে তার নাম দাঁড়িয়েছিল পিচেশ (পিশাচ)। আয়ত্তাধীন পতিতাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা, মদ্যপানে অচৈতন্য পতিতার কণ্ঠে বা বুকে ছুরিকাঘাত, গোপনাঙ্গে এসিড প্রক্ষেপ, গহনা ও অলঙ্কার হরণ ইত্যাদির ঘটনাও যৌনবিকারেরই নিদর্শন। অবশ্য অনেক সময় অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি আক্রোশ বশে বা রক্ষিতা-পতিতার একনিষ্ঠতায় অবিশ্বাসের ফলেও এসব হয়। মোটের ওপর কারণ যাই হক, যে মনস্তত্ত্ব পেছন থেকে কাজ করে, তা যে বিকৃতি এবং সে-বিকার যে যৌনাত্মক, তাতে আর সন্দেহ নেই।

অবশ্য এই শেষোক্ত ব্যাপারগুলো পেশাদার পতিতালয়ে খুব বেশী হতে পারে না, কারণ অদৃশ্য প্রহরীর মতো পতিতালয়ের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকে একদল গুণ্ডা। তেমন-তেমন দেখলেই অকস্মাৎ কোন অলক্ষিত কোণ থেকে তারা আবির্ভূত হয় এবং অন্যায়কারীর টুঁটি টিপে ধরে। অভিজ্ঞদের ধারণা যে পতিতাদের খাটের নীচে, আলমারীর পেছনে, বিছানার গাদার নীচে পর্যন্ত নাকি গুণ্ডা লুকিয়ে থাকে। প্রথমত পতিতা বাড়ীওয়ালীকে ফাঁকি দিয়ে উপার্জনের কিছুটা আত্মসাৎ করছে কিনা এবং দ্বিতীয়ত কোন খরিদ্দার পতিতার ধন-প্রাণ হরণ করছে কিনা, লক্ষ্য করার জন্যেই নাকি এ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার দরুণ গুণ্ডা ও খরিদ্দারে মারামারি খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে থাকে এক-এক সময়।

এক অল্পবয়স্ক তরুণ কোন পতিতাকে তার সঙ্গে পলায়নে উৎসাহিত করে। প্রাথমিক উপায় স্বরূপ পতিতাটি আপন গহনা-পত্র ও কিছু লুকানো টাকা আগে তার হাত দিয়ে পাচার করার চেষ্টা করে। কিন্তু অন্তরাল থেকে গুণ্ডা সব লক্ষ্য করে এবং যথাসময়ে সে যুবকটিকে ধরে ফেলে ও তাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করে তার ঘড়ি, আংটি, বোতাম, সমস্তই কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়। আর এক ব্যক্তির বাঁধা পতিতা তাঁর হুকুম অমান্য করে কোন অনভিপ্রেত ব্যক্তিকে আত্মদান করায় এবং আপন নিরাবরণ দেহের ছবি

সেই ব্যক্তিকে তুলে নিতে দেওয়ায়, তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন তিনি। কিন্তু এক ঘা বসানোর সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে প্রচণ্ড এক ঘা এসে পড়ে তাঁর মাথায় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর ঐ গুণ্ডার প্ররোচনায় স্ত্রীলোকটি সদরে গিয়ে দাঁড়ায় এবং কোন নারী-সন্ধানী যুবককে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখে, স্বল্প দক্ষিণায় সঙ্গ-দানের প্রতিশ্রুতিতে ভুলিয়ে আপন ঘরে আনে। যুবকটি যে-ই ঘরে ঢুকেছে, সঙ্গে সঙ্গে শিকল তুলে দিয়ে সে চীৎকার করে, খুন, খুন, শীগ্রী এসো! বলা বাহুল্য বেকুব যুবক বিনা অপরাধেই নরহত্যার দায়ে জড়িয়ে পড়ে। জালমুদ্রা, চোরাই মদ, আফিং, অশ্লীল ছবি, বই, এ-সবের সন্ধানে এসেও গুণ্ডার শঠতায় সময়-সময় অনেকে নিপীড়িত হয়েছে।

আগেই বলেছি, গুণ্ডারাই হল পতিতালয়ের অভিভাবক। এরা বাড়ী-ওয়ালীর মাসীত্বের সুযোগে তার প্রতিপাল্য প্রত্যেকটি মেয়ের ওপর একাধিপত্য করে। তারা যাকে যেদিন রেঁধে খাওয়াতে বলবে, তাকে সেদিন খাওয়াতেই হবে। যাকে যখন কামনা করবে, তাকে তখনি সে হুকুম তামিল করতে হবে। এছাড়া বাড়ীওয়ালীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে খরিদ্দারের কাছে পাওয়া উদ্বৃত বখশিসের বখরা তাকে দেওয়া, কিংবা গুণ্ডার আদেশক্রমে এক আড্ডা থেকে পালিয়ে আর এক আড্ডায় গিয়ে ঢোকা এবং এক জনের সঙ্গ ছেড়ে আর এক জনের রক্ষিতা রূপে থাকাও পতিতাদের অনেকের ভাগ্যে বাধ্যতামূলক। এই গুণ্ডারাই স্ত্রীলোকদের বিশ্রী ফোটো তোলে, তাদের দিয়ে ব্লু-ফিল্মে অভিনয় করায়। রকমারি অন্যায়-অনাচারের অনুষ্ঠান করায়। অর্থাৎ পতিতালয় হল এক হিসাবে গুণ্ডালয়ও। বাড়ীওয়ালীর উপায় নেই এদের হাতে না রেখে। অবশ্য শেষপর্যন্ত এদের হাতেই সর্বস্বান্ত হয়ে অনেক বাড়ীওয়ালীকে বৃদ্ধ বয়সে পান বেচে বা বাসন মেজে খেতে দেখা যায়। তবে হুঁসিয়ার বাড়ী-ওয়ালীও আছে এবং অনুসন্ধানে দেখেছি, তাদের অনেকের পেছনে সমাজ-জীবনের বড় বড় ক্ষমতাওয়ালা লোক সহায়ক রূপে মোতায়েন আছেন।

এই সব গুণ্ডা নিরুপায় পতিতাদের ওপর কি ভাবে তাদের কর্তৃত্ব খাটায়, তার দু-একটা নিদর্শন এখানে দেওয়া হচ্ছে। একটি সুন্দরী ও অল্পবয়স্কা পতিতার প্রার্থী রূপে একদিন একযোগে দশটি ইয়ার এল। প্রত্যেকে রাত্রি-বাসের দাবীদার এবং পনেরো থেকে কুড়ি টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত। মেয়েটি কিছুতেই রাজী নয়, সে ঘোরতর আপত্তি সুরু করল। তখন

গুণ্ডা তাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে কলতলা থেকে ঘাড়ে করে সেই খরিদ্দার-বৃন্দের মধ্যে নিয়ে এল। তারপর নিজে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। সেই উন্মাদ মদ্যপ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে অর্ধ-মৃত মেয়েটি প্রায় তিন মাস হাঁসপাতালে পড়ে থেকে তবে রক্ষা পায়। আর একটি রোগ-গ্রস্ত পতিতার ওপর কোন দুষ্ট ব্যক্তির নজর পড়ে। সে তাকে এগিয়ে দেবার জন্যে পুনঃ পুনঃ তাগাদা করতে থাকে এবং এজন্যে মোটা টাকার লোভ দেখায়। ফলে বাড়ীওয়ালীর স্বার্থে এই অবস্থাতেই গুণ্ডা চাবুক হাঁকিয়ে তাকে উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য করে। যন্ত্রণায় মেয়েটি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে, তবুও তাকে মুক্তি দেওয়া হয় না। গুণ্ডার নির্দেশ নাবালক-নাবালিকাদেরও কি রকম নতশিরে পালন করতে হয়, তারও কিছু-কিছু বিবরণ আছে। দেখেছি তারাও অনেক সময় গোপনে অর্থোপার্জন করে গুণ্ডাকে ঘুষ দেয়, শুধু তার শাসনদণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবার আশায়।

গণিকালয়ে উপার্জন ও জীবন-যাপনের সাধারণ রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধেও দু একটা কথা বলে রাখা বোধহয় দরকার। সমস্ত গণিকালয়েরই নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনা চলে অনেকটা পুরানো সামন্ত প্রথার ছক ধরে। ধৃত, অপহৃত, স্বেচ্ছাগত, যে রকমের পতিতা হক, একবার পতিতালয়ের আওতায় কোন মেয়ে এসে পড়লে, তার আর অব্যাহতি নেই। সমস্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে তাকে বাড়ীওয়ালীর তহবিল বৃদ্ধি করতে হবে। তার উপার্জন ও পুরস্কারের সমস্তটা তুলে দিতে হবে তার হাতে এবং তার নির্দেশক্রমে যে-কোন খরিদ্দারের যদৃচ্ছ জুলুম মাথা পেতে নিতে হবে। এর বিনিময়ে সে শুধু অন্ন-বস্ত্র সাজ-সজ্জা ও হাতখরচা বাবদ প্রত্যহ কিছু-কিছু ভাতা পাবে। সুতরাং প্রাপ্তির পরিমাণটা যে বেশী নয়, এ ত বলাই বাহুল্য। স্বভাবতই উপরি আয়ের জন্যে বাড়ীওয়ালীকে লুকিয়ে, পতিতাদের রকমারি কৌশল ও ফন্দী-ফিকির আঁটতে হয়। এই ফন্দী-ফিকির থেকেই আসে খরিদ্দারদের রকমারি বদ-খেয়াল চরিতার্থ করার প্রয়োজন, যেহেতু নির্দিষ্ট দক্ষিণার উর্ধ্বে আরো কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে এ-সব থেকে। তাছাড়া অবশ্য অন্য অনেক রকমের জুয়াচুরিও তারা করে। খরিদ্দারের মাতলামির সুযোগে তার ঘড়ি, বোতাম ও মনিব্যাগ সরিয়ে নেয়। এক বোতল মদের দাম আদায় করে, আধ বোতল আড়ালে ঢেলে রাখে এবং বাকিটা জল দিয়ে ভরিয়ে দেয়। বায়স্কোপ দেখার বখশিস বলে উদ্বৃত্ত পয়সা আদায় করে নেয়। কিন্তু মূল চুক্তির সঙ্গেই আনুষঙ্গিক

খেয়াল-খুসী মিটানো এবং তার দরুণ থোক দস্তরী আদায় করাটাই হল বহুল প্রচলিত রীতি।

অনেকে হয়ত জানেন না যে তথাকথিত যৌন-সংস্রব জীবিকার অন্তর্গত বলে, পতিতাদের সে সম্বন্ধে মোটেই নিজস্ব অনুরাগ থাকে না। পুনঃ পুনঃ গর্ভপাত করানোর বা গর্ভ-নিরোধার্থে 'পেট-পোড়া' খাওয়ার, সময়ে-অসময়ে অসুস্থ সম্পর্কে মিলিত হওয়ার এবং নিয়মিত মদ্যপানের ফলেও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বেশীর ভাগ পতিতারই দ্রুত নিস্তেজ হয়ে আসে। অনেকের মাসিক অকালে বন্ধ হয়ে যায়। এই সব কারণে অধিকাংশ পতিতাই রকমারি কুরুচির অনুরাগী হয়। প্রহার, রক্ত-মোক্ষণ ও নির্যাতনেও অনেকের একটা যন্ত্রণা-মিশ্রিত আনন্দের অনুভূতি হয়। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত লাজুক ও অনভিজ্ঞ প্রকৃতির তরুণ পেলেও কারু কারু প্রবৃত্তি উদ্দাম হয়ে ওঠে।

এ ভিন্ন পতিতালয়ে পতিতায় পতিতায় গোপন প্রেমের ব্যাপারও কম হয় না। পুরুষ সম্প্রদায়ের নিরাবরণ পশুত্ব, নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও নিদারুণ নিষ্ঠুরতার স্রোত পাড়ি দিয়ে যাদের প্রতিনিয়ত চলতে হয়, অথচ জীবিকার প্রয়োজনে পুরুষ-সংস্রবে এড়িয়ে চলার কোন উপায় যাদের নেই, স্বভাবতই তারা ভেতরে ভেতরে পুরুষ সম্পর্কে একটা অবিশ্বাস, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার ভাব পোষণ করে। হয়ত এই জন্যেই তারা বিশ্বাস ও ভালোবাসার পাত্র হিসাবে নারীকেই অধিকতর সম্মানার্হ মনে করে। তাছাড়া একত্র বসবাস এবং বহু সময় একত্র থাকার ফলেই অল্পবয়স্ক পতিতারা পরস্পর প্রণয়াবিষ্ট হয় এবং সে প্রণয়ে মান-অভিমান, রাগ-রোষ, বিরহ-বিচ্ছেদ, সবই থাকে। দু-জনে মালা বদল এবং দেবস্থানে গিয়ে অটুট প্রণয় রক্ষার শপথ গ্রহণ, এক জনের জন্যে অন্যের পাগল হওয়া, আত্মহত্যা করা, অনেক কিছুই হতে দেখা যায়।

মোটকথা লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন, সমুদয় সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার বিবর্জিত, মদ্য ও উত্তেজক পদার্থের তাড়নায় বিভ্রান্ত পতিতা-জীবনের বিড়ম্বনা ও দুঃখ-দুর্দশা বলে বোঝানোর নয়। কিন্তু যে-যে কারণে পতিতা হয়, তা যত দিন না সমাজ থেকে উৎখাত হচ্ছে, তত দিন আইনের সাহায্যে পতিতাবৃত্তি রহিত করে দিলেও, পুরুষের দুষ্ট ক্ষুধাই গোপনে নূতন ধরণের পতিতালয় গড়ে তুলবে এবং নারীর অসহায় পরনির্ভরতা তার কাছে আত্মসমর্পণও করতে বাধ্য হবে।

নবম অধ্যায়

গুপ্ত পতিতা

প্রকাশ্য পতিতা বা বাজার-বেশ্যাদের কথা বলেছি। এবার গুপ্ত পতিতাদের কথা বলছি। বাজার-বেশ্যারা খোলাখুলি দুষ্কৃতির ব্যবসা চালায়, কাজেই এক-দৃষ্টেই বোঝা যায় যে তারা সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু গুপ্ত বেশ্যারা থাকে সমাজ-জীবনের মধ্যে এবং সমাজ-দৃষ্টিকে যথাসম্ভব ফাঁকি দিয়ে তলায় তলায় ব্যবসা চালায়। কাজেই সামাজিক অনিষ্টটা হয় তাদের দ্বারাই বেশী। প্রাত্যহিক আদান-প্রদানে ও ওঠা-বসায় সর্বদা তারা সমাজবদ্ধ নর-নারীর সংস্রবে আসে এবং সেই সুযোগে কখন অলক্ষ্যে আপন শিকার পাকড়াও করে, তা সহসা টের পাওয়া যায় না। অন্যের চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনায় বা সামাজিক সম্ভ্রম বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে, দুশ্চরিত্র লম্পটেরা বা বিকৃতাসক্তি পরায়ণ ভদ্রলোকেরা সব সময় প্রকাশ্য পতিতাদের কাছে যেতে সাহস পান না। ভালোমানুষীর ভড়ংটা জীইয়ে রাখার কৌশল হিসাবে তাঁরা গুপ্ত বেশ্যাদের সঙ্গে মিতালি পাতানোই বেশী পছন্দ করেন। ফলে এই সম্প্রদায়ের কারবার পূরো মাত্রায় চলে, অথচ বাইরে থেকে কেউ তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারেন না।

এই গুপ্ত বেশ্যাদের মোটামুটি দুটো দলে ভাগ করা যেতে পারে। একটার চলতি নাম ঘুষকী। এরা সাধারণত অনভিজাত পর্যায়ের নারী এবং সহুরে দরিদ্র-সমাজের মধ্যেই তাদের চলা-ফেরা সীমাবদ্ধ। আর একটার কোন নির্দিষ্ট নাম নেই, বলা যেতে পারে বিলাসিনী। তারা ভদ্র নারীর ছদ্মবেশে অভিজাত সমাজের ভেতর দুর্নীতির ব্যবসা চালায়। বস্তুত দু-দলই এক এবং যৌনাধিকারের বিনিময়ে উভয়েই অর্থোপার্জন করে। যদিও প্রথম দলটা বাইরে ঝি, চাকরানি, পাচিকা, দাই, আর দ্বিতীয় দলটা অভিনেত্রী, ধাত্রী, ছাত্রী, এমনি যাহক একটা কিছু সেজে থাকে, যার ফলে সমাজ-জীবনের ভেতর অবাধ আনাগোনার পথটা তাদের সুগম থাকে এবং সহসা কেউ সন্দেহ করে না। অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায় সহকারে এদের পশ্চাদনুসরণ করলে দেখা যাবে, সংখ্যায় এরা তথাকথিত বাজার-বেশ্যাদের চেয়ে কম নয়। আর অন্যায়-অনাচারেও এরা তাদের চেয়ে একচুল পিছনে নয়।

আগেই বলেছি, বাইরে এরা সবাই যথাসম্ভব গৃহস্থ সেজে থাকে এবং সামাজিক শিষ্টতাও শালীনতা বজায় রেখে চলতে কসুর করে না। কাজেই যে-কোন লোক ইচ্ছা মাত্র এদের ঘরে খরিদ্দার রূপে হাজির হতে পারে না। এমন কি সেই মর্মে কোন আভাস-ইঙ্গিত দিতে গেলে, অপরিণামদর্শী বোকাকে অনেক সময় এদের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে ফিরতে হয়। কারণ পাড়া-প্রতিবেশীর সামনে ও গৃহ-পরিবারে এরা নিজেদের শিষ্ট পরিচয়টাই জীইয়ে রাখতে চায়। এরা উদ্দিষ্ট লোকদের সঙ্গে যোগ-সাজোস করে খুব গোপনে এবং দুষ্কৃতির কারবারও চালায় সাধারণত বাড়ীর বাইরে। অনেক সময় এ জন্যে এদের নিয়োজিত স্ত্রী-পুরুষ দালাল থাকে এবং সহরের আনাচে-কানাচে অল্প সময়ের জন্যে ব্যবহার করার মতো ঠিকে ঘরও এদের ভাড়া করা থাকে। এরই একটু উঁচুতর সংস্করণ হল বার, রেস্তরাঁ, হোটেল ও নৃত্য-শালার ভেতর গোপনে জীয়ানো ঠিকে কেবিন। দালালী, দস্তুরী বা দক্ষিণার প্রসাদে এই চোরা বেশ্যা-বৃত্তির কারবার সহরে ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলে এবং অনিবার্য না হলে, সচরাচর সেটা জানাজানি হয় না।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে দেশের সামাজিক অব্যবস্থা এবং অর্থনীতিক অধোগতিই সকল রকম বেশ্যা-বৃত্তির কারণ, সে প্রকাশ্যই হক, আর গুপ্তই হক। তবে প্রকাশ্য পতিতাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য এই যে এরা সামাজিক অখ্যাতিকে ভয় করে। যথাসাধ্য সেটা এড়িয়ে চলতেও চেষ্টা করে, যা অন্য দলটাকে করতে হয় না। তারা কোন-না-কোন কারণে সমাজ-জীবন থেকে উৎখাত হয়ে এমন জায়গায় এসে দাঁড়ায়, যেখান থেকে আর ফিরে যাওয়ার বা উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। স্বভাবতই গ্লানি ও অধঃপতনের সম্বন্ধে তারা পুরোপুরি বেপরোয়া। পক্ষান্তরে গুপ্ত বেশ্যারা সকলেই থাকে লোকালয়ে এবং আত্মীয়-পর, চেনা-পরিচিত, পাঁচ জনকে নিয়ে জড়িয়েই তাদের বসবাস করতে হয়। অথচ অন্ন-বস্ত্রের জন্যে, সেই সঙ্গেই হয়ত অতৃপ্ত লালসা চরিতার্থ করার জন্যেও, তাদের দেহ বিক্রী করতে হয় এবং তা করে আত্মরক্ষা ও পরিবার পালন করতে হয়। কাজেই ভালোমানুষীর ছদ্মবেশ ভিন্ন তাদের উপায় কি ?

অভিজাত এবং অকুলীন দু-পর্যায়ের গুপ্ত বেশ্যাদের স্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা যায় যে প্রধানত এবং প্রথমত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তারা গোড়ায় এই পথে পা দেয়। তারপর হয়ত অসৎ জীবনের স্বাদে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে,

তার ফলে আর ফিরে যেতে পারেনি, বা চায়নি। নয়ত নিজেরা ফিরতে চাইলেও, এই কার্যের দোসর এবং সঙ্গী-সাথীরা আর তা যেতে দেয়নি। অবশ্য কিছু কাল এই জীবন গোপনে যাপন করার পরে, আবার ভদ্র জীবনে ফিরে গেছে এবং অতীত ইতিহাস আমূল মুছে ফেলেছে, এমন ঘটনাও পেয়েছি। একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে এই গুপ্ত বেশ্যাদের ভেতর শুধু বয়স্কা কুমারী ও তরুণী বিধবাদের সংখ্যাই বেশী নয়, বিবাহিতা এবং স্বামী ও পুত্র-কন্যা পরিবৃতাদেরও দেখা পেয়েছি নেহাৎ অল্প নয়।

দু-পর্যায়ের নিদর্শনই কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করছি। একটি ভদ্র তরুণী কলকাতার কোন কলেজে পড়ত। তারি সুযোগে সহপাঠিনী বান্ধবীদের বাড়ী আনাগোনা করত। হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হল যে এই আনাগোনার ফাঁকেই সে অবস্থাপন্ন ঘরের যুবকদের সঙ্গে ভাব-সাব করে ও তাদের সঙ্গে হোটেলে ও নাইট-ক্লাবে গিয়ে অর্থোপার্জন করে। বাইরে থেকে অনেকে তাকে শুধু আধুনিকা বলে জানে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে দেহোপজীবিনী ছাড়া কিছু নয়। তার এই অধঃপতনের কৈফিয়ৎ স্বরূপ মেয়েটি বলে যে তার বৃদ্ধ বাবা দীর্ঘদিন থেকে কঠিন রোগে শয্যাগত। তাঁর চাকরী গেছে। বাড়ীতে তারা তিন বোন, মা এবং দুটি ছোট ভাই। এত বড় সংসার বিনা উপার্জনে ক-দিন চলতে পারে? কাজেই মায়ের প্ররোচনায় বাধ্য হয়ে তাকে উপার্জনে ব্রতী হতে হয়েছে এবং প্রচুর উপার্জন সম্ভব একমাত্র এই পথেই। তাকে তাই এই পথই নিরুপায় ভাবে বেছে নিতে হয়েছে। তার মা-বাবাও এটা জানেন। কিন্তু নিরুপায় বলেই নিঃশব্দে সমর্থন করেন।

আর একটি তরুণীর ইতিহাসও প্রায় একই রকম। সে ভালো গাইতে পারে। সৌখীন সমাজের পার্টিতে প্রায়ই তার আমন্ত্রণ হয় গান গাওয়ার জন্যে। আর এই সব পার্টির উদ্যোক্তাদের মধ্যে দু-এক জনকে শিকার করেই সে মোটা টাকা ঘরে আনে। তার অভিভাবক হলেন এক দাদা। তাঁর রোজগার কম। কাজেই ভগিনীর এই গোপন উপার্জনকে তিনি স্বারল্যের ছলনায় অনুমোদন না করে পারেন না। অপর একটি মেয়ে কোন স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং শিক্ষয়িত্রীদের মেসে থাকেন। মাঝে মাঝে দাদা, মামা, বা এই শ্রেণীর আত্মীয় নামধারী এক-একটি লোক এসে ছুটি-ছাটায় তাঁকে এখানে-সেখানে নিয়ে যায়। পরে জানা যায় যে তারা খরিদ্দার এবং তিনি তাদের সঙ্গে উদ্যান-সম্মেলনে মিলিত হয়ে অর্থাহরণ করেন। তাঁর

চাকরিটি যায়, কিন্তু স্বভাব যায়নি। তার কারণ দেশে মস্ত বড় একটি সংসার তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে। ধাত্রীকর্মে নিরত আর একটি তরুণীর প্রায়ই নানা মাড়োয়ারী পরিবার থেকে কল আসত এবং এই সব কল থেকে প্রচুর দক্ষিণাও তিনি ঘরে আনতেন। শেষে ছুরিকাহত অবস্থায় একদিন তাঁকে বাসায় ফিরে আসতে দেখে বোঝা গেল, কলটা তাঁর ধাত্রীকর্মের জন্যে আসত না। ইনি অল্পদিনের রোজগারেই কলকাতায় জমি কিনতে ও তার ওপর দো-তলা বাড়ী বতুলতে পেরেছেন। আর একটি তরুণী, তিনিও কলেজের ছাত্রী, কোন প্রসাধন ব্যবসায়ীদের এজেণ্ট রূপে বাড়ী-বাড়ী মেয়েদের কাছে নানা জিনিষ ক্যানভাস করতেন। একদা কোন উকিলের লাইব্রেরী ঘরে সেই বাড়ীর একটি অবিবাহিত যুবকের সঙ্গে গর্হিত আচরণে নিরত অবস্থায় ধৃত হন এবং তখনি জানা যায় যে তিনি আসলে ক্যানভাসার নন।

এই রকম আরো অনেক ঘটনা আছে, যা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের একাংশে গোপন বেশ্যাবৃত্তি বিস্তারের পরিচায়ক। বলা বাহুল্য, বাইরে এঁদের মান-সম্ভ্রম ও ভদ্রয়ানির চাকচিক্য বাঁচিয়ে চলতে হয়। অথচ আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে তা চলা এঁদের পক্ষে ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। কাজেই মোটা প্রাপ্তির লোভে এঁদের মেয়েদের বেশ বড় একটা দল তলায় তলায় অসৎ বৃত্তির অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে এবং ভালোমানুষী বা উদারতার ছলনায় অভিভাবকেরা তার পোষকতা করছেন। কোন-কোন ক্ষেত্রে তাঁরা অগ্রণী হয়েও মেয়েদের এই পথে এগিয়ে দেন বা দিচ্ছেন, এমন ঘটনাও হাতে পড়েছে। চাকুরির আশায় ভগিনীকে কোন ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে দেওয়া, বাড়ীভাড়া এড়ানোর জন্যে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কোন মেয়ের অন্তরঙ্গতা বাড়তে দেওয়া, ব্যবসায়ের খাতিরে কন্যার সঙ্গে কোন যুবককে পরিচিত করিয়ে দেওয়া ইত্যাদিকে এই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সহুরে মধ্যবিত্ত সমাজের বহু স্ত্রী-পুরুষকে আজ এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত রূপে চিহ্নিত করা যায়।

সহুরে মধ্যবিত্ত সমাজে শিক্ষিতা কুমারীদের মধ্যে ইদানীং চাকুরি করার রেওয়াজ হয়েছে। অর্থনীতিক সঙ্কটের কারণে তা অনেকটা অনিবার্যও হয়ে পড়েছে। এই সুযোগে পদোন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে বা চাকুরি চ্যুতির ভয় দেখিয়ে, মৎলবী ওপরওয়ালাদের কতকাংশ তরুণী মেয়েদের পাপের

পথে টানছে এবং পয়সার লোভে ও যৌন কামনার তাড়নায় মেয়েরাও স্বেচ্ছায় সেই স্রোতে গা ভাসাচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত অল্প পাওয়া যাবে না। রাজনীতি বা সমাজ-সংস্কার মূলক আন্দোলনে প্রবিষ্ট মেয়েদের কতকাংশকেও তলায় তলায় মন্দ লোকেরা বিপথগামিনী করছে এবং তারাও বাইরে একটা কোন চোখ-ধাঁধানো সার্টিফিকেট লাগিয়ে, ভেতরে ভেতরে দুষ্কৃতির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় অবশ্য নিছক স্ফূর্তির জন্যে বা নিতান্তই আধুনিকতা-সম্মত সংস্কার-বর্জনের নামে মেয়েরা গোপনে একে-তাকে দেহদান করে এবং সেজন্যে কোন দস্তরী নেয় না। কিন্তু তার চেয়ে দেহ-দানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া এবং কৌশলে ব্যবসা জমিয়ে তোলার দৃষ্টান্তই বেশী পাওয়া যায়। সহুরে সমৃদ্ধদের একাংশে ইদানীং আর একটা রোগ প্রবল হয়েছে। মহিলা দালাল লাগিয়ে, কৌশলে মোটা টাকার জাল ফেলে গৃহস্থ মেয়ে ধরা এবং তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা অনেক দুর্বৃত্তের একটা নিয়মিত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু মেয়ে না জেনে, উঁচু সমাজে মিশছি মনে করে এই জালে ধরা পড়ে, তারপর জানলেও আর বেরিয়ে আসতে পারে না। এক হাত থেকে অন্য হাতে, সেখান থেকে আবার এক হাতে গড়াতে গড়াতে তারা চলে। কথা-বার্তা চলন-বলন ও সাজ-সজ্জার চটকে, সেই সঙ্গে জন্ম-নিয়ন্ত্রকের সাহায্যে এই অন্তঃপ্রবাহী বেশ্যা বৃত্তি চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা হয়, আর ভদ্র পরিবারের স্বাভাবিক সম্মানে হস্তক্ষেপ অনুচিত বলে, কেউ এই গোপন পাপের বাসায় খোঁচাও দেয় না। কিন্তু জিনিষটার ব্যাপ্তি নিতান্ত ছোট গণ্ডীর মধ্যে নয়, এটা বোঝার সময় এসেছে।

আমি শুধু অবিবাহিতা তরুণীদের কথাই বলছি না। সাজ-সজ্জাপরায়ণ বিধবা এবং ব্যবহারদক্ষ বিবাহিতাদের মধ্যেও এই ব্যাধির প্রসার হয়েছে। দৈহিক দুষ্ক্রিয়ার সাহায্যে আর্থিক অস্বাচ্ছল্য নিবারণের কদর্য অভ্যাসে আত্ম-সমর্পণ করতে তাঁদেরও দেখা যাচ্ছে। কোন বিবাহিতা তরুণী তাঁর স্বামীর এক অবিবাহিত বন্ধুর সঙ্গে একদা দেশভ্রমণে বের হন এবং দীর্ঘ তিন মাস পরে বাড়ী ফিরে আসেন। এই অবিবাহিত বন্ধুটি বড় কারবারী এবং কারবারে তরুণীর স্বামীকে একটা লাভজনক অংশ দান করেছেন, শুধু তাঁর পত্নীর অন্তরঙ্গ-তার খাতিরে। এঁর একটি সন্তান আছে, তার সঙ্গে উক্ত বন্ধুর আকৃতিগত সাদৃশ্য যেমন লক্ষণীয়, তাঁর সঙ্গে মিল করে তার নাম রাখাটাও তেমনি লক্ষণীয়। আর এক ভদ্রমহিলা দুইটি শিশু-সন্তান সহ এক পদস্থ ব্যক্তির দ্বারে

উপনীত হন, তাঁর স্বামীর পদোন্নতি করে দেবার জন্যে আবেদন জানাতে। এরপরই তাঁর স্বামীর ধাপে-ধাপে পদোন্নতি হতে লাগল এবং কাকাবাবু সুবাদে ঐ পদস্থ ব্যক্তিটি ঘন-ঘন তাঁদের বাড়ী আসতে আরম্ভ করলেন। সময় সময় তিন-চার দিনের জন্যে মহিলাটি স্বামীর ঘাড়ে সংসার এবং ছেলে-পুলে রেখে, কাকাবাবুর সঙ্গে তীর্থ-দর্শনে যেতে লাগলেন। অবশেষে ব্যাপারটা আর গোপনীয়তার ভেতর রইল না।

এক বিধবা তরুণী তাঁর দাদার বন্ধুর সঙ্গে মাঝে-মাঝে রাজনীতি ও ধর্ম প্রসঙ্গ নিয়ে সর্বসমক্ষে আলোচনা করতেন। ক্রমে তিনিও দাদা হয়ে উঠলেন এবং উভয় পক্ষের ভেতর আনাগোনা ও মেলামেশা ঘনিষ্ঠ হল। শেষে মেয়েটি শিল্প-কর্ম ও ধাত্রী-বিদ্যা শেখার নাম করে ঘর-বাড়ী ছেড়ে একটি মেসে গিয়ে থাকতে আরম্ভ করলেন এবং তাঁর দেখাশুনার ভার নিলেন দাদার বন্ধু। দাদা ইতিমধ্যে বন্ধুটির অর্থানুকূল্যে একটি লাভজনক ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। আর একটি বিধবা তরুণী তাঁর ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন দুপুরে ইতস্তত বেরতেন। বাইরে তাঁদের উপার্জনের কোন লক্ষণীয় প্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু বাড়ীর চাল-চলনটা ছিল রীতিমতো চমকপ্রদ। অনুসন্ধানে জানা গেল, ছোট বোনটিকে দিয়ে অর্থোপার্জন করিয়ে বিধবা দিদি এই ভাবে সংসারে শ্রীবৃদ্ধি করছেন। কোন-না-কোন হোটেলে বা আড্ডায় নিয়ে গিয়ে তাকে তিনি নির্দিষ্ট লোকদের সঙ্গে পরিচিত করাতেন। অবশেষে মেয়েটি একদিন সেই সব লোকের কোন একজনের সঙ্গে পলায়ন করে তাঁর সাধে বাদ সাধল।

মধ্যবিত্ত পরিবারে আর্থিক অনটনের জন্যে ইদানীং অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে হয় না। ছেলেরাও উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করতে চায় না। অথচ প্রাকৃতিক ভাবে যৌবন তাদের যথাসময়েই আসে এবং বয়োধর্মে আসঙ্গ লিপ্সাও প্রবল হয়। এদিকে স্কুল-কলেজ, অফিস, সভা-সমিতি, পার্টি, ক্লাব, এ-সবে অবিবাহিত ছেলে-মেয়ের মেলামেশার ইদানীং প্রভূত সুযোগ হয়েছে এবং যুগধর্মে এটাকে আমরা ভালো বলে গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত হয়েছি। এই সব ছেলে-মেয়ের মধ্যে সহজেই প্রেম হয়। কন্যাদায়-প্রপীড়িত অভিভাবক এই ভাবে মেয়ের একটা হিল্লে হয়ে যাবে মনে করে, অনেক সময় নিঃশব্দে এটা অনুমোদন করেন। তাছাড়া উপহার ও উপঢৌকনের নামে মেয়ে নিত্য যে-সব বস্তু বাগিয়ে আনতে থাকে, তার প্রতি তাঁদের একটা

লালসাও থাকতে দেখা যায়। কিন্তু প্রেমে-পড়া অব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে সম্ভব হলেও, বিবাহের দ্বারা সেই প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কাজেই শেষ পর্যন্ত সৌখীন প্রেমিক অনেকেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং মেয়েটিকে আবার ধরতে হয় নূতন একটি প্রেমিক। এই ভাবে চলতে চলতেই হয়ত একদিন তার বিয়ে হয়ে যায়। অনেক সময় অবশ্য বিবাহের পরও বহু-প্রেমিকতার অভ্যাস থাকতে দেখেছি কোন-কোন মেয়ের। বোধহয় বাস্তব প্রয়োজনেই তাদের এই ভাবে ঘোমটার আড়ালে দাঁড়িয়ে অর্থাহরণ করতে হয়। কিংবা দুষ্ট অভ্যাস তাদের এই পথে পুনারাকর্ষণ করে! কারণটা যাই হক, ইদানীং বহু পরিবারেই গোপন পাতিত্য যে বেশ প্রসার লাভ করছে, এটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা। সমাজ-পর্যায়ের উঁচুতলায় মিশ্র-ক্লাব ও পার্টির অজুহাতে বিবাহিত নর-নারী পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেও কি ভাবে অবাধ দেহচর্চা করে এবং হীরার নেকলেস ও জড়োয়া গহনার দৌলতে এই প্রেমিকতার খেলা কতখানি নিঃশব্দে নির্বাহিত হয়, তা-ও নিশ্চয় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের অজানা নয়।)

অকুলীন যুবকী-সমাজের দিকে তাকালেও দেখতে পাই একই ব্যাপার। প্রধানত দারিদ্র্যের জন্যেই তারা একে-তাকে সঙ্গ দান করে দস্তুরী নেয়। ক্রমে সেটাই ব্যবসায়ে পরিণত হয়। কয়েকটি স্বীকারোক্তি নিয়ে এখানে আলোচনা করছি। এক কৈবর্ত-চাষী অন্ন-সমস্যায় বিব্রত হয়ে স্ত্রী ও দুটি নাবালক ছেলে-মেয়ে নিয়ে কলকাতায় আসে। এখানে একটি কারখানায় সে মিস্ত্রীর কাজ করতে থাকে। কিন্তু তাতে দিন চলা যখন কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে কারখানার মালিককে তুষ্ট করার জন্যে স্ত্রীকে তাঁর কাছে পাঠায়। তিনিও সেই স্বাস্থ্যবতী গ্রাম্য বধূকে সুকৌশলে হস্তগত করে, তার স্বামীর বেতন বৃদ্ধি করে দেন। এই ভাবেই চলতে থাকে। তারপর মালিকের মৃত্যু হলে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার গদী দখল করলেন। তিনিও পিতৃ-পরিত্যক্ত বধূটিকে অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করলেন না। একটু ব্যতিক্রম হল, নূতন মালিক ইয়ার-বন্ধুদের ভেতর তাঁর প্রণয়িণীকে মাঝে মাঝে পরিবেষণ করে দিতে লাগলেন, যা আগের বাবু কোনদিন করেন নি।* আর একটি নাপিত তরুণী অল্প বয়সে বিধবা হয়ে, একটি বছর সাতেকের মেয়ে নিয়ে পেটের দায়ে সহরে আসে। এখানে এক বাড়ীতে সে ঝি-গিরি করতে থাকে এবং তারি সঙ্গে বাড়ীর একটি যুবকের সঙ্গে গোপন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে আরো

কিছু উদ্বৃত্ত আয়ত্ত আয় করতে থাকে। এই ভাবে তার আর একটি মেয়ে হয়। তারপরে সে যায় এক হোটেলে এবং হোটেলওয়ালার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে আরম্ভ করে। হোটেলওয়ালাও তাকে আর একটি সন্তানের অধিকারিণী করে। সর্বশেষে সে যুক্ত হয় এক টিনের মিস্ত্রীর সঙ্গে। মিস্ত্রী তার তেরো বৎসর বয়স্কা মেয়েটিকে প্রলুব্ধ করে একদিন নিয়ে চম্পট দিল। তারপর থেকেই স্ত্রীলোকটি ঘৃণ্য বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে, পান বেচা সুরু করেছে।

আর একটি গোয়ালাদের কিশোরী মেয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়ী ছেলে রাখত। তার দিদি করত সেই বাড়ীতে চাকরাণী-গিরি। এক-এক দিন দুপুরে বাড়ীর একটি ছেলে লুকিয়ে তাদের বস্তিতে তার দিদির কাছে আসত এবং অনেক ক্ষণ থাকত। সে সময় তাকে বাইরে যেতে বলা হত। ক্রমে ছেলেটি তার কাছেও কু-প্রস্তাব করতে আরম্ভ করল এবং দিদিও তাকে সম্মত হবার জন্যে নিয়মিত চাপ দিতে লাগল। অবশেষে ভালো জামা-কাপড়, সোনার চুড়ি ও নগদ টাকার প্রলোভনে এবং কতকটা চাপে পড়ে মেয়েটি সম্মত হল। তখন তার বয়স তেরো-চোদ্দ। অল্পদিনেই সে সন্তান-সম্ভবা হল। তার ফলে বাবুদের বাড়ীতে আর তার স্থান হল না। তখন দিদি তাকে নিয়ে আর এক জায়গায় উঠে গেল এবং তার সন্তানটিকে নিজের সন্তান বলে চালাতে লাগল। ইতিমধ্যে এক দর্জির সঙ্গে দিদির ভাব হল এবং দুই ভগিনীতেই আবার তার সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করল। এই লোকটির পরিচয়-সূত্রে আরো দু-একটা লোক মাঝে মাঝে লুকিয়ে তাদের ঘরে আসত যেত। দিদি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অনিচ্ছুক না হলেও, মেয়েটির কিন্তু রাজী হতে দেরী লেগেছিল। সে ঠিক পেশাদার পতিতা হওয়া পছন্দ করেনি। অবশেষে এদেরই এক জনের পাল্লায় পড়ে সে ঘর ছেড়ে পালায়।

একে একে তিনটি সন্তান হবার পর সে আবার এসে দিদির সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়। ইতিমধ্যে সে বেশ দু-পয়সা হাতে করে নিয়েছে। দুই বোনে তখন নূতন এক মক্কেল ধরল এবং তার রক্ষণে থেকে একটি মুড়ি-মুড়কির দোকান ফাঁদল। লোকে তাদের দুই বোন এবং সতীন বলে জানে। খুব লুকিয়ে ছোট বোন এখনো এক-আধ জন বন্ধু জোটায় এবং দিদি তাতে পোষকতা করে। সে নিজে আর এখন ও-পথে পা দেয় না।

আর একটি ভুঁইমালীদের বৌ, বয়স তার বছর-ত্রিশ হবে, বছর-আঠারো বয়সের একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সহরে আসে। বলে তার বোনপো।

ছেলেটি ইতস্তত চানাচুর, গুলি সুতো, সিঁদুর ও তরল-আলতা ফেরী করত এবং সেই অবসরে এক-আধ জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে, তাদের বাড়ী নিয়ে আসত। বলাই বাহুল্য, মাসী তাদের আয়ত্ত করত সহজেই। এই ভাবে বছর দুইয়ের ভেতর ওরা বেশ গুছিয়ে নিল। ছেলেটি একটা বিড়ির দোকান ফেঁদে বসল এবং মাসীর দৌলতে দোকান তার ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে লাগল। অবশেষে জানা গেল যে মাসী তার মাসী নয়, গ্রামের চেনা লোক। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সে শহরে ভাগ্য ফেরাতে।

পারিবারিক ব্যভিচারের তাড়নায় গৃহ-পলাতকেরাও সহরে এসে, অনেক সময় অলি-গলি ও বস্তি-অঞ্চলে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে নিজেদের স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচিত করে। ত্রিশ বছরের নারীর বিশ বছরের স্বামী এবং পঞ্চাশ বছরের স্বামীর চোদ্দ বছরের স্ত্রী তাই এ সমাজে হামেশাই থাকতে দেখা যায়। অনুসন্ধানে দেখেছি, এদের মধ্যে দেওর-ভাজ, শালী-ভগিনীপতি, খুড়ী-ভাশুরপো, মাসী-বোনপো, মামা-ভাগ্নী, মামী-ভাগ্নে, এমন কি, খুড়তুত, জেঠতুত, বা মাসতুত এবং মামাতুত-পিসতুত ভাই-বোন পর্যন্ত আছে। আর একটা জিনিষ এই সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে এরা বাইরে যতটা সম্ভব গার্হস্থ্য পরিচয় বজায় রাখতে চেষ্টা করলেও, ভেতরে ভেতরে বহুগামিতার সমর্থক এবং বাড়ীর অভিভাবকেরাই এদের উৎসাহদাতা।

অবশ্য এই অভিভাবকতার ইতিহাসও যে অনেক সময় খুব রহস্যাচ্ছন্ন, এ কথা এই সূত্রে বলে রাখা দরকার। একটি বুড়ো ভুজাওয়ালা একদা এক বিধবাকে নিয়ে এসে পাড়ায় বলল, তার মেয়ে। মেয়েও তাকে বাবা বলে ডাকতে লাগল। ক্রমে জুটল মেয়ের একটি বন্ধু, এক ফলওয়ালা মুসলমান যুবক। অবশেষে এই যুবকে ও বৃদ্ধে একদিন মারামারি এবং দ্বন্দ্বের মুখে প্রকাশ পেল যে স্ত্রীলোকটি বুড়োর মেয়ে নয়, গঙ্গাসাগর থেকে সংগ্রহ করে আনা একটি মেয়েমানুষ। বুড়ো তাকে ছেড়ে দিতে রাজী। শুধু দস্তুরী হিসাবে তাকে কুড়িটা টাকা দিতে হবে, যেহেতু ঐ পরিমাণ টাকা খরচ করে সে তাকে জোগাড় করেছে। কুড়িটি টাকা তৎক্ষণাৎ ফেলে দিয়ে ফলওয়ালা তাকে নিয়ে গেল। কিছু কাল পরে টালিগঞ্জে এক মুসলমান দোকানীর পত্নীরূপে এই মেয়েটিকে টিউবওয়েল থেকে জল তুলতে দেখি।

আর একটি বছর এগারো-বারো বয়সের মেয়েকে একদিন চুলের ঝুঁটি

ধরে প্রহারনিরত এক বৃদ্ধকে পথে দাঁড়িয়ে তর্জন-গর্জন করতে দেখি। জিজ্ঞাসায় জানতে পারি, মেয়েটি বুড়োর কন্যা। কি অন্যায় করার জন্য তাকে মারা হচ্ছে। বুড়ো তাকে রাস্তায় বের করে দিয়ে বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিল। প্রভূত পরিমাণ জেরা ও জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল যে বুড়ো তার বাবা নয়, তার জননীর উপ-পতি। মা তাকে কোলে নিয়ে ওর সঙ্গে চলে এসেছিল স্বামী ও সংসার ছেড়ে। এখন মেয়ে বড় হয়েছে, মা চায় তার বিয়ে দিয়ে দিতে। কিন্তু বুড়ো চায় তাকে দিয়ে ব্যবসা করাতে। রোজ লোক নিয়ে আসে। এখনো একটা লোক এসেছে। তার ঘরে যেতে চায়নি বলেই মারছে। মেয়েটির মা চায় না যে ঐ লোকটির সঙ্গে সে সম্পর্ক স্থাপন করে, যেহেতু মা নিজেই বুড়োকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে কিছুদিন তার সঙ্গে মেলামেশা করেছে। মেয়েটিকে আর এক দিন দেখলাম। সাজ-সজ্জা বদল হয়েছে। সেই লোকটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে বলেও শুনলাম। সেই সঙ্গেই শুনলাম, স্বামীর এক বড়লোক মুরুব্বির কৃপাদৃষ্টিতে ওদের অবস্থা নাকি রাতারাতি ফিরতে সুরু করেছে।

আর একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করব। দুটি মাঝ-বয়সী স্ত্রীলোক একটি নাবালক ছেলে নিয়ে থাকত। দু-জনেই ঝি-গিরি করত এবং খৈ-মুড়ি ভাজা, ঘুঁটে দেওয়া, এ-সব করে আরো দু-পয়সা রোজগার করত। বাইরে সবাই জানত, ওরা দুই বোন। মাঝে মাঝে হাফ-প্যাণ্ট পরা মিস্ত্রী গোছের একটি ছোকরা আসত। ওরা বলত ওদের ভাই। কিন্তু একদিন কি নিয়ে বিষম ঝগড়া-ঝাঁটি বাধল এবং তাতে প্রকাশ পেল যে ছোকরাটি মুসলমান, আর স্ত্রীলোকে দুটি হিন্দু। ওরা দুই বোনও নয়, এক গ্রামের মেয়ে। একটি কুমোরের মেয়ে, অন্যটি মালোর মেয়ে। দু-জনেই বিধবা এবং দু-জনেই ঘর-বাড়ী ছেড়ে সহরে এসেছে রোজগারের ধান্দায়। ছোকরাটির সঙ্গে ওদের ভাব হয় পথে এবং সে-ভাব বছর তিনেক স্থায়ী হয়। তার ফলে দু-জনের দুটি সন্তান হয়। এক জনেরটি মারা গেছে, অন্যেরটি জীবিত। ছোকরা ওদের ছেড়ে গেছে, শুধু দু-জনকে প্রতিপালন করতে অক্ষম বলে। তাছাড়া বয়সে অনেক বড়, ওদের তার বেশী দিন ভালোই বা লাগবে কেন? সে সম্প্রতি আর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গ নিয়েছে এবং তাই নিয়েই ঝগড়া। ছেলের মা ছেলের খোর-পোষ চায়। ছোকরা তা দিতে অনিচ্ছুক। সে বলে, সন্তান তার নয়, যেহেতু স্ত্রীলোকটি একনিষ্ঠা নয়!

ভদ্র-অভদ্র দুই সমাজের গুপ্ত পতিতাদের কথাই বললাম। বলা বাহুল্য আমাদের আশে-পাশে, ওপরে-নীচে, সর্বদা এরা আনাগোনা ও ঘোরাফেরা করছে, অথচ আমরা খবর রাখি না বলে, তাদের চিনতে বা বুঝতে পারি না। বিশেষ করে নীচুতলার গুপ্ত পতিতাদের আমরা বিশ্বাস করি। গৃহ-পরিবারের ভেতর গ্রহণ করি, পাচিকা ও পরিচারিকা রূপে স্থান দিই, আমাদের নাবালক ছেলে-মেয়ে ও ঘর-সংসারের ভার তাদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

এই অজ্ঞতার ফলে যে কত বিপদ ও কত বিশ্রী রকমের বিপর্যয় ঘটে, তা আমরা অনেক সময় ঠেকে শিখি। কিন্তু আগে থেকে সাবধান হতে পারি না, শুধু সব ব্যাপার তলিয়ে জানি না, বা বুঝি না বলেই। এই বোঝানোর কাজে আশা করি বর্তমান তথ্যগুলি সহায়তা করবে। তাছাড়া সমাজ-হিতকামীদের পক্ষে সমাজের অন্তর্লগ্ন বাস্তব অবস্থাটা কি এবং তার কারণটাই বা কি, তা বোঝাও হয়ত এতে কিছুটা সহজ হবে। যে-যে কারণে সমাজ-সৌধের উঁচুতলা ও নীচুতলায় একই সঙ্গে পতিত্য ও অধঃপতন এমন সর্বগ্রাসী অক্টোপাসের মতো থাবা বিস্তার করছে, তা দূর করেই সমাজ থেকে এই ভয়াবহ ব্যাধি বিতাড়িত করতে হবে। নইলে গোপন গণিকাবৃত্তির চোরা আক্রমণে সমগ্র মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র-সমাজই অদূর ভবিষ্যতে কোন এক দিন ধ্বসে পড়বে। মনে রাখতে হবে, মান-সম্ভ্রম ও গার্হস্থ্য সংস্কারসম্পন্ন লোকেরাই অবস্থা-বিপর্যয়ে এই পথে এসে পড়েছে এবং অনন্যোপায় হয়ে এই পথ আঁকড়ে পড়ে থাকলেও, ভেতরে ভেতরে সর্বদাই তারা সংস্কার ও সংস্থানের দ্বন্দ্বে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। যারা এই সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারে, তারা কোন দিন হয়ত এই জীবন থেকে প্রাণপণ চেষ্টায় বেরিয়ে আসে। নয়ত গোপনতার আড়াল ভেঙে প্রকাশ্য পতিতার জীবন স্বাগত করে নেয়। কিন্তু দুটোই সংখ্যায় কম এবং দেশের সামাজিক সংস্কৃতি ও অর্থনীতিক ব্যবস্থাপনাই সে জন্যে দায়ী।

গুপ্ত পতিতাদের সাধারণ পরিচিতিতেই এ আলোচনা সীমাবদ্ধ রইল। তাদের ভেতর কত রকম অনাচার-বিকৃতাচার প্রচলিত আছে, তার প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে যে নাবালক-নাবালিকার বড় একটা দল যেমন পেশাদার পতিতালয়ে দেখা যায়, তেমনি সমাজ-জীবনেও অর্থের বিনিময়ে অপকার্যে নিয়োজিত হতে অভ্যস্ত ছদ্মবেশী বালক এবং বালিকাদের অনেক দল দেখা যায়। দেবমন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দশ, এগারো, বারো বছরের

'কুমারী'রা এবং পার্ক, ময়দান ও ঘোড় দৌড়ের মাঠে বিচরণকারী অনুরূপ বয়সী মাসাজ-কারী বা জুতা পালিস-কারী ছেলেরা আসলে জীবিকার্থী পাপ ব্যবসায়ী ভিন্ন কিছু নয়। সামান্য কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এরা অনায়াসে দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে ইতস্তত চলে যায় এবং তাদের যে-কোন প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যা পারে বখশিস আদায় করে নেয়। অনুসন্ধানে দেখেছি, এরা অনেকেই গৃহস্থ ঘরের ছেলে-মেয়ে। দু-এক জন স্কুলেও পড়ে। এরা যে এই ভাবে পয়সা রোজগার করে আনে, অনেক সময় এটা অভিভাবকরা টের পান, তবু সাংসারিক প্রয়োজনের মুখ চেয়ে তাঁরা কিছু বলেন না। বরং সময়-সময় পরোক্ষে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। এমন কি, আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে নাবালক-দের দিয়ে ভিক্ষার নামে দুষ্কৃতি করিয়ে পয়সা কামানোর একাধিক ঘটনাও সংগৃহীত হয়েছে, যার কথা আপাতত আর উল্লেখ করা হল না।

দশম অধ্যায়

স্বাধীন পতিতা

বাড়ীওয়ালীর শাসনাধীনে থেকে যারা অন্ন-বস্ত্রের বিনিময়ে গণিকা-বৃত্তি করে, অথবা সমাজ-জীবনের অন্তর্ভূক্ত থেকে গোপনে গোপনে এই বৃত্তির আশ্রয়ে রোজগার করে, তাদের কথা ইতিপূর্বে বলেছি। পেশাদার পতিতা বলতে প্রধানত এদেরই বোঝায়। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি সম্প্রদায় আছে, তারা হল স্বাধীন বেশ্যাসমাজ। এরা বাড়ীওয়ালীর বা তার তাঁবেদার গুণ্ডার খবর্দারীর ধার ধারে না। সমাজ-জীবনের বাইরে বাসা বেঁধে এরা আপন খুসী মতো ব্যবসা চালায় এবং আপন উপার্জনের অর্থ যথেচ্ছ ভোগ করে। ইচ্ছামতো দান-ধ্যানও করে।

এদের ভেতর যাদের রূপ-যৌবন আছে, কিছু লেখা-পড়া ও গান-বাজনার-নৈপুণ্য আছে, তাদের বাজার-দর বেশী। বড় বড় মক্কেল শিকার করে তারা মোটা টাকা কামায় এবং ঝি-চাকর, পাচক, ড্রাইভার, পাতানো ছেলে-মেয়ে অনেক কিছু নিয়ে দিব্যি সংসার পেতে বাস করে। এদের চলন-বলন, ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, কোনটাই চলতি বাজারের পাতি পতিতার মতো নয়। গণিকা সমাজের এরাই হল মুকুটমণি স্বরূপ। হীরা, জহরৎ, চুনি-পান্না ও সোনা-দানার প্রাচুর্যে, বাড়ী, গাড়ী ও লোক-লস্করের ঐশ্বর্যে, এরা এক-একটা রাজরাণীর প্রতিদ্বন্দ্বী হবার ক্ষমতা রাখে। অথচ যেটুকু বিধি-বিধান ও আইন-কানুন রাণীকেও মেনে চলতে হয়, এদের সেটুকুরও বালাই নেই। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় এরা তাই তথাকথিত রাণীরও ঈর্ষার পাত্রী।

এরা অনেকে থিয়েটারে বায়স্কোপে অভিনয় করে। পেশাদার বাইজী, খেমটা বা ঢপওয়ালী রূপে ধনীলোকের উৎসব-আমোদে মুজরা দেয়। অনেকে সৌখীন সমাজের বাগান-পার্টি, ষ্টিমার-পার্টি, শিকার, টুর্ণামেণ্ট, ও হাইকিং-এ বাবু ও তাঁর বন্ধু-গোষ্ঠীর সহযাত্রিনী হয়। এ-সব থেকে এদের মোটা রকমের আয় হয়। আর এই সুযোগে এই সব উৎসব ও আদান-প্রদানে যে-সমস্ত বখা বড়লোকের সঙ্গে এদের ভাব-আলাপ হয়, তারাই গুণমুগ্ধ ভক্তরূপে এদের দরজায় এসে ভীড় জমায়। কে কত বেশী বড়মানুষী দেখিয়ে পাঁচ জনের মুখ থেকে ছোঁ মেরে একজনকে টেনে নিতে-পারে, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি ও মারামারি করে মরে। এদের মক্কেলদের ভেতর গরীবের ত

নয়ই, স্বচ্ছল মধ্যবিত্তেরও স্থান নেই। রাজা, জমিদার. ধনী ব্যবসায়ী, বিখ্যাত অভিনেতা, বিশিষ্ট লোকনেতা, এঁরাই এদের চরণে লাখ-লাখ টাকা ঢেলে এদের প্রসাদ অর্জন করে থাকেন।

রূপের জন্যই হক, আর দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নাতেই হক, আর চ'তি বাজারের খ্যাতির আকর্ষণেই হক, সমাজের মাথা-শ্রেণীর লোকেরা এদের হাতে মাথা বিকিয়ে দেন। দরাজ হাতে টাকা ঢেলে এদের ভাগ্য ও ভোগের পরিসর স্ফীত করেন। কিন্তু খুব কম ভাগ্যবানই শেষ পর্যন্ত এদের মনের নাগাল পান। দেহের পসরা মেলে ধরে, কৃত্রিম ভালোবাসার ফাঁদ পেতে, এরা তাঁদের আয়ত্ত করে, তারপর চতুর হস্তে তাঁদের দোহন করতে থাকে। দোহন কার্য যখন শেষ হয়, যখন আর বিশেষ কিছু পাবার প্রত্যাশা থাকে না, তখন একদিনের প্রেমিককে আর একদিন পদাঘাতে খেদিয়ে দিয়ে নতুন প্রেমিক জুটিয়ে নেয় নিতে এদের মোটেই বাধে না। বহু সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সব মায়াবিনীর খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তবু একের পর আর একজন এদের দুয়ারে এসে হাজির হয়েছেন। একের দৃষ্টান্ত অন্যের চৈতন্য উদ্রেকে সহায়তা করেনি।

এই সব রূপোপজীবিনী শুধু টাকা চেনে। প্রেম, ভালোবাসা, আত্ম-সমর্পণ, কোন কিছুর বালাই এদের নেই। কিছু দিন বা অল্পদিন যে একজনকে এরা দেহে ধরা দেয়, তার সঙ্গে প্রণয়ের অভিনয় করে, সে এদের ব্যবসায়ের ফিকির মাত্র। তার সঙ্গে মনের কোন সংস্রব নেই। এরা জানে, ভালোবাসলেই মুস্কিল! তাহলে সেই সুযোগেই একদিনের ইয়ার চিরদিনের মনিব সেজে বসবে এবং দু-হাতে পয়সা লোঠার পথও যাবে বন্ধ হয়ে। কাজেই যথাশক্তি চেষ্টা করেই এরা ভালোবাসা নামক দুর্বলতা থেকে দূরে থাকতে চায়। বহু অধ্যবসায়ী প্রেমিক তাঁদের যথাসর্বস্ব, এমন কি, পৈত্রিক ভিটে-মাটি পর্যন্ত উজাড় করে দিয়েছেন, এই সব ব্যবসায়ী প্রেমিকার হৃদয়-হরণের জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে স্বীকার করেছেন যে সমস্ত টাকাই তাঁদের জলে গেছে। আসলে খরিদ্দারকে এরা অর্থাকর্ষণের উপাদান মাত্র মনে করে, তার সম্পর্কে থাকে না এদের কোন উত্তাপ বা আগ্রহ। সেই জন্যেই এত সহজে এরা একটার পর একটা খরিদ্দার ধরে, আর বদল করে।

কখনো কখনো শাঁসালো খরিদ্দার হলে, অনেক দিন ধরে দোহনের মৎলবে এরা কেউ কেউ স্থায়ী রক্ষিতা হয়ে থাকতেও সম্মত হয় অবশ্য। বলাই

বাহুল্য তখন এরা খুচরো ব্যবসা বন্ধ করে দেয় এবং চালে-চলনে ও কাজে-কর্মে বাবুর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যেই সচেষ্ট হয়। বেয়াকুব চরিত্রহীনকে প্রতারিত করার এটাই হল সেরা অস্ত্র। যেখানে যা আছে, এনে তিনি ঐ পতিতার পাদ-পদ্মে উজাড় করতে লেগে যান। তারপর একদিন মোহভঙ্গ হয়, যখন তিনি জানতে পারেন যে অলক্ষিত সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে তাঁর অজান্তে কখন এক বা একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী এসে তাঁর জায়গা জুড়ে বসেছেন। এই সব অভিজাত রক্ষিতার একনিষ্ঠতা রক্ষার জন্য দারবান, সিপাই ও গোয়েন্দা নিয়োগের এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি ও মারামারি বাধানোর বহু ঘটনাই এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে!

এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন পরিবারের যুবক কোন বিশিষ্ট অভিনেত্রীকে রক্ষিতা রেখেছিলেন। এই পতিতার মনোরঞ্জনার্থে তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের আমলের বহু অমূল্য সম্পদ, সোনা-রূপোর বাসন, হীরা-জহরৎ, মণি-মাণিক্যের গহনা, হাজার হাজার টাকা দামের তৈল-চিত্র, তলোয়ার, খাট-পালঙ্ক অসঙ্কোচে তাকে উপঢৌকন দেন। কলকাতার ওপর তাঁকে একখানা বাড়ী কিনে দেন এবং সেই বাড়ীতে সরকার, গোমস্তা, সিপাই-সান্ত্রী ও খানসামা নিয়োগ করে রাতারাতি বাঁদীকে বেগমের স্তরে উন্নীত করে তোলেন।

তারপর অর্ধ-রাত্রে একদিন বন্দুকের আওয়াজ, আর্তনাদ ও হৈ-চৈ-এ এই রঙ্গ-নাট্যের ওপর যবনিকা পাত হল। কুমার বাহাদুরকে বোকা বানিয়ে তাঁর যথাসর্বস্বে আসর ও পসার জমিয়ে, ঐ স্ত্রীলোকটি আর একটি প্রেমিক আমদানি করেছিল। মদ্যপান জনিত অসতর্কতায় সেটা হঠাৎ ঐদিন হাতে-নাতে ধরা পড়ে যায়। জেরাব মুখে এই স্ত্রীলোকটি বলেছিল, 'আমি কি, তা জেনেই ত আমাকে রাখা হয়েছিল। পেশাদার পতিতার কাছে সতীত্ব দাবী করার কোন মানে হয় কি?' প্রসিদ্ধ পারুলবালা হত্যার কাহিনীও কতকটা এই। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের ঈর্ষা ও আক্রোশ শেষ পর্যন্ত এক-যোগে বন্দুকের গুলি রূপে পারুলের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিল। মৃত্যুশয্যায় পারুল বলেছিল, 'ভালো আমি কারুকেই বাসিনি। তবে আমাকে ওরা দু-জনেই ভালোবাসত। নবাগত প্রেমিকের প্ররোচনায় পুরানো প্রেমিককে বিষ দিয়ে হত্যা করা, ভালোবাসার ছলনায় ব্যক্তি বিশেষকে আয়ত্তে এনে, তারপর তাকে কোন বিরাট ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে দেওয়া, কিংবা ব্ল্যাক-মেল করে পথে বসানোর বহু প্রসিদ্ধ নজীর আমার সংগ্রহে আছে। এমন কি, পিতার

রক্ষিতা থাকতে থাকতে পুত্রের সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পরস্পরকে ঠকিয়ে, উভয়ের সঙ্গে একতালে ব্যভিচার করার গ্লানিকর ইতিহাসও আছে। পিতা-পুত্র দু-জনেই যখন ব্যাপারটা টের পান, তখন একে অন্যকে অপসারিত করার জন্যে এমন কোন দুষ্কর্ম নেই, যা করেননি। পিতা-পুত্রে একদিন দ্বৈরথ যুদ্ধ পর্যন্ত হয়েছিল, একটা অবান্তর সংসারিক কলহের ছুতো করে।

কিন্তু বাঁধা খরিদ্দার সম্পর্কে এই সব ব্যবসায়ী পতিতার ঔদাসীন্য যতই প্রবল হক, আসলে এরা কেউ কাম-শীতল বা সংযতেন্দ্রিয় নয়। অনুসন্ধানে দেখেছি, প্রাত্যহিক ব্যবসার আড়ালে এদের অনেকের একটা করে নিজস্ব জীবন আছে এবং সে-জীবনে শ্রী, শালীনতা, বা রুচির কোন সংস্রব নেই। অনেকের রকমারি কু-অভ্যাস আছে এবং সে জন্যে ভদ্রলোক অপেক্ষা তথাকথিত বাজে লোককে তারা বেশী পছন্দ করে। গীত-বাদ্যে পটীয়সী ব্যক্তির রক্ষিতা এক পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা বেশ্যার বিবরণে জানা যায়, তার একনিষ্ঠতা রক্ষার্থে নিয়োজিত বাবুর বিশ্বাসী নেপালী চাকরকে দিয়ে সে সর্বাঙ্গে তৈল বিলেপন করাত, তার পর একটি বাথ-টাবে নেমে স্নান করত এবং সেই ভৃত্য তার গাত্র-মার্জনা করে দিত। গা মোছানো, জামা-কাপড় পরানো ও প্রসাধন সম্পর্কীয় কাজগুলো ছিল তার নিত্যকর্মের অন্তর্গত।

বাবু এটা জানতে পেরে নেপালীকে অপসারিত করতে চান। স্ত্রীলোকটি তাতে অন্ন জল ত্যাগ করে। তখন নিরুপায় হয়ে বাবুকে সেই আপদ স্থায়ী ভাবে বরদাস্ত করে নিতে হয়। আর একটি অভিজাত পতিতা গঙ্গার ঘাট থেকে এক অনাথ বালককে কুড়িয়ে আনে। রক্ষিতার মাতৃ মহিমায় মুগ্ধ হয়ে বাবু এই সতেরো-আঠারো বছর বয়সের ছেলেটিকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করেন নি। কালক্রমে জানা গেল যে মাতৃ-সম্বোধনে অভ্যস্ত এই বালককে উচ্চ বখশিসে বশীভূত করে স্ত্রীলোকটি তাকে নানা কু-কাজে নিয়োজিত করে। হাতে-নাতে যেদিন ধরা পড়ল, সেদিন হট্টগোল ও ঠ্যাঙাঠেঙির একশেষ হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবুকেই পিছু হঠতে হল, ছেলেটি রয়ে গেল স্ত্রীলোকটির আশ্রয়ে।

ইংরেজী-নবীশ এক রক্ষিতাকে অন্য পুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্যে এক বয়স্ক বাবু তাকে গোটা কয়েক ধূর্ত চাকরাণী দিয়ে সর্বদা ঘিরে রাখতেন। অনন্যোপায় হয়ে এই পরিচারিকাদের এক জনকেই স্ত্রীলোকটি কু-কর্মের সহচরী করে নেয়। জিনিষটা পুরুষের পক্ষে ঈর্ষা-উদ্দীপক নয়

বলেই বোধ হয়, বাবু জানতে পেরেও আপত্তি করেননি। সেলাই-ফোঁড়াই ও আচার-সহবৎ শেখানোর জন্যে নিয়োজিত ফিরিঙ্গী গবর্ণেসের সঙ্গে বাঁধা পতিতার অনুচিত আচরণে নিরত হওয়ার একটি ঘটনা আমার সংগ্রহে আছে। এছাড়া রিকসাওয়ালা, চুড়ীওয়ালা, বা ধুনুরী ডাকিয়ে এনে, কুশ্রী ভাবে ব্যবহার করার ঘটনাও দু-চারটি আছে। মোটের ওপর এ-ই এদের সত্যকার স্বরূপ। বাইরে এরা নিত্য নূতন ধনী জোটায় ব্যবসার খাতিরে, আর ভেতরে ভেতরে করে ইতর জনের সাহচর্য,-যেহেতু তারা সুলভ ও সর্বতোভাবে আজ্ঞাবহ হয় তারাই।

কোন-কোন সময় দু-একটি অভিজাত পতিতা উচ্ছৃঙ্খল ও অসম্মানিত জীবনে ক্লান্ত হয়ে, হঠাৎ একদিন ঘর বাঁধতে চায়। সুবিধামতো বাবু হাতে এসে গেলে, তাঁকে নানা ভাবে আকৃষ্ট করে তখন তারা বিবাহের বাঁধনে বাঁধে। এই অবস্থায় এলে তারা যথাসম্ভব পর্দানশীন হয়ে থাকতে চায়। অনেকের ছেলে-পুলে হয় এবং প্রাণপণ চেষ্টায় কেউ-কেউ অতীতকে সমূলে ঝেড়ে ফেলতে এবং পুরোপুরি গৃহস্থ হতেও সমর্থ হয়। দু-তিনটি এই রকম এক কালীন পতিতাকে বধূ রূপে রূপান্তরিত হয়ে যথেষ্ট সুরুচি, শালীনতা ও সংস্বভাবের পরিচয় দিতে দেখেছি।

বাঁধা রক্ষিতাদের মধ্যেও সে-রকম মেয়ে থাকে না তা নয়। হয়ত উপযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ, সাহচর্য বা শিক্ষা পেলে, অনেকেরই পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু সে-রকম পুরুষ ত সাধারণত এদের কপালে জোটে না। তাই অনেকের ক্ষেত্রে গৃহস্থালীর নেশা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। কিছুদিন ভদ্রজীবন যাপনের পর আবার পুরানো পেশা মনের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠে। হয় অর্থলালসা, নয় পাপসক্তি, নয় দুই-ই, আবার তাদের পুরানো পথে টেনে নিয়ে যায়। স্বামীকে অথবা রক্ষককে বিতাড়িত করে, কিংবা ফাঁকি দিয়ে আবার নূতন বাবু ধরা সুরু হয়। এই শ্রেণীর গৃহস্থ-পতিতাদের মধ্যে যারা নিজেরা আর ব্যবসায় নামে না, তাদের মধ্যে আর একটি কু-অভ্যাস প্রবল হতে দেখা যায়। তারা গর্ভজাত মেয়েকে নিজেদের ব্যবসা ধরিয়ে দেয়। কেউ-কেউ চোরাই মেয়ে সংগ্রহ করে, অথবা অন্ন-বস্ত্র দিয়ে গরীব মেয়ে পুষে, তাকে দিয়েও এ-কাজ করায়। পতিতার গর্ভজাত কন্যাকে রীতিমতো সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করেও শেষপর্যন্ত অনেক ভদ্রলোক তাদের অধঃপাতে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। মাতার দুশ্চরিত্রতা যেন প্রতিহিংসা পরবশ হয়েই তাদের পাপের পথে ঠেলে দেয়।

বারো বৎসর বয়সী স্কুলে-পড়া মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জোর পূর্বক কোন ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া এবং মাতা কর্তৃক ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকে তর্জন-গর্জন সহকারে মেয়েকে প্রতিবাদ না করতে বলার একটি লোমহর্ষণ ঘটনা এক 'পতিতা'-বধূর গৃহে সঙ্ঘটিত হয়েছিল। এই ঘটনায় পনেরো বৎসরের সম্পর্ক ছিন্ন করে, উক্ত স্ত্রী-লোকের স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যান। একটি পনেরো-ষোল বছরের মেয়েকে এক যুবকের সঙ্গে অসৎ সম্পর্কে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করার এবং কালক্রমে মাতা-কন্যা উভয়ে সেই ব্যক্তির সঙ্গে অনুচিত সংসর্গে আবদ্ধ হবার আর একটি জঘন্য ঘটনাও অপর এক রক্ষিতা-পতিতার ঘর থেকে সংগ্রহ করা গেছে। উনিশ বৎসর বয়সে এই মেয়েটি বিষপানে আপন ধিকৃত জীবনের অবসান করে। যত দূর জানি, সে আই-এ-পর্যন্ত পড়েছিল। চমৎকার গাইতে ও কবিতা লিখতে পারত। পতিতার গর্ভজাত আর একটি সতেরো-আঠারো বছর বয়স্ক ছেলের আত্ম-হত্যার বিবরণ আমার সংগ্রহে আছে। তার ঘৃণিত জীবনের উদ্ভব ও অবসানের ইতিহাস আনুপূর্বিক বিবৃত করে মৃত্যুর পূর্বে এক সহপাঠীকে সে যে চিঠি লিখেছিল, তার শেষাংশ উল্লেখের অনুপযুক্ত। প্রথমাংশে জানা যায় যে পতিতারূপে পরিচিতা হলেও, তার মাতা কোন দেশমান্য ব্যক্তির দৌহিত্রী এবং তার পিতাও কোন বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিতের পুত্র।

পতিতা-মাতার আওতা থেকে আত্ম-রক্ষার জন্যে পলায়িতা এবং কোন ভদ্রব্যক্তির সঙ্গে বিবাহিতা আর এক শিক্ষিতা মহিলা তাঁর আত্ম-কাহিনীতে অতি অল্পবয়সেই তাঁর মাতা কি ভাবে দু-এক জনের সঙ্গে তাঁকে ঘরে আটক করে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিতেন, তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এই সময় দৈহিক সাবালকতা আনার জন্যে তাঁর দেহে সিক্ত সোলা প্রয়োগ ও অন্যান্য যে-সব নির্যাতন চলেছে এবং জননীর নিয়োজিত চ্যাংড়ারা যে-ভাবে তাঁর কুমারী জীবনের পবিত্রতা নষ্ট করেছে, তা তিনি এই কাহিনীতে বিবৃত করেছেন। তাঁর স্বামীকে তিনি এই অধঃপতনের কুণ্ড থেকেই পেয়েছিলেন, যখন তাঁর বয়স পনেরো-ষোল। ওখান থেকে দু-জনে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করেন। বিবাহিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এই মহিলাটি তাঁর মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে বলেছেন, তাঁর মা একজন পেশাদার নর্তকী ছিলেন। বহু ব্যক্তির হাত-ফেরতা হয়ে অবশেষে তিনি এক জমিদারের সংশ্রবে আসেন এবং তাঁর রক্ষিত রূপে ঘর বেঁধে বাইরের ব্যবসা

বর্জন করেন। যখন তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, দুই মেয়ে ও এক ছেলে বড় হয়েছে, তখন আবার পিতার অগোচরে তিনি মাঝে মাঝে বাড়ীতে অপরিচিত যুবকদের নিয়ে আসতে স্থরু করেন। এদেরই কৃপায় প্রথমে তিনি, তারপর তাঁর ছোট বোন অধঃপতিত হন। বোনটি এখনো ঘৃণ্য জীবনই যাপন করছে। ভাইটি পড়েছে ভ্রাম্যমান চোরের দলে। এঁর পিতৃনাম অনুন্ধান করে পাওয়া যায় নি। মহিলাটি বলেছেন, তাঁকে আপনারা সবাই জানেন, তিনি দেশমান্য লোক। স্বদেশী আন্দোলন ও সাহিত্য-সেবায় তাঁর উল্লেখযোগ্য দান আছে।

অবশ্য পতিতাদের মধ্যে বিয়ে করে বা একনিষ্ঠ রক্ষিতা হয়ে ঘর-বাঁধা অপেক্ষা, মধুকর-বৃত্তির অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করার দৃষ্টান্তই বেশী। সারা জীবন যথেচ্ছাচারে কাটিয়ে, অতুল ঐশ্বর্য এরা শেষ পর্যন্ত হয় কোন ইতর ভৃত্য বা অনুগৃহীত জনকে দিয়ে যায়, নয় কোন মংলবী এটর্নি, পাতানো ছেলে, অথবা শেষ দিককার কোন বাবু কৌশলে তা আত্মসাৎ করেন। কদাচিৎ কারুকে কারুকে সমস্ত সম্পত্তি সৎকর্মে দান করে তীর্থবাসী হতেও দেখা যায়।

স্বাধীন পতিতাদের মধ্যে যাদের আমরা অভিজাত বলে আখ্যাত করি, তাদের অনেকেরই ধর্মছেলে, পুষ্যিমেয়ে ও ঝি-চাকর নিয়ে বেশ এক-একটা জাঁকালো সংসার থাকে। কার্তিক পূজো, সরস্বতী পূজো, বেড়াল, কুকুর বা বাঁদরের বিয়ে এবং গর্ভজাত বা পাতানো মেয়ের জন্মদিন নিয়ে তাদের ঘরে বারোমাস রকমারি আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা ও খানা-পিনার হৈ-হুল্লোড় লেগে থাকে। সাধারণ ভাবে তাদের প্রাত্যহিক সাজ-সজ্জায়, চাল-চলনে বেশ একটু ঐশ্বর্য এবং প্রাচুর্যের ছাপ দেখা যায়। অনেকে বেশ লেখা-পড়া জানে। কেউ-কেউ ইংরেজীও বলতে পারে। যারা ব্যক্তি বিশেষের বাঁধা রূপে থাকে, তাদের কথা ত বলারই নয়! সোনা-দানা, ঘর-বাড়ী, ছেলে-মেয়ে, ঠাকুর, চাকর, কোন দিকেই তাদের কোন রকম অপ্রতুলতা দেখা যায় না। তাদের ছেলে-মেয়েরা সময়-সময় পড়াশুনায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাজনীতিতে কৃতিত্ব দেখিয়ে যশস্বী হয়েছেন এবং আত্ম-পরিচয় গোপন করে, কালক্রমে সমাজ-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছেন, এমন দৃষ্টান্তও দু-চারটি আশা করি অনেকে পেয়ে থাকবেন। তবে সচরাচর সেটা নির্ভর করে মাতার সততা এবং পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য-বুদ্ধির ওপর। কিন্তু এ বড় একটা হয় না,

কারণ অধিকাংশ পিতাকেই এ বিষয়ে ষোল-আনা নিরঙ্কুশ হতে দেখা যায়। কিছুদিন বা অনেক দিন দুষ্ট লালসার বশবর্তী হয়ে কোন স্ত্রীলোককে আশ্রয় করা, তাকে গুটি কয়েক সন্তানের অধিকারিণী করা, তারপর মোহ-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে একদিন তাদের ফেলে পালানো, এ-ই হল বেশীর ভাগ পিতার সুবিদিত অভ্যাস। মাতার নীতিজ্ঞান-হীনতাও পুত্র-কন্যার পক্ষে কম বিয়ের কারণ হয় না।

একনিষ্ঠতা এদের স্বভাববিরুদ্ধ। তাই রক্ষক বাবুর সঙ্গে ছড়াছাড়ি এদের দিক থেকেও অনেকটা অনিবার্য ভাবেই ঘটে। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো লোকের পর লোক বদল করতে করতেই এরা সাধারণত ব্যবসার বয়স পার করে। বেশী বয়সে ঘর-বাড়ী ও টাকা-পয়সা হাতে নিয়ে কেউ-কেউ গুছিয়ে বসে এবং আস্তে আস্তে ভদ্রজীবনের মধ্যে ফিরে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু বেশীর ভাগই তখন বাড়ীওয়ালী সেজে পেশাদার পতিতা পাকড়াও করে আনে এবং তাদের দিয়ে ব্যবসা হাঁকায়। নয়ত আপন মেয়েকে ব্যবসায় নামায়। এরা মেয়েকে গান-বাজনা ও লেখাপড়া শিখিয়ে থিয়েটার-বায়স্কোপে দেয় ও সেই সঙ্গে পুঁজিওয়ালা মক্কেল জুটিয়ে দেয়। এই ভাবেই পতিতার ব্যবসা অব্যাহত ধারায় বয়ে চলে। সাধারণত অভিজাত পতিতাদের মধ্যে মায়ের দিক থেকে একটা পুরুষানুক্রমিকতার ঐতিহ্য থাকতে দেখা যায়। এটাই তাদের দর এবং কদর বাড়ায়। যাদের এ ঐতিহ্য নেই, তারা যথেষ্ট খান-দানী নয়।

স্বাধীন পতিতাদের মধ্যে একটা শ্রেণী আছে, যারা এই সমাজের হরিজন স্বরূপ। তাদের অবস্থা বাড়ীওয়ালী শাসিতাদের মতো সকরুণ না হলেও, তাদের সুখ-সমৃদ্ধি বা ঐশ্বর্য কিছু নেই। বিশেষ-বিশেষ পল্লীতে কয়েক জন মিলে তারা বখরায় এক-একটা বাড়ী ভাড়া নেয়। দলবদ্ধ ভাবে সেখানে থাকে, খরিদ্দার জোটায় এবং যথাশক্তি রোজগার করে দিনপাতের ব্যবস্থা ও আখেরের সংস্থান করে। প্রত্যেকের থাকে একটি করে শোবার ঘর, একটুখানি করে রান্নার জায়গা, কিংবা পা ছড়িয়ে বসবার রোয়াক। আর থাকে অল্প-স্বল্প সাজ-সজ্জা, তৈজস-পত্র ও বালিস-বিছানা। সন্ধ্যা হলেই মুখে রং দিয়ে, গিল্টির গহনা পরে, খোঁপায় ফুল গুঁজে, চটি পায়ে এরা দরজায় এসে দাঁড়ায়। দক্ষিণার হার এদের খুব কম। তবু যথেষ্ট দরদস্তুর করেই এদের খরিদ্দার ঠিক করতে হয়। প্রতি রাত্রে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে এই রকম তিন-চারটি মক্কেলের সাহচর্য না করলে, অনেকের পেটের ভাত হয় না।

নৃত্য, গীত, মদ্যপান, খেউড়, খিস্তি, মারামারি ও স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক নানা শ্রেণীর কদাচার এদের নিত্যকর্মের অন্তর্গত। রাত্রির প্রায় অর্ধাংশ এই সবে অতিবাহিত করে, তবে এরা ঘুমোতে পায়। দিবাভাগ এদের কাটে স্নান, বাজার করা ও খাওয়া দাওয়ায়। কেউ কেউ দিবানিদ্রা দেয়। কেউ কেউ সহবাসী পতিতাদের ভেতর থেকে খেঁড়ী জুটিয়ে এনে তাস খেলে এবং গল্প-গুজব করে। বিকাল হতে হতে আবার সেই নৈশ-অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। রাত্রে অনেকেই রাঁধে না। দোকানের খাবার খেয়ে চালিয়ে দেয়। রূপ-গুণ, বিদ্যা-বুদ্ধি বা স্বাস্থ্যের বালাই বেশীর ভাগেরই থাকে না। ক্ষয়রোগ ও দূষিত যৌনরোগে বিধ্বস্ত দেহকে কোন রকমে ঢেকে-ঢুকে এরা মক্কেল শিকার করে চলে। এদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও রীতি-নীতি পূর্ববর্ণিত পেশাদার পতিতাদের মতোই নোংরা ও ন্যাকারজনক। শুধু একটা পার্থক্য এই যে স্বোপার্জিত অর্থ এরা স্বাধীন ভাবে ভোগ করে এবং ইচ্ছা না হলে, কিছুদিন বা অনেক দিন ব্যবসা না করার স্বাধীনতা এঁদের আছে। যারা এরি ভেতর আখেরের কথা ভেবে, হাতে কিছু পুঁজি করতে পারে, কিংবা সময় থাকতে থাকতে দু-চারটি মেয়ে জুটিয়ে তাদের ব্যবসা ধরিয়ে দিতে পারে, বৃদ্ধ বয়সে তারা অনেকে বাড়ীওয়ালী বনে যায়। যারা যথাকালে ভেবে-চিন্তে কাজ করে না, তাদের শেষ বয়সে দেখা যায় পান বেচে, ঘুঁটে দিয়ে, অথবা ঝি-গিরি করে অন্ন সংস্থান করতে। পতিতা বৃত্তির সেই শোচনীয় পরিণতি বাস্তবিকই মর্মান্তিক।

এদের সমাজে বিশেষ ধরণের কতকগুলো আদব-কায়দা প্রচলিত আছে, যা পারতপক্ষে সাধারণত কেউ লঙ্ঘন করে না। একজনের বাবুকে আর একজন কোন মতেই প্রলুব্ধ করে না। এমন কি, সে-পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ চেষ্টা হলেও তা প্রতিহত করাই চলতি রেওয়াজ। অভাবে বা দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায়, কিংবা রেষারেষি বশে কেউ তা করলে, তা নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া-ঝাঁটি ও মারামারি বেধে যায়। বাবুকে কেন্দ্র করে সাঙ্গ-পাঙ্গ রূপে আর যারা ঘরে আসে, তারা 'ঠাকুরপো' নামে অভিহিত হয়। তাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করা, মদ্যপান করা পর্যন্ত চলে। তার বেশী কিছু করা রীতিমতো বেয়াদপি। কদাচিৎ কেউ তা করলে, সেজন্যে যথোচিত গোপনীয়তা প্রয়োজন হয়। প্রথমত বাবু জানতে পারলে প্রহারের, দ্বিতীয়ত সঙ্গিনীরা জানতে পারলে ধিক্কারের ভয় আছে। দিবাভাগে খরিদ্দার বসানো এই সমাজে সব চেয়ে বড় অসভ্যতা। যে তা করে তার নামে কুৎসার একশেষ হয়। পতিতার

শ্রেণী-নির্ণয়ে তাদের নিতান্ত অন্ত্যজ বা 'খেপসী' রূপে গণ্য করা হয়। তবে সন্থ পাখনা-গজানো বয়াটে কিশোরদের ঘরে এনে, জীইয়ে রাখা নাবালক মেয়েদের সঙ্গে তাদের বদ-ইয়ার্কির সুযোগ করে দেওয়া, কিংবা বাঁধা বাবু এলে, তার সঙ্গে একত্রে ঘরে দরজা দেওয়া সহনীয় ব্যতিক্রম হিসাবে চলে।

সাধারণত বাঁধা বাবু বলতে এদের ক্ষেত্রে কোন অনন্থ অধিকারসম্পন্ন উপ-পতি বোঝায় না। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসে এবং মাসিক বা সপ্তাহিক কিস্তিতে নিয়মিত দক্ষিণা দেয়, এমন খরিদ্দারকেই এরা বাঁধা বা টাইমের বাবু বলে। এই সব টাইম-বাবুর নির্ধারিত সময় বাদ দিয়ে ছুটো খরিদ্দার গ্রহণের স্বাধীনতা অবশ্য সকলেরই আছে। ছুটো খরিদ্দারদের সঙ্গে কারবার নগদ লেন-দেনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নগদ পয়সার অভাব হলে, অনেকে ছাতা বা আলোয়ান বন্ধকী রেখে যায়, এমন ঘটনাও ছু-চারটি পাওয়া গেছে। তবে শত অভাবের মধ্যেও মনের মতো মানুষ জুটে গেল, তার সঙ্গে প্রেমে পড়তে এবং বিনা মূল্যে সম্পর্ক পাতাতেও দেখা যায়। কখনো কখনো দুঃখার্জিত অর্থে সে-রকম মনের মানুষদের সংসার ও স্ত্রী-পুত্র পালনে সহায়তা করতেও দেখা যায় কোন কোন পতিতাকে। এই শ্রেণীর ভাগ্যবানদের পারিভাষিক নাম 'প্যানা' বলা যেতে পারে।

প্রত্যেক পতিতা গৃহেই এই রকম দু-একটা লোককে সর্বদা থাকতে দেখা যায়। তারা স্ত্রীলোকদের যাবতীয় ফাই-ফরমাস খাটে, বাজার করে, জল তোলে, সময়মতো লাথি-ঝাঁটাও খায়। সর্বাঙ্গে উল্কি, মাথায় বাবরি চুল, পরণে লালপেড়ে শাড়ী, এই রকম একটি শীর্ণকায় সরীসৃপকে একদিন রাস্তার কলে জল তুলতে ও সেই সঙ্গে দফায় দফায় এক কদাকার পতিতার কেঠো হাতের ঠোনা খেতে দেখেছিলাম। অনুসন্ধিৎসু জনতাকে স্ত্রীলোকটি এই বলে সরে যেতে বলছিল যে ঐ ব্যক্তিকে সে ভাত-কাপড় যোগায়, সুতরাং দোষ-অপরাধ করলে মারবে না ত কি করবে? দোষটা কি তা জানতে পারিনি। তবে প্রহৃত মহোদয়কে নির্বিকার চিত্তে বিড়ি ফুঁকতে দেখে বুঝেছিলাম, বন্ধনটা ওদের গভীর।

এদের ঘর-করনা ও চাল-চলনে কোন লক্ষণীয় গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না, এমন কথা কেউ যেন না মনে করেন। গ্লানি ও দুর্নীতির জীবন যাপন করলেও, অনেকে বেশ ধর্মনিষ্ঠ ও আচার পরায়ণা হয়। ঘরে-দোরে ধুনো-গঙ্গাজল দেওয়া, তুলসীতলা নিকানো, মন্দির ও দেবস্থানে প্রণামী দেওয়া অনেকের নিত্যকর্ম

স্বরূপ। উপবাস, মানসিক ও ব্রত-নিয়মের প্রতিও অনেকের বেশ অনুরাগ থাকতে দেখেছি। সকলেই ঘর-সংসার বেশ পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে রাখে। কুকুর, পাখী ও খরগোস পোষা, অনাথ ছেলে-মেয়ে কুড়িয়ে এনে মানুষ করা, এ-সব দিকেও অনেকের যথেষ্ট ঝোঁক থাকে। সমাজ-বিচ্যুত জীবনে কোন কিছুর ওপর স্নেহ-মমতা আরোপ করার আকুলতা থেকেই অবশ্য পশু-প্রীতি ও শিশু-প্রীতি এদের এত প্রবল হয়। তবে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিত্তিতে জীবন গড়ে ওঠে না বলে, আশ্রিত ছেলেকে চাকরে ও মেয়েকে বেশ্যায় পরিণত করা এবং তাদের দিয়ে খরিদ্দার সংগ্রহের দালালি করানোর ঘটনাও আখছার ঘটে।

নিজেদের মধ্যে বাবু নিয়ে, কল-জল নিয়ে, সময়-সময় এদের প্রচণ্ড ঝগড়া-দ্বন্দ্ব বাধলেও, প্রত্যেকটি আস্তানাতেই কতগুলো বিষয়ে ঐক্য ও সঙ্ঘ-বোধেরও পর্যাপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। একজন অসুস্থ হলে, আর একজন যথাশক্তি তাকে সেবা করে। কেউ মারা গেলে, সবাই খাটিয়া ঘাড়ে করে হরিবোল দিয়ে তাকে শ্মশানে নিয়ে যায়। কার্তিক পূজো, সরস্বতী পূজো, গান-কীর্তন বা শীতলা-মঙ্গল উপলক্ষে সকলে সমান ভাবে চাঁদা দেয়। একসঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ ও পান-ভোজন করে। নবাগত অনভিজ্ঞ মেয়েকে ব্যবসায়ের কৌশল ও খরিদ্দার দোহনের ফিকির শেখানো, যার আয় কম তাকে আপন বাবু ধার দেওয়া, দুই মেয়েতে সই পাতানো, কষ্ট করে লেখা-পড়া শেখা, গান শেখা প্রভৃতি গুণগুলিও লক্ষ্য করার মতো।

আসলে এরা অধিকাংশই গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। অকালে বিধবা হয়ে, স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে, কিংবা অনেক দিন পর্যন্ত অবিবাহিতা থেকে, কোন ব্যক্তির প্রলোভনে পড়া, তার সঙ্গে গৃহত্যাগ করা, অথবা তার দরুণ সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হওয়া, তারপর গড়াতে গড়াতে বেশ্যালয়ে এসে উপস্থিত হওয়াই বেশীর ভাগ মেয়ের আদি ইতিহাস। দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহৃত হয়ে, নিরাশ্রয় শৈশবে কোন পেশাদার পতিতার দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে, কিংবা পতিতা-জননীর দ্বারা পাপ ব্যবসায়ে দীক্ষিত হয়েও এই পথে আসার ইতিহাস আছে। দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বামী-পুত্র, ঘর-সংসার এবং সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে স্বেচ্ছায় পাতিত্যে নেমে আসার ঘটনা খুব কম। তবে তা ও একেবারে দুর্লভ নয়। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী তাঁর সংসার ও মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে, যুবতী কন্যা সহ স্বেচ্ছায় পাপ-বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন, এ কাহিনী আশা করি কলকাতাবাসী এখনো ভুলে যাননি।

একাদশ অধ্যায়

পেশাদার পুরুষ

ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় পুরুষের বেশ্যাবৃত্তি ব্যবসায় হিসাবে চলিত আছে। আইন-নিষিদ্ধ হলেও, সমাজে চল আছে বলে এবং বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গোপনে এই ব্যবসায়ের উৎসাহ দাতা বলে, ব্যাপারটা সমাজ থেকে কোনদিন উৎখাত হতে পারেনি। জন-সাধারণও এসম্বন্ধে খুব বেশী গোপনতার প্রয়োজন বোধ করেনা। অমৃতসহর, লাহোর, কানপুর, আগ্রা, দিল্লী, এলাহাবাদ প্রভৃতি সহরে বারো, তেরো, চোদ্দ বছরের ছেলেরা চোস্ত-পায়জামা ও চুমকিদার কামিজ পরে, পার্কে, হোটেলের আশে-পাশে ও ঝিল-সরোবরের ধারে-কাছে ঘুরে বেড়ায়। তাদের চোখে কাজল, হাতের তলা ও আঙুলের নখ মেহেদীরঞ্জিত, গালে রুজ। কারু হাতে থাকে একটা চেন-পরানো তিতির পাখী, কারু গলায় বাঁধা থাকে ত্রিভূজাকৃতি একটা নক্সী রুমাল। স্থানীয় অভিজ্ঞ লোকেরা সবাই জানে, এরা কি। উৎসাহী খরিদ্দার পেলেই এরা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়; তারপর কোন হোটেলের নির্জন কক্ষে, নয়ত কোন নির্জন স্থানে চলে যায়।

এদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, ঢং-ঢাং, সবই মেয়েলিয়ানা পূর্ণ। কেউ-কেউ খাসা নাচতে গাইতে পারে। অনেকে ফুরোন-চুক্তিতে বড় লোকের বাগান-বাড়ীতে উৎসব যাপন করতে যায়। ঘাগরা-কাঁচুলী ও ওড়না পরে, নাচ, গান ও হাসি-হল্লায় মজলিস সরগরম করে তোলে। বল-বাহুল্য, উৎসবের আনুষঙ্গিক রূপে মদ্যপান, কদাচার ও অসৎ ইয়ার্কি পূর্ণোদ্যমেই চলে। এক রাত্রে হাজার টাকা উপার্জন করেছিল, এমন একটি লালা পদবীধারী ছেলের বিবরণ আমার সংগ্রহে আছে। পনেরো বৎসর বয়স্ক এই বালকটি গৃহস্থ ঘরের ছেলে। হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ত, সেই সঙ্গে দুর্নীতির ব্যবসা করে নিয়মিত পয়সা উপার্জন করত। আর একটি কানপুরী ছেলের কাহিনীও নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া গেছে। সে এক মধ্যবয়স্ক এডভোকেটের 'রক্ষিত' রূপে থেকে একাদিক্রমে সাত-আট বছর মোটা বৃত্তি ভোগ করেছিল। রাম-লীলায় সীতার ভূমিকা অভিনয়ে নিরত আর একটি বালকের রূপ-লাবণ্যে ও নৃত্য-গীতে মুগ্ধ হয়ে. এক আধা-রাজা গোছের পদস্থ ব্যক্তি চর মারফৎ তার

কাছে নিবেদন করে পাঠান এবং সেই আমন্ত্রণের ফলে বালকটি অবলীলায় যাত্রা-পার্টি ছেড়ে তাঁর রক্ষণে চলে আসে। দীর্ঘকাল তাঁর কৃপায় থেকে সে বেশ মান্যগণ্য লোক হয়ে ওঠে। সরকারী চাকুরে, উকীল, অধ্যাপক, ব্যবসাদার, জমিদার, নানা শ্রেণীর বিশিষ্ট লোকের মধ্যেই স্থায়ী ভাবে এই রকম বালক রাখার, বা অস্থায়ী ভাবে তাদের সঙ্গে কু-সম্পর্কে লিপ্ত হবার অভ্যাস উত্তর ভারতের নানা স্থানে খুব প্রবল এবং এই সব বালক 'রক্ষিত'কে ভালো চাকুরি দেওয়া, বাড়ী দেওয়া, গাড়ী দেওয়া, মেয়ে দিয়ে জামাই করে নেওয়া ইত্যাদির ইতিহাসও অনেকে সকৌতুকে ব্যক্ত করেন।

অবস্থাপন্ন বা ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের কৃপাভাজন হলে, কালে ছেলের একটা ভালো হিল্লে লেগে যাবে মনে করে, গরীব পিতা-মাতা অনেক সময় সব জেনে বুঝেও কিছু বলেন না। খুচরো দুষ্কৃতির বখশিস রূপে ছেলেরা ঘরে নগদ টাকা আনে বলেও, অনেকে এ সম্বন্ধে আপত্তির কথা মুখে আনেন না। একজন পিতাকে এমন কথাও বলতে শোনা গেছে যে মেয়ে ত নয়, কাজেই অবৈধ সন্তান-সম্ভাবনার, বা অন্য রকম সামাজিক কলঙ্কের ভয় নেই। ছেলে একটু চালাক-চতুর হওয়াই ভালো। জীবনে তাহলে কোন অবস্থাতেই আর টক্কর খাবে না। বস্তুত অভিভাবকবৃন্দের পক্ষ থেকে এই ধরণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদন থাকে বলেই, ছেলেরা এজন্যে কোন নৈতিক গ্লানি বা অনুশোচনা বোধ করেনা। তাছাড়া আবহাওয়ার প্রভাব এবং হাতে-হাতে নগদ প্রাপ্তির প্রলোভনও তাদের নীতিভ্রষ্ট করে অতি সহজেই। লক্ষ্য করার বিষয় যে ভদ্র পরিবারের ছেলেরা যেখানে দুর্নীতির ব্যবসা করে, সেখানে বাইরে থেকে জিনিষটা চলে অ-সমবয়সী দুটি পুরুষের মধ্যে 'বন্ধুত্ব' রূপে।

এক লেখক-পত্নী তাঁর বাঙালী বান্ধবীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমার স্বামী একটি সতীন জুটিয়ে এনেছেন। মেয়ে নয়, একটি ছেলে। সারাদিন তাকে নিয়ে থাকেন। যেখানে যান সঙ্গে করে নিয়ে যান। তার জন্যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে, ব্যাঙ্কে একাউণ্ট খোলা হয়েছে। কি অস্বাভাবিক ব্যাপার বুঝতে পারছ!' এমনি আরো অনেক পরিবারের আভ্যন্তরীণ খবর বিভিন্ন সময়ে জানার সুযোগ হয়েছে। তথাকথিত অসম্ভ্রান্ত বা অ-ভদ্র ঘরের ছেলেরা এটুকু লুকো-ছাপারও ধার ধারে না। তারা গণিকাসুলভ সাজ-সজ্জা করে পার্কে, বাগানে, হোটেলে, আদমি শিকার করে বেড়ায়। এমন কি, তেমন-তেমন লোক দেখলে, কেউ-কেউ প্রকাশ্য ভাবে এগিয়ে এসে বলে,

'নমস্তে ইয়ার, ক্যা পালংপোষ হৈ?' 'পালংপোষ' পারিভাষিক শব্দ, পাঞ্জাব অঞ্চলে চল আছে।

হোটেল, ক্লাব ও জুয়ার আড্ডায় এই শ্রেণীর বালক জাইয়ে রেখে, দালালরা নানা ফিকিরে খরিদ্দার জুটিয়ে নিয়ে আসে এবং আধা-আধি বখরায় কারবার চালায়, সে খবরও অনেক জায়গা থেকে সংগ্রহ করা গেছে। খরিদ্দাররা আসে পান-ভোজন করতে, ফ্লাস খেলতে। সেই সুযোগে নিভৃত কেবিনে পেশাদার বালকরা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং কিছুক্ষণ বা অনেক ক্ষণ সাহচর্য দিয়ে পারিশ্রমিক আদায় করে নেয়।

একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, এদের দক্ষিণার হার নাকি নারী-গণিকাদের চেয়ে বেশী এবং প্রকৃত পতিতাদের ব্যবসায়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলে, তারা নাকি এদের দু-চক্ষে দেখতে পারে না। পতিতা পল্লী থেকে সংগৃহীত একটি উর্দু গানে বলা হয়েছে, 'সেই সব লম্পট পুরুষকে ধিক, যারা বিধাতার অভিপ্রেত পথ বর্জন করে, ঘোরানো পথে পরিভ্রমণ করে। আসল নারীকে পরিহার করে, পুরুষের মধ্যে করে নকল নারীত্ব অনুসন্ধান'। এই কদর্য গানে পুরুষ-বেশ্যাদের রীতি-নীতি ও তাদের সম্পর্কে ইতর সাধারণের মনোভাবের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। জনৈক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী বলেছেন, উত্তর ভারতের কোন কোন অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ নারীর অভাব আছে। তার ফলেই সেখানে পুরুষ-সমাজে এই রকম অস্বাভাবিক আসক্তির ব্যাপ্তি হয়েছে। এ-কথা কতকটা সত্য তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী ও গুণবতী তরুণীর সাহচয উপেক্ষা করেও যে হারে এই সব অঞ্চলে পুরুষকে পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা যায়, তাতে এ কথা মনে না করে উপায় নেই যে এর শেকড় সামাজিক অভ্যাস এবং রুচির মধ্যেই বিসর্পিত আছে। এটা নিতান্তই বিকল্প উপায় নয়।

কোন-কোন প্রদেশে অবস্থা এমন ভয়াবহ যে বিশিষ্ট লোকগুরু, ধর্মনেতা, দেশসেবক, শিক্ষক ও সাহিত্যব্রতীর মধ্যেও প্রভূত পরিমাণে এই দুষ্ট ব্যাধির প্রসার লক্ষ্য করা যায়। অধুনা মৃত কোন সর্ব-ভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির ডায়েরী পুস্তকাকারে প্রকাশ কালে, তাঁর উত্তরাধিকারীরা পাণ্ডুলিপি থেকে শতাধিক পৃষ্ঠা বর্জন করেছিলেন। এই পৃষ্ঠাগুলিতে তিনি এগারো বৎসর ধরে পর্যায়ক্রমে চার-পাচটি বালকের সঙ্গে কি ভাবে দীর্ঘস্থায়ী গোপন বান্ধবতা করেছিলেন, তাঁর বিস্তারিত ইতিহাস ছিল। তিনি বোধহয় এই ইতিহাস

সকলের জ্ঞাতার্থে লিখেছিলেন। কিন্তু বংশধরেরা সে-কাহিনী সাধারণ্যে প্রচার অভিপ্রেত মনে করেননি। আর একজন প্রসিদ্ধ লোকগুরু তাঁর উপদেশাবলীর সংগ্রাহককে বলেছিলেন, 'সমস্ত কু-প্রবৃত্তিই আমি দমন করেছি। শুধু বালকাসক্তির দুর্নিবার নেশা আমার মন থেকে আজো যায়নি। সন্ন্যাসাশ্রমেও যে এই দুষ্প্রবৃত্তি আমাকে বহুবার উত্যক্ত করেছে, একথা তুমি অসঙ্কোচেই ব্যক্ত করতে পারে।' এত উচ্চস্তরের লোক যাঁরা নন, অথচ যাঁরা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, পদস্থ ও নানা দায়িত্বজনক কাজে নিয়োজিত, তাঁদের কাহিনী ত বলারই নয়। শিশু-কল্যাণ ব্রতে নিয়োজিত এক মহিলা চিকিৎসক বলেছেন, এমন অনেক অঞ্চল আছে, যেখানে ভদ্রাভদ্র নির্বিশেষে শতকরা পঁচাত্তর জন পুরুষই বাল্য-কৈশোরের এক অধ্যায়ে কোন-না-কোন লোকের আসঙ্গ কামনায় নায়িকা ভূমিকা নেয়। যৌবন ও মধ্যবয়সে এরাই আবার নায়ক হয়ে অপরাপর বালককে সাহচর্যে নিযুক্ত করে। বার্ধক্যজনিত শৈথিল্য এসে পড়লেও অনেকে নিরস্ত হয় না। তখন অসঙ্গত উপায়ে স্বাস্থ্যবান যুবকদের কু-কর্মে প্ররোচিত করে, সেই অনুষ্ঠানে তারা নেয় নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। এই কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, সামাজিক মনস্তত্ত্ব আমূল পরিবর্তিত না হলে এবং নারীর ব্যক্তিত্ব ও সমাজ-শাসনে নারীর কর্তৃত্ব সমধিক বর্ধিত না হলে, পুরুষ-সমাজের পৃষ্ঠপোষিত এই কদাচার ও কু-কর্মের অভ্যাস কোনদিন দমিত হবে না।

কত মেধাবী, প্রতিভাবান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনীয়তা সম্পন্ন ছেলে যে এই দুষ্ট অভ্যাসের কবলে পড়ে, অকালে দূষিত রোগে আক্রান্ত ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে, কত ভদ্রনারী যে স্বামী-পুত্রের এই অনুচিত অভ্যাসের দৌরাত্ম্যে তীব্র অশান্তি ভোগ করে চলেছেন, তার বিচিত্র ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন এই মহিলা। একটি বালককে নিয়ে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের মধ্যে ঈর্ষা, কলহ, এমন কি, খুনোখুনি পর্যন্ত হবার অনেক কদর্য কাহিনীও এই ইতিহাসে পাঠ করেছি।

তাঁর কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে একটি ছেলে বলেছিল, আমি নারী হলে বেশী সুখী হতাম। বেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান একটি পুরুষ আমাকে বিয়ে করত! আর একটি ছেলে বলেছিল, আমি কত টাকা পাই। আমাকে ওরা কত ভালোবাসে। এত ভালো আমাকে আর কেউ বাসে না। একজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি যখন বড় হবে, তখন এ-সব কথা মনে করে তোমার ধিক্কার বোধ হবে না? ছেলেটি তার

উত্তরে বলেছিল, তা কেন হবে? আমিও তখন ভালো মতো একটা দোস্ত জুটিয়ে নেব। বিয়ে করবে না, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে সে বলেছিল, কেন করব না? কিন্তু তাতে কি? আমার দাদাও ত বিয়ে করেছে। তবু তার ছোকরা আছে কেন? মোটের ওপর এই হল প্রচলিত মনস্তত্ত্ব এবং দেশাচারই তলা থেকে এই বিকৃত মনস্তত্ত্বের পোষকতা করছে। বিষয়টা এমনি সুবিদিত যে বিবাহে অনিচ্ছুক এক ভদ্র তরুণী এই মহিলা ডাক্তারকে বলেছিলেন, বিবাহ করে কি হবে? দু দিন বাদেই ত স্বামী একটা সুন্দর ছোকরা জুটিয়ে আনবেন। নয়ত আমার ওপরই কুৎসিত আসক্তি চরিতার্থ করার মতলবে অস্বাভাবিক আচরণে প্রবৃত্ত হবেন! আমার বড় বোনের জীবন এতেই দুর্বহ হয়েছে। আমি আর ওর মধ্যে ইচ্ছা করে যাচ্ছি না।

ব্যাপারটি শুধু সাম্প্রতিক কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ, এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, রাজপুতানা এবং অযোধ্যার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যে এর কিছু-কিছু নিদর্শন পাওয়া যাবে। সাহিত্যে এবং নীতিশাস্ত্রেও ইতস্তত এর লক্ষণীয় উল্লেখ আছে। 'গুলসান-এ ইয়ার' নামক কিসসা কাব্যে সুকুমারকান্তি ক্রীতদাস লাহীর প্রেমে আত্মহারা হয়ে বীর নায়ক জেবির কি ভাবে বন্দিনী রাজকন্যা মুল্লীর প্রণয় নিবেদন উপেক্ষা করেছিল, তার কাহিনী সালঙ্কারে বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে পূর্ণ একটি সর্গ জুড়ে লাহী ও জেবিরের মিলন-কাহিনী স্থান পেয়েছে, যা বর্ণনার অকপটতায় 'বিদ্যাসুন্দর'কেও লজ্জা দেয়। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত নীতিগ্রন্থ 'সংকর্মমালা'তে যুব-সমাজকে বার বার সমাসক্তি রূপ কদাচার থেকে প্রতিনিবৃত্ত হতে উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে, 'পুরুষের এই কু-অভ্যাসই কুলনারীকে সত্যভ্রষ্ট করে। ইন্দ্রিয় তাড়নায় অধীর হয়ে তারা পরপুরুষ ভজনার দ্বারা সপ্তপুরুষকে নিরয়গামী করে। কলঙ্কিনী দাসীর প্ররোচনায় গর্ভ-গৃহ প্রজ্জ্বলিত হয়, এমন সমস্ত অকার্য করে।'

রসখানও পুরুষে-পুরুষে এবং নারীতে-নারীতে অবৈধ সংসর্গের উল্লেখ করে, অনুষ্ঠাতাদের ওপর বিধাতার অভিশাপ আকর্ষণ করেছেন। বলেছেন, 'কলির কলুষ প্রভাবে মানুষ আজ বিপথগামী। প্রাকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে, সৃষ্টিকে অপত্যরূপ মহা সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে তাই সে আজ ঘৃণ্যতম অনুচিত আচরণে নিয়োজিত।'

বাংলা দেশেও এই কদাচারের প্রচলন কম নেই। কিন্তু ঠিক ব্যবসায়ের ভিত্তিতে এর চলও বোধহয় খুব বেশী নয়। নারী পতিতার প্রাচুর্যই হয়ত এর প্রধান কারণ। তাছাড়া ভদ্র সমাজের রুচিও মূলত এর প্রতিকূলে। অল্প বয়সী দুই বন্ধু বা সহপাঠীর ভেতর, হোষ্টেল-মেসের কিশোর-যুবকদের ভেতর, কিংবা রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ধর্মাশ্রম ও জন-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের তরুণ কর্মীদের ভেতর অবশ্য কিছু পরিমাণে সমমিথুনাত্মক প্রণয় হয়। সে প্রণয়ে একপক্ষ নায়ক, অন্যপক্ষ নায়িকার ভূমিকাও নেয়। গোপনে মালা-বদল, প্রণয়ে একনিষ্ঠতা রক্ষার প্রতিজ্ঞা, এমন কি, দু-জনে নর-নারী সেজে ছবি তোলানোও হয়। কিন্তু তার পেছনে সাধারণত থাকে অল্পবয়সের নির্বুদ্ধিতা-মেশানো রোমান্টিক স্বপ্নাকুলতা এবং থাকে সদ্য-জাগ্রত ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণার অন্ধ উদ্দীপনা। অর্থোপার্জনের মনোভাব থাকে না বলেই, ব্যবসায়ের কোঠায় পড়ে না তা। একটু বয়স হলে, এই প্রবৃত্তি তাদের মন থেকে আপনি স্খলিত হয়ে যায়। তখন এ ব্যাপারকে তাদের ছোট বয়সের বোকামি মাত্র বলে মনে হয়।

কিন্তু অল্প বয়সের এই বদ-অভ্যাস সময়-সময় অনেকের বেশী বয়স পর্যন্ত থেকেও যায়। যাদের তা হয়, তারা এই প্রবৃত্তির তাড়নায় হয় সারাজীবন বিবাহই করে না, নয়ত বিবাহিত জীবনের আড়ালেই নানা ফিকিরে এই দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে বেড়ায়। তরুণ বয়স্ক সুশ্রী বালককে পয়সার দ্বারা প্রলুব্ধ করে, ভালো চাকরি করে দিয়ে, অথবা অন্য কোন উপায়ে তাকে কৃতজ্ঞতা-সূত্রে আবদ্ধ করে, তার সঙ্গে নিয়মিত সংসর্গ রক্ষা করেন এমন বয়স্ক ব্যক্তি দু-চারজন সর্বত্র আছেন। আবার স্বাস্থ্যবান যুবকদের একই কৌশলে আয়ত্তে এনে, তাদের দিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করান ও সেই অনুষ্ঠানে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নেন, এমন লোকেরও অভাব নেই। এ-সব যে দীর্ঘ বিলম্বিত বাল্য অভ্যাসের ফল, সে-কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য এবং সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, সম্মানিত ও দায়িত্বজনক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যেও যে এই শ্রেণীর বিকৃতাসক্তি সম্পন্ন লোকের অভাব নেই, এ আশা করি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা জানেন।

অধুনা বিখ্যাত এক বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বীকৃতিতে জানা যায় যে বাল্যকালে তাঁকে বেশী নম্বর দেবার ও সর্বোত্তম প্রাইজ পাইয়ে দেবার আশ্বাসে প্রলুব্ধ করে, জনৈক শিক্ষক কয়েক দিন তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছিলেন। আর

এক ভদ্রলোক যৌবনে কোন বিখ্যাত ব্যক্তির কাছে চাকুরি প্রার্থী রূপে উপস্থিত হলে, তিনি তাঁর কাছে খোলাখুলি অসৎ কামনা ব্যক্ত করেন ও তার বিনিময়ে তাঁকে কাজ দিতে রাজী হন। বেকার দশার বিড়ম্বনায় ভদ্রলোক সম্মত হয়েছিলেন এবং কয়েক বৎসর গোপনে তাঁকে এই মনিবের সংসর্গ রক্ষা করতে হয়েছিল। বাল্যকালে অন্যের বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করতেন, এমন এক ব্যক্তি বলেছিলেন, বাড়ীর কর্তা মাঝে মাঝে অধিক রাত্রে তাঁকে ডেকে নিয়ে যেতেন। তিনি উত্যক্ত হয়ে অন্যত্র চলে যাবার চেষ্টা করলে, ষাটবছর বয়স্ক এই প্রবীণ ভদ্রলোক তাঁকে হাতে-পেয়ে ধরে অনুনয় করতেন। তাকে তিনি একদিন তিন হাজার টাকা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স উপহার দিয়েছিলেন। জিনিষটা এতদূর পর্যন্ত জানাজানি হয়ে যায় যে, ভদ্রলোকের এক নাৎনী ছেলেটিকে প্রকাশ্যে 'দিদিমা' বলে ক্ষেপাত। বিশিষ্ট সরকারী চাকুরিয়া এক অ-ভারতীয়কে খুসী করে, তার বিনিময়ে কোন দায়িত্ব জনক বিভাগের প্রধান কর্তৃত্ব লাভ করেছেন, এমন এক ভদ্রলোকের কথা সম্ভবত অনেকেই জানেন। অনুরূপ সুযোগে একটি গুরুতর অপরাধ করেও অল্প কাল আগে আদালতের শাসন-দণ্ড এড়িয়ে গেছেন, এমন এক ভাগ্যবানের কথাই বা কে না জানেন? এই উপায়ে এক ব্যক্তির কোন বিশিষ্ট পরিবারে জামাতা হবার কাহিনীও আমার সংগ্রহে আছে।

এ সমস্তই পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত পাতিত্যের নিদর্শন, তাতে আর সন্দেহ নেই এবং এর কোনটা ঘটেছে নিজের অসহায় অবস্থার দরুণ, কোনটা বা অবলম্বিত হয়েছে ভাগ্যান্বেষণের সোপান রূপে। তরুণ সমাজে প্রচলিত রোমান্টিক সমাসক্তির সঙ্গে এর তাই প্রকৃতিতে একটা পার্থক্য আছে। এই ব্যবসায়ে অভ্যস্ত বালক ও যুবকদের মধ্যে অনেকের এবিষয়ে বেশ একটা অসুস্থ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত দলই হল পেশাদার পুরুষ।

লক্ষ্য করে দেখেছি, বেশী বয়সে পৌঁছেও তারা বাল্যকালের কুপ্রবৃত্তি অনেক সময় দমন করতে পারে না। বালক ও যুবকদের ওপর নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তখন নিজেরা পরোক্ষ ভূমিকা নিয়ে তাদের সক্রিয় ভূমিকায় নিযুক্ত করে এবং সে-জন্যে প্রভূত অর্থ ও অনুগ্রহ বণ্টন করে। বাংলার কোন বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের এই ব্যাধি ছিল। একজন সাহিত্যিকের এই রোগও প্রায় সর্বজনবিদিত। রাজনীতিক কর্মী, অধ্যাপক, ব্যবসাদার, সমস্ত সমাজেই এ-রকম লোক কিছু-কিছু পাওয়া যাবে। বহু প্রসাদভিক্ষু যুবক এদের সহায়তায়

রকমারি সুযোগ ও সুবিধা অর্জন করেছে, তার অনেক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে।

কিন্তু আগেই বলেছি, বাঙালী ভদ্র-সমাজে এই পাপের ব্যাপ্তি অত্যধিক নয়। পক্ষান্তরে তথাকথিত অ-ভদ্র সমাজে এই পাপের প্রসার প্রায় সার্বজনীন বললেই চলে। প্রবাসী ও নারী-সঙ্গবঞ্চিত কুলি-কাবারী, মুটে-মজুর, ফড়িয়া-ফেরিওয়ালা, কিংবা পেশাদার ভিক্ষুক, সাধু-ফকির, ও গুণ্ডা-গাঁঠকাটাদের ভেতর আপন-আপন ব্যবসায়ের সহকারী এবং কু-কর্মের সহযোগী রূপে বালক রাখার অভ্যাস খুব প্রবল। দু-তিন জনে একটি বালক রাখার বা কয়েক জনে মিলে কয়েকটি বালক রাখার দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়। কদাচিৎ একক ভাবে রক্ষিত বালককে স্ত্রী বানানো বা দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মারামারিতে উদ্দিষ্ট বালকের প্রাণনাশের ঘটনাও ঘটে। কিন্তু এ-সব কথা আগের অধ্যায়গুলিতে বলেছি।

বলা বাহুল্য প্রকাশ্য ভাবে বেশ্যাবৃত্তি পুরুষ কমই করতে পারে, তার কারণ দেশের প্রচলিত আইন তার বিরুদ্ধে। এজন্যে তাকে নানা ছল-চাতুরির আশ্রয় নিতে হয়। ইডেন গার্ডেন, কার্জন পার্ক ও লেক-অঞ্চলে ঘাড়ে তোয়ালে এবং হাতে গোটা কতক গন্ধ-তেলের শিশি নিয়ে একদল মাসাজ-কারী বালক বেড়ায়। তারা অনেকে ঝোপ-ঝাড়ের ইতস্তত উপবিষ্ট বদ-লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় এবং মাসাজের নামে কু-কর্মে নিযুক্ত হয়ে মোটা দক্ষিণা নেয়। স্যু-সাইন বা জুতা পালিশ-কারী বালকদের মধ্যেও এই রকম পাপ-ব্যবসায়ী আছে। চৌরঙ্গী এলাকায় হোটেল-রেস্তরাঁর আশে-পাশে সাহেবদের ট্যাক্সী হেঁকে দেবার জন্যে যে-সব বালক গভীর রাত্রি পর্যন্ত ফুটপাতে মোতায়েন থাকে, যুদ্ধের সময় গলায় চেকের রুমাল বেঁধে ও মুখে প্রচুর পাউডার লাগিয়ে, তারা অনেকে জীপযোগে মার্কিন এবং নিগ্রোদের সঙ্গে হাওয়া-বিহারে বেরত, এ কে না দেখেছেন?

সৈনিকদের দ্বারা উপদ্রুত এক চাঁপাফুল বিক্রেতা বালককে ঐ সময় সংজ্ঞাহীন অবস্থার পথে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল এবং তার হাতের মুঠোয় পাঁচখানি দশ টাকার নোট পাওয়া গিয়াছিল, এ আশা-করি অনেকের স্মরণ আছে। এই ভাবেই ফড়িয়া-ফেরিওয়ালা, বয়, ভিখারী, নানা ছদ্মবেশে বদ-ছেলেরা সমাজের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পাপের ব্যবসা চালায়। ব্যবসায়িক বেশ্যালয়ে দুষ্টরুচি খরিদ্দারের জন্যে ভৃত্যরূপে বালক পোষা হয় এবং তারা নারীসুলভ সাজ-সজ্জা করে অন্যায়ের কারবার করে, এ কথা ত আগেই বলেছি। এদের পারিভাষিক নাম হল 'চৈ'। একান্ত ভাবে 'চৈ'-দের দিয়ে গোপনে ব্যবসা জমানো

হয়, এমন প্রতিষ্ঠানও নাকি আছে। এ ছাড়া সমাজ-জীবনে গোঁফ কামিয়ে, বুকে কাপড় টেনে বেড়ায়, কথায়-কথায় নারীসুলভ লজ্জাশীলতার ভাণ করে, এমন একদল পুরুষ দেখা যায়, সাধারণ ভাবে যাদের বলা হয় 'মেয়ে ন্যাকড়া', তারাও অনেকে অপ ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। এরা যে আধা-হিজড়া এবং জন্মগত ভাবেই বিকারগ্রস্ত, তাতে আর সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে খাঁটি হিজড়াদের সম্বন্ধেও দু-কথা বলা দরকার। সাধারণ ভাবে হিজড়ারা নপুংসক নামে অবিহিত হলেও, দেহ-গঠনে কিন্তু এদেরও নারী-পুরুষের ভেদ আছে। যারা পুরুষ, পুরুষ দেহেই তাদের স্তনাদি কতকগুলি নারী-চিহ্ন থাকে। যারা নারী, নারী-দেহেই তাদের থাকে গোঁফ-দাড়ি ও অনুরূপ কতকগুলি পুং-চিহ্ন। পুরুষগুলি আকারে দৈত্যবিশেষ হয়, আর নারীগুলি হয় অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু কি পুরুষ, আর কি নারী, হিজড়া মাত্রেরই আকারে-প্রকারে যেমন দেখা যায় একটা অস্বাভাবিক সামঞ্জস্য-হীনতা, তেমনি তাদের চলন-বলন, ভাব-ভঙ্গী, সব কিছুর মধ্যে প্রকাশ পায় কেমন একটা অমার্জিত বীভৎসতা। বিশ্রী ভোঁতা গলা, ছন্দোহীন, শালীনতাহীন চলা, অশ্লীল, অসৌষ্ঠবময় আচার-ব্যবহার সকলেরই বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই এদের এক-দৃষ্টিতে চেনা যায়।

সাধারণত কুলিখোলা, বস্তী অঞ্চল ও পতিতা-পল্লির আনাচে-কানাচে এরা থাকে। গৃহস্থবাটীতে ছেলে-পুলে হলে, মিউনিসিপ্যাল রেজিষ্ট্রেশন অফিস থেকে সে সংবাদ জোগাড় করে সদলবলে এসে হাজির হয় এরা। নবজাত শিশুর ভেতর কোনটা নপুংসক হয়েছে কিনা, তার তল্লাসি করতেই অবশ্য হিজড়ারা দল বেঁধে আসে। দৈবক্রমে সে-রকম শিশু পাওয়া গেলে, এরা তাকে টেনে নিয়ে যায়। অন্যথায় নেচে কুঁদে, অশ্লীল গান গেয়ে, হাততালি দিয়ে বাড়ীশুদ্ধ সকলকে উত্যক্ত করে, টাকা-পয়সা, কাপড়-চাল, যা পায় আদায় করে নিয়ে যায়। এদের ভেতর বাঙালী-অবাঙালীর ভেদ নেই, হিন্দু-মুসলমান নেই। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও সাজ-সজ্জায় কোন স্পষ্ট পার্থক্য নেই। এক-একটা আড্ডা ফেঁদে সবাই দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। একই রকম উপায়ে দিন-যাপন ও অন্নাহরণ করে।

জন্মমাত্রেই নপুংসক শিশুরা হিজড়াদের কবলে পড়ে এবং সারা জীবন তাদের ভেতর বেঁচে থাকে। সমাজ তাদের স্বীকার করে না। লোকালয়ও তাদের দায়িত্ব নেয়না। নেবে কি? যারা নারীও নয়, পুরুষও নয়,

এমন অদ্ভুত জীবদের নিয়ে সমাজ কি করবে? কাজেই যে-মুল্লুকে আর যে-সম্প্রদায়ের ঘরেই জন্মাক তারা, শেষ পর্যন্ত সবাই তারা এক রকম ধরন-ধারণ ও শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারী হয়ে ওঠে। পিতা-মাতার সংস্রবে মানুষ হলে এবং সুশিক্ষা ও সদাচারের প্রবর্তনা পেলে, হয়ত দেহের দিক থেকে বিসদৃশতা যাই থাকুক, মনের দিক থেকে কিছুটা মানুষী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেত তাদের। দুঃখের বিষয়, সে সুযোগ তারা পায় না। তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে নবজাতকদের ভেতর প্রতি এক-লক্ষেও একটা হিজড়া জন্মায় না। তা জন্মালে, অন্য অনেক সমস্যার মতো এ-ও একটা সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াত।

সাধারণ সমাজবদ্ধ নর-নারীদের মধ্যেও অবশ্য নারী ভাবাপন্ন পুরুষ এবং পুরুষ ভাবাপন্ন নারী দেখা যায়। এমন অনেক নারী দেখা যায়, যাদের উরু, নিতম্ব ও বক্ষে মেদজ পেলবতা কম থাকে। মুখে ঈষৎ গোঁফের আভাস দেখা যায় এবং চলায় বলায় ও কণ্ঠস্বরে নারীসুলভ কোমলতার চেয়ে পুরুষোচিত কার্কশ্যই বেশী প্রকাশ পায়। আবার এমন পুরুষও অনেক দেখা যায়, যাদের দৈহিক গঠনে কেমন একটা সুকুমার মেয়েলি ঢং প্রকট হয়। তাকানো, চলা এবং কণ্ঠস্বর তাদের হয় কেমন একটু মিহি ও মসৃণ ধরণের! সব তাতেই তাদের থাকে কেমন একটি স্নিগ্ধ সলজ্জ ভাব! তা সত্ত্বেও এই রকম নারীরা নারীই, পুরুষেরা পুরুষই এবং তারা যুগ্ম-জীবনও যাপন করে থাকে। তাদের ছেলে-পুলেও হয়। কাজেই তাদের এই প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য গুলিকে লোকে সহনীয় ব্যতিক্রম রূপে মেনে নেয়।

অবশ্য এই ব্যতিক্রম একটু বেশী দূর গেলেই 'মেয়ে ন্যাকড়া' পুরুষ ও 'আধ-মর্দা' মেয়ে তৈরী হয়। মেয়েদের মতো বড় বড় চুল রাখে, মেয়েদের মতো ঘুরিয়ে কাপড় পরে, প্রসাধন করে, কথায় কথায় বুকে ও মুখে কাপড় রেখে লজ্জার অভিনয় করে, পুরুষের সঙ্গ অপেক্ষা নারীর সঙ্গ বেশী পছন্দ করে, এমন পুরুষ গৃহস্থ পল্লীর মধ্যে দু'চারটি আশা করি সবাই দেখেছেন। আবার পুরুষের মতো দৌড়-ধাপ, খেলা-ধূলো ও চেঁচামেচি হুড়োহুড়ি করে, আঁট-সাঁট পোষাক পরে, ধূমপান করে, স্বচ্ছন্দে ঢিলা কথা বলে, হাবে-ভাবে নিজেকে নকল পুরুষ রূপে দাঁড় করায়, বিয়ের কথা, প্রেমের কথা, বা সন্তান হওয়ার কথায় ক্ষেপে ওঠে, মারামারি বাধায়, এমন মেয়েও আশা করি সবাই দেখেছেন। সাধারণত এই রকম নর-নারীরা বিয়ে থাওয়া করে না। বিরুদ্ধ-লিঙ্গ নারী

বা নরের প্রতি এদের স্বাভাবিক আকর্ষণই থাকে না। হয়ত সেদিককার দৈহিক বা মানসিক সামর্থ্যও যথাপরিমাণ থাকে না। এদের প্রবৃত্তি তাই ধাবিত হয় প্রধানত অনৈসর্গিকতার দিকে।

(অবশ্য প্রত্যেক পুরুষের মধ্যেই আছে কিছুটা জন্মগত নারীত্ব, আবার নারীর মধ্যেও আছে কিছুটা পুরুষত্ব। তার কারণ আদি জীব-কোষ ছিল উভ-লৈঙ্গিক। সেখান থেকে অভিব্যক্তির ধারায় বিশ্লিষ্ট হয়েই, নর ও নারীর পৃথক সত্তা সৃষ্টি হয়েছে। এখন তাই প্রকৃতির সাধারণ নিয়মেই পুরুষ পুরুষ এবং নারী নারী হয়ে জন্মায়।) কিন্তু কদাচিৎ জীব-কোষের স্ব বিরোধী বা অসম ব্যবস্থাপনা ঘটলে, তখনি একসঙ্গে বিপরীতধর্মী গ্রন্থিগুলির ক্ষরণের ফলে হয় এই সব পুং-ভাবাপন্ন নারী ও নারী ভাবাপন্ন পুরুষের আবির্ভাব। হিজড়াদের সঙ্গে এই সব নর-নারীর আদি-প্রকৃতিতে একটা সমধর্মিতা আছে সন্দেহ নেই। মূলগত কারণ উভয় ক্ষেত্রেই যৌনগ্রন্থির অসম সম্মেলন। হিজড়াদের ক্ষেত্রে ঘটে এই অসমতার পরিমাণগত আধিক্য, যার ফলে তারা স্ত্রী-পুরুষের জগা-খিচুড়ী হয়ে ওঠে।

একাদিক্রমে অনেক দিন হিজড়াদের নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, এমন একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, 'ছন্দ, সঙ্গতি, সামঞ্জস্য প্রভৃতি আবয়বিক গুণগুলির এবং দয়া, মায়া, প্রেম, আনুগত্য প্রভৃতি মানসিক গুণগুলির স্ফুরণ যে কত খানি পর্যন্ত সুস্থ ও সহজ প্রবাহিত যৌন-প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে, তা এদের দেখলেই বোঝা যায়। এদের যৌনসত্তা নানা বিরুদ্ধ ধর্মের সজ্মাতে উৎকেন্দ্রিক। তাই কি আকারে, আর কি প্রকারে, কোথাও এরা মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। এদের বিসদৃশ আকৃতি যেন এদের অন্তর-প্রকৃতির দর্পণ স্বরূপ। এদের যৌনাঙ্গ সমূহ নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, যারা মূলত নারী-লক্ষণাক্রান্ত, তাদের দেহে জরায়ু-সম্বলতি স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের সমগ্রতা নেই। মাসিক স্রাব হয় না, মৈথুনের কোন ইন্দ্রিয়গত প্রতিক্রিয়া হয় না, গর্ভ-সঞ্চারও হয় না। যারা পুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত, তাদের জননেন্দ্রিয় অতি ক্ষুদ্র, তার উত্থান হয় না। তা থেকে শুক্রপাতের ঘটনাও ঘটে না বললেই চলে। প্রত্যাশিত কারণেই হিজাড়ারা নানা অ-কর্ম কু-কর্ম করে সমাজের স্বাস্থ্য কলুষিত করে। কারণ তাদের জন্মগত প্রবণতাই তার অনুকূল। তবে সুখের কথা যে হিজড়াত্ব একটা ব্যতিক্রম মাত্র, ওটা মানব-সংসারের স্বাভাবিক অবস্থা নয় এবং ওর গণ্ডীও খুব বৃহৎ নয়'।

দ্বাদশ অধ্যায়

কয়েদী সমাজ

পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব ও অপরাধ-বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে যে জন্মাপরাধী বা স্বভাবদুর্জন বলে কোন জিনিষ পৃথিবীতে নেই। জন্মগত শারীরিক বৈকল্য বা মানসিক অপূর্ণতা হেতু দু-চার জন লোক জড়বুদ্ধি বা অপরাধপ্রবণ হয়ে জন্মাতে পারে এবং সেটা হয় কোন-না-কোন বাস্তব কারণে। অর্থাৎ এঁদের মতে, অপরাধ-প্রবণতা আর অপ্রকৃতিস্থতা অনেকটা একই পর্যায়ের জিনিষ এবং দুটোই চিকিৎসা সাপেক্ষ। আসলে বেশীর ভাগ লোকই অপরাধের প্রবর্তনা পায় সমাজ ও আবেষ্টনীর প্রভাব থেকে। অভাব, অশিক্ষা ও অসংযমের আবহাওয়ায় জন্মালে ও মানুষ হলে, লোকে আপনা থেকেই অন্যায় ও অনুচিত আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারপর অনেক দিনের অভ্যাসে সেই অন্যায়ের প্রবৃত্তি যখন স্বভাবে পরিণত হয়। তখনি আসে সমাজকে, রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়ে দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার রকমারি ফন্দী। প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষা ও সামাজিক অনগ্রসরতাকে বেষ্টন করেই গড়ে উঠেছে বিচিত্র অন্যায়, অনাচার ও কদাচারের ইতিহাস। প্রকৃত পক্ষে এ হল সমষ্টিগত ভাবে সমাজ-চেতনারই বিকৃত প্রতিফলন।

সমাজ যদি ধন-বণ্টনে, শিক্ষা-বিতরণে, সুযোগ-সুবিধা পরিবেষণে, মানুষে-মানুষে অধিকারের মাত্রা সমান করে আনতে পারে, তাহলে আপনিই অপরাধানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা চলে যাবে। মানুষ আপনা থেকেই মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রেরণা পাবে। ভারতের সীমান্তে অবস্থিত আফ্রিদী, মাসুদ, মোহমন্দ প্রভৃতি যে-সমস্ত উপ-জাতিকে স্বভাব-দুর্বৃত্ত নামে অভিহিত করা হয়, তাদেরই জাত-ভাই তাজিক, তুর্কমেন, উজবেক, কিরঘিজ প্রভৃতি জাতিগুলি সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অধীনে এসে আজ রীতিমতো সভ্য মানুষ হয়েছে। কাজেই মানুষের ভালো হওয়া, না হওয়া. সর্বত্র নির্ভর করছে সমাজ-চেতনা সদাচারের অনুকূল হওয়া বা না-হওয়ার ওপর। পঞ্চাশের মন্বন্তরে পঁচিশ লক্ষ বাঙালী নর-নারী অন্নহীন, আশ্রয়হীন হয়ে বিভিন্ন নগর ও বন্দরের পথে প্রাণ হারিয়েছে। তাদের আশে-পাশে ছিল সুসজ্জিত হাট-বাজার, পণ্য-বিপণি, ছিল স্বচ্ছল সমৃদ্ধ গৃহস্থ পল্লী। অনায়াসেই তারা লুঠ-পাট করে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু সামগ্রিক সমাজ-চেতনা তার প্রতিকূল ছিল বলেই, মানুষ নীরবে মৃত্যু বরণ করেছে, খুন-খারাবি ও লুঠ-তরাজে প্ররোচিত হয়নি। এই সমাজ-চেতনা যখন উৎকেন্দ্রিক হল, তখন এরাই

আবার ছে-চল্লিশের রায়টে সাম্প্রদায়িক আক্রোশের উদ্দীপনায় পাইকারি হারে নরহত্যা, নারীহরণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ড সুরু করে দিল। ব্যষ্টি-মনের ওপর সমষ্টিগত সমাজ-মনের প্রভাব কত খানি, এই দৃষ্টান্তেই তা প্রমাণ হচ্ছে। কাজেই সমাজ ও রাষ্ট্র যদি শান্তি, সদ্ভাব ও শুচিতার অনুকূল সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে, অনৈক্য, অবিচাব, অব্যবস্থা ও অবদমনের পীডন থেকে ব্যক্তি-জীবনকে যদি মুক্ত করতে পারে, তাহলে গোষ্ঠী-জীবন স্বাভাবিক নিয়মেই সং হবে, এতে আর সন্দেহ নেই। পৃথিবীর অনেক দেশেই তার পরীক্ষা হয়ে গেছে।

ব্যক্তি-জীবনের এই বনিয়াদকে সংস্কৃত করতে হলে, সমাজের বর্তমান কাঠামো আমূল ভেঙে ফেলতে হবে। মানুষ মাত্রেরই মৌলিক অধিকারকে সমান মেনে নিয়ে, সেই আদর্শে নূতন সমাজ গড়ে তুলতে হবে এবং তদনুযায়ী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সুযোগ-সুবিধার পথ সকলের জন্যে সমান ভাবে অবারিত করে দিতে হবে। তার অভাবই যে প্রধানত এবং প্রথমত অপরাধের উদ্ভবও বিস্তৃতির কারণ, এটা আশা করি বুঝিয়ে বলতে হবে না।

বন্দরে, গঞ্জে, কুলিখোলায়, বস্তিতে, বেশ্যালয়ে, শিষ্টসমাজ থেকে বহু দূরে, অন্ধ গলির অন্ধকারে, শিক্ষা-দীক্ষা বিবর্জিত গ্রামের উপেক্ষিত কোণে, লক্ষ লক্ষ লোক কি ভাবে দিন যাপন করে, এ যাঁরা জানেন, তাঁরা অনায়াসেই বুঝবেন, চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, নারীহরণ ও ব্যভিচার জাতীয় অপরাধেব গণ্ডী কেন দিনের পরে দিন এত বেড়ে যাচ্ছে। আগেই বলেছি, জন্মগত বৈকল্য ও বিকৃতি বশে অন্যায় করে অতি অল্প লোক। বেশীর ভাগই করে অভাব, অশিক্ষা ও অনগ্রসর সমাজ-চেতনার প্রভাবে। অর্থাৎ অপরাধের আদি-সূত্র নিহিত রয়েছে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই। দুর্নীতিগ্রস্ত শ্রেণী-শাসন ও তার পৃষ্ঠপোষিত অধিকতর দুর্নীতিগ্রস্ত ধনতন্ত্র এই অনগ্রসর সমাজ-ব্যবস্থাকে আপন স্বার্থেই জীইয়ে রেখেছে। কোটি কোটি ধনহীন, দেহশ্রমজীবী যদি মানুষ হয়, মানুষের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হয়, তাহলে ত সব ক্ষমতাই চলে যাবে তাদের হাতে। তাদের পুরুষের মেহনৎ এবং নারীর ইজ্জত দু-হাতে ভাঙিয়ে বড়লোকী ও ভদ্রলোকী বজায় রাখা যাবে না। কাজেই বাইরে শান্তি, সুনীতি ও সদ্ভাব প্রচার করতে হবে, অথচ সমাজ ও রাষ্ট্রের যে ভিত্তিমূলক সংস্কার হলে সেটা বাস্তবে রূপ নিত, তাকে কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না · এই হল বর্তমান সমাজ-বিন্যাসের মূল নীতি।

এ আবহাওয়ায় এক দিকে মানুষ যাতে অন্যায়, অনাচার ও অপরাধের অবাধ অধিকার পায় দিনের পর দিন তার পোষকতা করা চলছে, অন্যদিকে তাকে জেল, জরিমানা ও জুলুম-জবরদস্তি দিয়ে ঠাণ্ডা করার আয়োজনই চলছে। জেলে এনে, কয়েদীকে উর্দি-তক্তি পরিয়ে সরকার সেলাম করানো, ঘানিতে, চাকিতে, গুমটিতে, বাগিচায় খাটানো, সেই সঙ্গে কিছু আহার ও প্রচুর প্রহার দেওয়া, এ-ই হল অপরাধকারীদের সম্বন্ধে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রের একমাত্র করণীয়। অথচ এদের আড়ালে দাঁড়িয়ে, এদের হাত দিয়ে, অথবা এদের ঘাড় ভেঙে, মেয়েচালানী, চোরাই মাদক, জাল, জুয়াচুরি ও শয়তানীর খেলা খেলছে যে শত-শত বুদ্ধিমান ক্ষমতবান লোক, সমাজ এবং রাষ্ট্র তাদের সম্পর্কে জেনে-শুনেই উদাসীন রয়েছে। এর পরিণাম আর কি হবে ?

জেলে অবস্থিত কয়েদীদের জীবন একটা মস্ত অনুসন্ধানের বস্তু। কিন্তু সমগ্র ভাবে সে-জীবন আমার আলোচনার অন্তর্গত নয়। আমি শুধু এই অবরুদ্ধ জীবনের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করব। সাধারণ ভাবে সকলেই মনে করেন, অপরাধীকে লোকালয় থেকে সরিয়ে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে আটকে রাখলেই, সমাজের সব দায়িত্ব চুকে যায়। সেখানে নিয়মানুবর্তিতার ভেতর থেকে এবং নিগৃহীত হয়ে, অপরাধী হয় প্রাণের দায়ে দুষ্প্রবৃত্তি পরিহার করে নয় ভেতর থেকেই তার মনে পরিবর্তনের হাওয়া-আসে। কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞানীরা বিশেষত কারা-কর্মীরা জানেন, ব্যাপারটা বাইরে থেকে যত সহজ দেখায়, আসলে তত সহজ নয়। চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, নারীহরণ, ব্যভিচার, এ সবের দরুণ দণ্ডিত কয়েদীরা জেলে এসে প্রত্যক্ষ ভাবে এই সব দুষ্কৃতি করার সুযোগ পায় না। কিন্তু এই সব অপরাধের প্রবৃত্তি দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে যাদের ভেতর বদ্ধমূল স্বভাবে পরিণত হয়েছে, তারা বিবিধ বিকট ও বিকৃত পথেই এগুলোকে ব্যক্ত করতে থাকে। যে মনস্তত্ব সম্মত উপায়ে সংস্কার ও সংশোধনের ব্যবস্থা থাকলে, এদের মূলগত প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে পারত, আমাদের জেল-শাসনের তার কোন আয়োজন নেই। তাই ক্রমবর্ধমান অবদমনের চাপে অপরাধ-বৃত্তিই এদের উত্তরোত্তর আরো বলীয়ান, আরো বীভৎস হয়ে ওঠে।

দুর্দান্ত ও হৈ-হুল্লোড়কারী কয়েদীকে জেলে স্বতন্ত্র করে রাখার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শান্ত, অথচ দুষ্প্রবৃত্তি সম্পন্ন কয়েদীদের আচার-আচরণে বাইরে থেকে বিসদৃশতা কিছু দেখা যায় না বলে, সর্বসাধারণের সঙ্গে এক করে রাখা

হয় তাদের। তার ফলেই যে-সব কয়েদী সংশোধিত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারত, তারাও জেল থেকে কতকগুলো নূতন কদাচার ও কু-শিক্ষা সঙ্গে করে নিয়ে আসে এবং বলাই বাহুল্য, তার উৎপাতে সমাজ-জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা আরো বেশী করে বিধ্বস্ত করতে থাকে।

কয়েদী জেলে ঢোকানোর সময় যদি তাদের স্বভাব, প্রকৃতি ও প্রবণতা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকত, কে অভ্যস্ত অপরাধী, কে আকস্মিক উত্তেজনায় বা সাময়িক বিভ্রান্তির ফলে অপরাধ করেছে, তা নির্ধারণের যদি বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা থাকত, সেই অনুসারে তাদের যদি বিশেষ-বিশেষ শ্রেণীতে রাখার ও সংশোধিত করার উদ্যম হত, তাহলে ভালোরা আরো ভালো হত, মন্দেরাও যথাসম্ভব ভালো হবার প্রেরণা পেত। দুঃখের বিষয়, আমাদের জেলখানা-গুলো হল নিতান্ত আটকে রাখার খোঁয়াড়, সংশোধিত করার প্রতিষ্ঠান নয়। তাই অপরাধীর মনকে বাদ দিয়ে, সেখানে শুধু তার দেহকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। তারি ওপর সংশোধন ও সংস্কারের সবটুকু আয়োজন চাপানো হয়।

এক দিনের অবিবেচনায় যে হঠাৎ চুরি করেছে এবং তার ফলে ধরা পড়ে জেলে এসেছে, পাকা চোরের সংসর্গে এসে জেলে সে সেরা চোর হয়। কি করে তালা কাটতে হয়, সিঁধ বসাতে হয়, সিন্দুক খুলতে হয়, পকেট মারতে হয়, গা থেকে গয়না, হাত থেকে ঘড়ি খুলে নিতে হয়, এ-সবের শিক্ষা কাঁচা চোরেরা জেলখানাতে পেয়েছে, এ বহু জনের স্বীকৃতিতে পেয়েছি। আকস্মিক উদ্ভ্রান্তির ফলে হঠাৎ কেউ নরহত্যা বা নারী-নির্যাতন করে কারাদণ্ডিত হলে, দণ্ডলাভের দরুণ অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ জেলে নেই। অপরাপর ঘাগী অপরাধীরা তাকে এমন ভাবে তালিম দিতে থাকবে যে সে আরো ভালো করে অন্যায় ও অনাচারে দীক্ষিত হবে। মানব-দেহের কোন অংশে আঘাত করলে মুহূর্ত মধ্যে জীবনান্ত হয়, পানীয় জলের সঙ্গে কি খাওয়ালে মানুষ সঙ্গে-সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে, এ-সবের অনেক কল-কৌশল কারা-কক্ষে শেখানো হয়। শুধু বলে শেখানো নয়, যথাসম্ভব হাতে-কলমে শেখানোর জন্যেও কয়েদী-সমাজে রকমারি উপায়-উপকরণ প্রচলিত আছে।

এক জেল-ঘুঘুর স্বীকৃতিতে পেয়েছি, সে যখন বাইশ বছরের যুবক, তখন এক দোকানের ক্যাশ ভেঙে ধরা পড়ে। তাতে তার জেল হয়। তারপর জেলে এসে সে ইসারত আলি নামক এক মহামহোপাধ্যায় চোরের সাগরেদী লাভ করে। এই সাগরেদীর প্রভাবে পরবর্তী কালে সে মস্ত এক গাঁঠকাটা

দলের সর্দার হয়ে ওঠে এবং চুরি, বাটপাড়ী, নরহত্যা, নারীহরণ, এমন কোন অপরাধ নেই, জীবনে যা সে না করেছে। রকমারি যন্ত্রপাতি, ঔষধ-পত্র ও তাক-বাক জানে সে, যা সব তার এই জেল-গুরুর কাছে শেখা। বার চারেক জেল খেটেছে। দু-এক বার পলাতকও হয়েছে। পুলিশ আবার তাকে খুঁজে বের করেছে। সে বলে, সবই হল বুদ্ধির খেলা বাবু, বুদ্ধি দিয়ে যে যাকে হারাতে পারে!

জেল-পলাতক আর এক দাগী আসামীর আত্মকাহিনী শুনেছিলাম। পরিধেয় বস্ত্র থেকে সুতো উঠিয়ে নিয়ে, পাক দিয়ে দিয়ে সেই সুতোর দড়ি তৈরি করা এবং মুখের লালা লাগিয়ে লাগিয়ে সেই সুতোর সাহায্যে তিন মাসে জানালার তিনটি গরাদ কাটা, তারপর রোয়াকে আধ-ঘুমন্ত ওয়ার্ডারের মুখ বেঁধে ফেলে, মাল গুদামের ছাদ ডিঙিয়ে উঁচু প্রাচীর টপকানোর সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী সত্যিই উপভোগ্য। লোকটি নোয়াখালির। সরিকানি মামলায় কাকে খুন করে জেল খাটছিল। গোঁসাই নামে এক ব্যক্তি জেলে তাকে এবং আরো পাঁচ জনকে তালিম দিয়ে, এই ভাবে পলায়নে উৎসাহিত করে। গোঁসাই নিজে কিন্তু তাদের সঙ্গে পালায় নি। কেন এই প্রশ্নের উত্তর সে বলল, বাবু, তিনি মহৎ লোক, অন্যদের জেল থেকে বের করে দেওয়াই তাঁর কাজ। তিনি কি আর নিজের কথা ভাবার সময় পান?

এই গোঁসাইয়ের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অপরাধীরাই অপরাধী-সমাজের দলপতি হয় এবং তাদের যা-কিছু শিক্ষা-দীক্ষা, সব লাভ হয় এই শ্রেণীর লোকদের কাছে। পচা বলে আর এক জেল-ঘুঘু জেলে কি ভাবে তারা একটা 'ছুঁচো' কয়েদীকে হত্যা করেছিল, সেই প্রসঙ্গে এমনি আরো দু-জনের কথা বলেছিল। এই দু জন কয়েদী ওয়ার্ডারদের সঙ্গে জোগ-সাজোসে জেলের ভেতর আফিং চরস ও বিড়ি আমদানি করত এবং অন্যান্য অপরাধীদের ভেতর তা বণ্টন করে তাদের বশীভূত রাখত। এদের দু-জনই ছিল মেট, চাকিতে ঘানিতে বাগানে, কয়েদী খাটাত। এই সুযোগে সিপাইদের তদারকে কোন-কোন দিন এরা জেল-ফটকের বাইরে যেত। এক দিন বাইরে কয়েদী খাটানোর সময়, বাগানের সংলগ্ন আমলা-কোয়ার্টারে ডাক্তার বাবুর তরুণী স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে, দু-জনেই একযোগে অশ্লীল অঙ্গ-ভঙ্গী করে যা-তা বলতে থাকে। এই ঘটনা নিয়ে তদন্ত হলে, সমস্ত কয়েদী নির্বিবাদে মিছে কথা বলল। শুধু একটি ছেলে করে দিল দু-জনকে সনাক্ত। তার ফলে দু জনকে খেতে হল প্রচণ্ড মার।

এর পরই কয়েদীদের বৈঠক বসল। ঠিক হল, দুষমনটাকে শেষ করতে হবে। দুই নেতার নির্দেশক্রমে সাগরেদরা গভীর রাত্রে কম্বল চাপা দিয়ে, কিলিয়ে কিলিয়ে শেষ করে দিল তাকে। পচা বলল, এইখান থেকেই নাকি তার মানুষ মারায় হাতে-খড়ি। আগে সে চুরি ছাড়া আর কিছু করেনি। চুরির ব্যাপারেও কায়েমি শিক্ষা সে পেয়েছিল জেলে। গলার ভেতর পয়সা রাখার থলি বানানোর জন্যে এসিড-মাখানো সিসের বল গেলার যে-কাহিনী সে বলেছিল, অন্যান্য পাকা চোরের মুখেও তা শুনেছি। মোটের ওপর এই হল জেলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। অপরাধীকে আরো অপরাধী করার পীঠস্থান রূপেই আমাদের জেলখানা গুলি প্রসিদ্ধ।

অন্যান্য অপরাধের মতো জেলের ভেতর যৌনাপরাধেরও আতিশয্য দেখা যায়। বোধহয় সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও সর্বপ্রকার মানবিক কর্তব্য থেকে অপসারিত করে রাখার ফলেই, কয়েদীদের ভেতর দুষ্প্রবৃত্তির তাগিদ এত দুর্দম হয়ে ওঠে এবং সুস্থ ও স্বভাবসম্মত উপায়ে তাকে তৃপ্ত করা সম্ভব হয় না বলে, তা ধরে বিকৃতি ও বৈকল্যের পথ। এ-পথেও সর্দার-শ্রেণীর আসামীরাই হয় অন্যদের পথপ্রদর্শক। তারপর অন্যায়ের আকর্ষণ আপন গতি-বেগেই সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়। খুনী মামলায় ধৃত ও দণ্ডিত উনিশ বছর বয়স্ক এক বালকের জবানবন্দীতে এই তথ্যটি প্রমাণিত হবে। প্রথম কারাদণ্ডিত হয়ে ছেলেটি বড়ই ভেঙে পড়েছিল। দিন-রাত্রি চুপচাপ বসে থাকত, কাঁদত। এই ভাবে দিন তিনেক যাবার পর একদিন দুপুরে বছর-পঁয়ত্রিশ বয়স্ক এক মুসলমান কয়েদী তাকে ইসারায় ঘানিশালের পার্শ্ববর্তী গলিতে ডেকে নিয়ে যায় এবং সমবেদনা সহকারে তার সব কথা শুনতে চায়। সহানুভূতির স্পর্শে ছেলেটি বিগলিত হয়ে পড়ে এবং অকপটে তার কাছে আপন অপরাধের কাহিনী ব্যক্ত করে।

এই থেকে দুজনে আলাপ জমে ওঠে। অন্যান্য কয়েদীদের কাছে জিনিষটা বেশী দিন চাপা রইল না। তারাও সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে লাগল। অবশেষে প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় অন্য ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত হয়ে তবেই সে অব্যাহতি পায়।

বাহান্ন বৎসর বয়স্ক আর একটি কয়েদী একুশ বৎসর বয়স্ক এক নমঃশূদ্র যুবকের সঙ্গে অবৈধ বন্ধুত্ব করে। যুবকটি ছিল নিতান্ত নির্জীব প্রকৃতির। ধূর্ত বুড়োর কবলে পড়ে যন্ত্রের মতো সে তার আদেশ-নির্দেশ পালন করত। ওয়ার্ড

বদলের দরুণ কিছুকাল পরে দু-জনে ছাড়াছাড়ি হলে বুড়ো উন্মাদ হয়ে ওঠে। একদিন পগারের কাছে যুবকটিকে পেয়ে সে বলে যে সে যখন তাকে হারাবেই, তখন আর এ পৃথিবীতে সে রাখবে না তাকে। এরপর কুড়িয়ে-পাওয়া এক টুকরো লোহার বাতা ঘষে বানানো ছুরি নিয়ে সজ্জীব ক্ষেতে সে আক্রমণ করে যুবকটিকে। একটা চোখ তার নষ্ট হয়ে যায় এই ধাক্কায়। যুবকটির নাম বিষ্ণু, বাড়ী ফরিদপুর জেলায়।

আর একটি ছোকরা কয়েদী বিড়ি, আফিং, চিনি ও পান অদ্ভুত উপায়ে জেলের ভেতর সংগ্রহ করে আনত। অনুসন্ধানে জানা গেছে, একাধিক ওয়ার্ডারের সঙ্গে তার দোস্তি ছিল। তারি বখশিস রূপে এই সব দুর্লভ সামগ্রী জুটিয়ে আনত সে। এই সব অমূল্য উপঢৌকনের লোভই বেশীর ভাগ কয়েদীকে তার প্রতি আকৃষ্ট করত। এই ছোকরাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েক দিন জল-ভারী ও ভৃত্যরূপে তাঁর বাড়ীতে কাজ করিয়াছিলেন। সেই সময় সে নিদারুণ একটা অপরাধ করে বসে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নয়-দশ বৎসর বয়স্কা মেয়েকে কল-ঘরে একা পেয়ে সে তার ওপর কদর্য ব্যবহার করে। ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে যেতে, তাকে ভীষণ দণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্বৃত্ত তাতে অনুতপ্ত না হয়ে, আপন কেরামতি নিয়েই জাঁক করতে থাকে।

শুধু পুরুষ-কয়েদীদের মধ্যেই এই সব অনাচার প্রচলিত আছে তা নয়। নারী-কয়েদীরাও এ বিষয়ে সমান ওস্তাদ। তবে মেয়েদের ওয়ার্ডে পুরুষ সিপাই বা ওপরওয়ালার আনাগোনা কম। পুরুষ কর্মচারী, মেট, ধাঙড় প্রভৃতিও যায় অল্প। তাই তাদের বিকৃতি ও অপরাধের প্রসঙ্গ সচরাচর জানার সুবিধা হয় না। কিন্তু যাঁরা একটু বিশদ ভাবে অনুসন্ধান করেছেন, জমাদারণী, মেথরাণী, লেডী ডাক্তার ও নার্সদের কাছে এবং জেল মুক্ত মেয়ে কয়েদীদের কাছে, তাঁরা এ মহলেরও প্রভূত তথ্য পেয়েছেন, যা সমান বীভৎস ও ন্যক্কারজনক।

খুনী মামলায় জড়িত একটি মেয়ে কয়েদী একবার পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে। প্রথমে লেডী ডাক্তার, পরে পুরুষ ডাক্তার চিকিৎসা করলেন। কোন ফল হল না। শেষে জমাদারণী অসুখের কারণ বের করল। একটি কৃত্রিম প্রজননাঙ্গ তৈরী করে ব্যবহার করার সময় তার খানিকটা ভেঙে যায় এবং তাতেই হয় তার এই বিপত্তি। মূত্র-কৃচ্ছ্রতায় আক্রান্ত আর একটি যুবতী কয়েদীরও প্রায় একই ব্যারাম হয়েছিল। সে সেলের চাতালে বসে দো-তলার বারান্দায় বিচরণশীল রাজ-বন্দীদের দেখিয়ে দেখিয়ে নানা অশালীন

আরচণ করত। তাদের দু-এক জন সেদিকে তাকালে, সে জঘন্ত অসভ্যতা করত।

পশ্চিমবঙ্গের কোন সাব-জেলে একটি বিড়াল নিয়ে দুই মেয়ে কয়েদীর মধ্যে যে মারামারি হয়, তাতে আর একটি অভাবনীয় তথ্য পাওয়া যায়। আশ-পাশের গৃহস্থ-পল্লী থেকে এক বিড়াল প্রাচীর টপকে মাঝে মাঝে মেয়েদের মহল্লায় আসত। এক ত্রিশ বৎসর বয়স্কা গোয়াল-বৌ বিড়ালটিকে আপন খাদ্যের ভাগ দিয়ে দিয়ে এমন বশীভূত করল যে বিড়াল তার একান্ত অনুগত হয়ে পড়ল। দুঃখের বিষয়, অকৃতজ্ঞ বিড়াল হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হল। কয়েক দিন পথ চেয়ে থাকার পর একদিন গোয়াল-বৌ দেখল, এক হিন্দুস্থানী মেয়ে কয়েদী তাকে কোলে নিয়ে আদর করছে। সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালের মালিকানা নিয়ে কলহ। ক্রমে তাই থেকে কিলোকিলি ও চুলোচুলি। অবশেষে লেডী সুপার এলেন এবং উভয়কে মার-ধোর করে শান্ত করলেন। এই সূত্রে জানা গেল যে গোয়াল-বৌ বিড়ালকে লেহনাত্মক সাহচর্যে নিযুক্ত করত। পতিতা ও বিধবা মহলে বিড়ালের যে আদর দেখা যায়, তার পেছনেও হয়ত এই রকম একটা কিছু ব্যাপার আছে। যাই হক, সে-কথা আপাতত থাক।

কিন্তু মেয়ে কয়েদীদের মধ্যে সমাসক্তির রেওয়াজই সব চেয়ে বেশী। এত বেশী যে তার শতকরা অনুপাত নির্ধারণ করতে গেলে, ফাঁপরে পড়তে হবে। ধান চুরির অপরাধে কারাদণ্ডিত এক আঠারো বছরের বাল্যবিধবা, কারামুক্ত হয়ে কোন ব্যক্তির কাছে বলে যে জেলে সে বাড়ীর চেয়ে ঢের বেশী আদরে ছিল। অধিকাংশ মেয়ে কয়েদী তাকে ভালোবাসত। তার সঙ্গে আলাপ-আলাপন করে তারা বিশেষ সুখী হত। দু-একটা ঝগড়াটে বুড়ী ছাড়া প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে সে অন্তরঙ্গতা করেছে, যে হেতু সকলেই ছিল তার রূপের অনুরাগী। চলে আসবার সময় সকলেই তার জন্যে ভীষণ কেঁদেছে।

পক্ষী বলে একটি বছর-আটাশ বয়সের তাঁতী বৌ তার ভাসুরের হত্যা সম্পর্কীয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করে। এই মেয়েটি কোন কারণে আঁচল গলায় জড়িয়ে জেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু অন্যান্য মেয়ে কয়েদীর হস্তক্ষেপের ফলে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায় তার জীবন। এই প্রসঙ্গে জুলুম-জেরা করা হলে, সে স্বীকার করে যে কালো বলে একটা মেয়ের সঙ্গে তার ভাব ছিল। এখন সে তাকে ছেড়ে এক বাগ্দী মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছে। এরপর আর সে কি সুখে বাঁচবে? কালো প্রথমে কিছুই ভাঙতে চায় নি।

শেষে সংক্ষেপে উত্তর দেয় যে যাকে তার ভালো লাগে, তার সঙ্গে সে ভাব করবে, তাতে ওর কি ? ভাবের প্রকৃতি ও পদ্ধতি নিয়ে জেরা করা হলে, সে বলে, সবাই যা করে, আমারও তাই করি। এরপর দুটি মেয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌনাচরণ সম্পর্কে যে নোংরা পারিভাষিক শব্দটি প্রচলিত আছে, তাই ব্যবহার করে সে জিজ্ঞাসাকারীদের মুখ চুপ করিয়ে দেয়।

এক মিশনারী মহিলা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে কোন জেলের নারী বিভাগে সপ্তাহে একদিন করে নীতি ও ধর্মোপদেশ দিতে যেতেন। তিনি ছিলেন মধ্যবয়স্কা, সুন্দরী, সুশিক্ষিতা। ভালো বাংলা বলতেন। প্রত্যেকটি মেয়ে কয়েদীর সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতেন। খুঁটিনাটি করে তাদের সব কথা শুনতেন। এঁর অভিজ্ঞতা ইনি কোন সমাজ-বিজ্ঞানীকে এক দীর্ঘ পত্রে লিখেছিলেন। তাতে ইনি বলেছেন, 'দরিদ্র ও অনুন্নত ঘরের মেয়েরাই সাধারণত চুরি, ডাকাতি ও খুনের মামলায় পড়ে জেল খাটে। তারা প্রায় সকলেই নিরক্ষর, অশিক্ষিত এবং আত্মচেতনাহীন। জেলের বদ্ধ আবহাওয়ায় এবং নীতি-বিগর্হিত আবেষ্টনীতে পড়ে তারা আরও বেশী বিপথগামিনী হয়। কলহ, কু-ভাষণ ও কদাচার তাদের একমাত্র অবলম্বন। আর সমস্ত মানবিক বৃত্তি তাদের যেন মারা গেছে, তাই কামবৃত্তিটাই তাদের কাছে হয়ে উঠেছে সর্বস্ব।

'একটি মেয়েকে আমি খুব স্নেহ করতাম। বেশ ভালো মেয়েই ছিল সে। কিন্তু হঠাৎ একদিন একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার কাছেই সে অনুচিত প্রস্তাব করে বসল। বুঝতে পারলাম, সে ওতে অভ্যস্ত হয়েছে। দুটি গ্রাম্য বধূ আমার কাছে অনেক দুঃখের কথা বলত। একদিন তাদের দু-জনকে একটা পরিত্যক্ত কোণে কুশ্রী ভাবে বসে থাকতে দেখলাম। * * * জেল-শাসন আমূল পরিবর্তিত ও সংস্কৃত না হলে, এখানে নর-নারীকে সংশোধনের জন্যে পাঠিয়ে সমাজ অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। এগুলি পাপের লীলা নিকেতন। যারা এখানে আসে, তারা পাপী, যারা তাদের নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করে, তারাও পাপী। নইলে ওপরওয়ালা কর্মচারীদের উপদ্রবে বন্দিনী মেয়েদের সন্তান-সম্ভাবনা হয় কেন ? কেনই বা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী ও তরুণী বন্দিনীরা আর সকলের চেয়ে বেশী সুযোগ-সুবিধা পায় ?'

এঁর এই চিঠিতেই একটি বছর-চোদ্দ বয়সের ধাঙড় ছেলে মেয়ে-জেলে পড়ে কি ভাবে তিন-চারটে মেয়ে কয়েদীর দ্বারা প্রত্যহ আক্রান্ত হত, তার কাহিনী

পেয়েছি। এই হল জেলে অবরুদ্ধ নারী কয়েদীদের জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

জেলে অবাস্থিত মেয়ে কয়েদীর বে-আইনী সন্তান সম্ভাবনা হওয়া এবং জেল তদারককারীদের তরফ থেকে আত্ম দোষ স্খালনের উপায় হিসাবে গর্ভপাত করানোর একটা ঘটনা সংগ্রহ করা গেছে। জেল থেকে রাত্রিযোগে চুপি চুপি মেয়ে কয়েদীকে কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়ার এবং কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, সে মেয়েকে আর বাড়ী ফিরতে না দেওয়ার একটা ঘটনাও আছে। তবে সাধারণত এটা হয় জেলে কোন লক্ষণীয় চেহারার মেয়ে এসে পড়লে। কিন্তু তার সংখ্যা খুব কম, তাই এ ব্যাপার বেশী হয় না। এক ভদ্রতরুণী একটি ফৌজদারী মামলায় জড়িত হয়ে জেল হাজতে গিয়েছিলেন। কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এজাহার নেওয়ার অজুহাতে তাঁর দেহ স্পর্শ করেন এবং তাঁর কাছে কু-প্রস্তাব করেন। এর ফলে তাঁর ভাগ্যে লাভ হয় চপেটাঘাত। তারপর মেয়েটি কারাদণ্ডিত হলে, ঐ ভদ্রলোকের নির্দেশক্রমে ওয়ার্ডাররা তাঁর মাথার চুল কেটে দেয় এবং তাঁকে অনাবৃত-দেহ করে সবসমক্ষে কুৎসিত ভাবে লাঞ্ছিত করে। জেল-শাসনের এই বর্বর আদিমতাই যে কয়েদীদের মধ্যে অধিকতর বিকৃতি ও বৈকল্যে রূপায়িত হবে, এতে আর বিস্ময়ের কি আছে ?

মেয়ে জেলের মতো বাচ্চা জেলের ভেতরকার খবরও বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান যোগ্য। যে-সমস্ত নাবালক ছেলে-মেয়ে অল্প বয়সের অবিবেচনায়, বা সুপ্ত অপরাধ প্রবৃত্তির বশে, বা আকস্মিক উত্তেজনায়, বা কোন দুষ্ট ব্যক্তির উৎকোচে ও প্ররোচনায় কোন গুরুতর অন্যায় করে ফেলে, তাদের শোধন এবং সংস্কারের জন্য সাময়িক ভাবে তাদের লোকালয় থেকে সরিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে ঠিকই। কিন্তু যে ভাবে জুভিনাইল জেলে তাদের রাখা হয়, তাতে অপরাধী ছেলে-মেয়ের নৈতিক বা মানসিক কোন উন্নতি ত হয়ই না, উপরন্তু তাদের মধ্যে নানা ধরণের দুষ্প্রবৃত্তি, বিকৃতি ও কদাচার আরো বেশী করে সংক্রামিত হয়। নমনীয় ও সহজ পরিবর্তনশীল বয়সে ছেলে-মেয়ের মনে অপরাধের প্রবণতা যেমন প্রবল থাকে, সেই অপরাধকে ছাপিয়ে উঠে সৎ হওয়ার প্রবণতাও থাকে তেমনি প্রবল। একমাত্র জড়বুদ্ধি বা অপ্রকৃতিস্থ ছেলে-মেয়েরাই এর ব্যতিক্রম।

সুতরাং পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের আলোতে তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করলে, এই সমস্ত অপরাধী ছেলে-মেয়েকে সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে উপযোগী

করে গড়ে তোলা হয়ত কঠিন নয়। কিন্তু অর্ধ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের হাতেই থাকে এই সব শিশু অপরাধীকে মানুষ করে তোলার ভার। তাই যখন জুভিনাইল জেল থেকে বা তার পরবর্তী After-Care Society থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তারা বাইরে আসে, তখন তারা হয়ে আসে এক-একটি নম্বরী বদমায়েস। যে অপরাধ তারা হঠাৎ একদিন করে ফেলেছিল, সেই অপরাধকে অতঃপর তারা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে। নিজস্ব অনুসন্ধান অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি এই ধারণা করি যে বোর্ষ্টালের আমূল সংস্কার হওয়া উচিত। অথবা বাচ্চা-জেল উঠে যাওয়া উচিত। অন্যান্য দেশে বোর্ষ্টাল হল একাধারে কারিগরী বিদ্যালয় ও মনঃসমীক্ষণের ল্যাবরেটারী। অন্তত তার আদর্শ তাই। কিন্তু আমাদের দেশে শিশু-জেল পশু-পালনের খোঁয়াড় ছাড়া কিছু নয়। লাঠিই যেখানে শিক্ষাদানের একমাত্র উপায়, বেঁধে রাখাই যেখানে মানুষ করার একমাত্র বিধি, সেখানে চোর অধিকতর চোর, খুনী অধিকতর খুনী ছাড়া আর কি হবে?

চোদ্দ বছর বয়স্ক একটি ছেলে প্রতিবেশী একটি আট বছরের মেয়েকে কাঁচা আম পেড়ে দেবার নাম করে বনে নিয়ে গিয়ে, তার উপর অত্যাচার করে। মেয়েটি ঘটনা সকলের কাছে প্রকাশ করে দিলে, ছেলেটিকে ধরা ও মার-ধোর করা হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, এক নষ্টচরিত্রা বুড়ী তাকে ছোটবেলা থেকেই যৌনাচারে অভ্যস্ত করেছে। ছেলেটির সংশোধনার্থে তাকে শিশু-জেলে পাঠানো হল। আঠারো বছরে বেরিয়ে এসে আবার এক দরিদ্র রজক-কন্যার ওপর বলাৎকার করে ধরা পড়ল সে। জেরা ও জবরদস্তির ফলে জানা গেল, জেলে সে বাগানের কাজ করত। কর্তব্য অবহেলার দায়ে তাকে এবং আর দুটি ছেলেকে একদিন সব্জী-বাড়ীর এক কুঠরীতে তালাবন্ধ করে রাখা হয়। সন্ধ্যার সময় কয়েক জন পাইক সেই ঘরে আসে এবং দণ্ডদানের নাম করে অপরাধী তিন জনের ওপর কুৎসিত উপদ্রব করে। এখান থেকে সুরু করে সমগ্র জেল-জীবনটাই সে এই উৎপাত সহ্য করেছে। সুতরাং জেল থেকে সে সুশিক্ষা বা সদাচারের কোন পথ্যই নিয়ে আসেনি। কাজেই ছাড়া পেয়ে আবার সে দুষ্ক্রিয়া করবে, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

আর একটি ছেলে তার মাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। সেই আঘাতে তার মা'র মৃত্যু হলে, সে ঘরের চালে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বাড়ী থেকে পালায়। অবশেষে তাকে পুলিশে দেওয়া হয়। জবানবন্দীতে সে বলে যে

তার মা ছিল অতিশয় নিষ্ঠুর। তাকে খেতে দিত না। অসুখে দেখত না। রাত্রে তাকে ঘরে তালা দিয়ে রেখে কোথায় চলে যেত। দীর্ঘদিন সহ্য করে করে অবশেষে অসহ্য হয়ে যেতে, সে মাকে হত্যা করেছে এবং ধরা পড়ার ভয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বছর তেরো বয়সের এই ছেলেটিকে জেলে পাঠানো হল। জেলে সে প্রথমে একটি ছেলেকে ছুঁচলো বাতার খোঁচা মেরে আহত করল। তারপর এক মেথরাণীকে ইট মেরে খোঁড়া করল। অবশেষে আর একটি বছর দশেকের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে জেল থেকে জানালা ভেঙে পালাল। দ্বিতীয়বার এক নারীহত্যা করে সে জেলে এল। এই নারীটি তাকে ও তার সঙ্গের ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে সে দেখল, ঐ নারীর স্নেহ যেন তার চেয়ে তার সঙ্গী ছেলেটির ওপর বেশী। এই অপরাধে সে মহিলাকে হত্যা করল এবং ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে পালাবার পথে আবার ধরা পড়ল। ঈর্ষা ও অস্য়াজনিত মনোবিকারে আক্রান্ত এই ছেলেটিব বয়স যখন পনোরো, তখন তাকে দেখি। মেয়েদেব ওপর সে ভীষণ ক্রুদ্ধ। কোন মেয়েকে সামনে দেখলেই সে ঘুষি ও লাথি দেখাত, ঢিল ছুঁড়ত। এমন কি, গাভী, ছাগী প্রভৃতিকেও অকারণ প্রহার করত। অন্যান্য বিষয়ে ছেলেটি ছিল বেশ স্বাভাবিক। বিয়ে করার প্রসঙ্গে একদিন বলেছিল, আমি যদি বিয়ে করি ত ব্যাটাছেলে বিয়ে করব।

একটি বছর-বারো বয়সের মেয়ে তার আট বছরের বোনকে কূয়ায় ঠেলে ফেলে দেয় এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়। এই বালিকা হত্যাকারিণীকে জেলে রাখা হয়। জেলে সে চুপচাপ থাকত, কোন প্রশ্নের উত্তর দিত না। এমন কি, চাবুক হাঁকালে পর্যন্ত টুঁ শব্দ করত না। মাদুর বোনার কাজ খুব দক্ষতার সঙ্গে করত। অনেক চেষ্টার পর তার কাছ থেকে যে কাহিনী বের করা যায়, তা হল এই : ছোট বোনটি সুন্দরী বলে সবাই তাকে আদর করত। যে ছেলেটির সঙ্গে তার বিয়ের কথা হচ্ছিল, সে পর্যন্ত শেষটা ঐ ছোট বোনের দিকে ঢলে পড়ল। তাকে সে ভালো-ভালো খেলনা দিতে লাগল। এক-একদিন বাড়ীও নিয়ে যেতে লাগল। দেখে দেখে বোনের ওপর আক্রোশ ও বিদ্বেষ তাকে পাগল করে তুলল। একদিন কূয়াতলায় এসে দেখল, ছোট বোন দাঁড়িয়ে পাশের শিউলি গাছে নাড়া দিয়ে ফুল পাড়ছে। হঠাৎ তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। এক ধাক্কা দিয়ে বোনকে সে

কুয়ায় ফেলে দিল। এর পরই সে জেলে। জেলের ডাক্তার বলেন, ওর গণোরিয়া আছে। এই রোগে কয়েকটি ছেলেকে আক্রান্ত করার পর ওকে সেলে একান্তরিত করা হয়। এই মেয়েটি আধ-পাগলা অবস্থায় জেল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। তারপর এক বস্তি-অঞ্চলে মন্দ লোকদের সঙ্গে বাস করতে থাকে।

পকেট-মারার অপরাধে ধৃত একটি ছেলে ও একটি মেয়ে একযোগে তিনবার চুরি করেছিল। অফিস-ঘর থেকে এক বাবুর ফাউণ্টেন পেন, কাগজ চাপা দেওয়া একটি কাঁচের বল, অন্য এক বাবুর ওয়াটার-প্রুফ ইত্যাদি জিনিষ দফায় দফায় চুরি করে তারা পায়খানা, মালগুদাম ও নর্দমায় লুকিয়ে রাখত। ধরা পড়ার পর এই চুরির কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা কোন কৈফিয়ৎ দেখাতে পারেনি। স্বভাবসিদ্ধ চুরি-বৃত্তির প্রতিক্রিয়া ছাড়া এটা আর কিছুই না সম্ভবত। যাই হক, এদের দু-জনকে অতঃপর দু-জায়গায় আলাদা করে রাখবার ব্যবস্থা হয়। তাতে দু-জনেই কান্নাকাটি স্বরু করে। একজন অনশন স্বরু করে দেয়, অন্যজন হৈ-হুল্লোড় করতে থাকে। অবশেষে অনুসন্ধানে জানা যায় যে ওরা পরস্পরের প্রতি প্রণয়াবদ্ধ এবং চুরি-বৃত্তিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ওদের প্রেম। ওরা দু-জনে একসঙ্গে ছাড়া পায়। ছাড়া পেয়ে জেল ফটক দিয়ে ওরা সদম্ভে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে যায়। ছেলেটির বয়স তখন সতেরো, মেয়েটির চোদ্দ। জানিনা পরবর্তী জীবনে ওদের কি হয়েছে!

এ পর্যন্ত যত পুরুষ, নারী ও শিশু-কয়েদীর কথা বললাম, তারা প্রধানত চাষী, মজুর এবং অ-ভদ্র শ্রেণীর লোক। মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ যাঁরা কারাদণ্ডিত হন, তাঁদের মধ্যে কারা-জীবনের প্রতিক্রিয়া কি রকম ও কতটা লক্ষ্য করা যায়, সে প্রশ্নও হয়ত অপ্রণিধানযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে একজন বিশেষজ্ঞের চিঠি থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। তিনি বলেন, 'জেলের আবহাওয়ায় শিক্ষিত ভদ্রসন্তান কত সহজে নিম্নস্তরের আসামীর সঙ্গে এক হয়ে যায়, তা দেখে অবাক হতে হয়। সমাজ-জীবনে যারা কোনদিন ছায়াও মাড়াতে পারে না, কারা-জীবনে তারাই অনিবার্য কারণে হয়ে ওঠে পরম বন্ধু। একযোগে চোরাই নেশা খাওয়া থেকে স্বরু করে, কদাচার করা পর্যন্ত, কোন বিষয়ে একে অন্য থেকে পৃথক আচরণ করেনা। জেল এমনি একটি স্থান, যেখানে সভ্যতা, শিষ্টতা, সদাচার,

মনুষ্যত্ব, কোন কিছুর বালাই নেই। এ রকম আবহাওয়ায় আপন সম্মান বা সুনাম রক্ষা করার প্রয়োজন নেই, এই রকম একটা বোধ থেকেই বোধহয় ভদ্রলোক অভদ্র হয়ে পড়ে। অভদ্র হয়ে পড়ে আরো অভদ্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের ভেতর সাধারণত থাকেন ভদ্র সন্তানরা। কিন্তু কথায় কথায় জেল-কোড ভঙ্গ করতে, মিথ্যা অজুহাতে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে, খাদ্য, পানীয় ও পরিচ্ছদের জন্যে কাঙালপনা প্রকাশ করতে তাঁরা এতই তৎপর যে কোনদিন তাঁরা দায়িত্বশীল ও সম্মানজনক গৃহস্থ পদবীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা যেন ভাবা যায় না। অপরাধ এবং অনাচারে এঁরা এমন অভ্যস্ত যে মনে হয়, যেন এঁরা সারা জীবন পতিতা-পল্লীতে বাস করেছেন। সর্বশ্রেণীর কদাচারের প্রভূত দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে এঁদের ভেতর থেকে। জানালা দিয়ে এঁরা রাস্তার লোকদের, গৃহস্থ বাড়ীর ছাদে বা বারান্দায় অবস্থিত নারীদের ইসারা করেন। এঁদের ভেতর পড়ে অল্পবয়সী কয়েদী পিঁজরা পরিবর্তনের জন্যে কাতর হয়। সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী না এলে, ধাঙড় বালক-বালিকারা এঁদের কামরায় ঢোকে না।

'রাজনীতিক বন্দীদের ভেতর যাঁদের একটু নাম-ডাক আছে এবং বন্দী হিসাবে যাঁরা অনেকটা সুবিধাপ্রাপ্ত, তাঁদের কথা অবশ্য ধর্তব্য নয়। কিন্তু সাধারণ রাজনীতিক বন্দীরা বেশীর ভাগই জেলে যা আচরণ করেন, তা সাধারণ কয়েদীদের চেয়ে ভালো নয়। তফাতের মধ্যে এই যে সাধারণ কয়েদীরা কয়েদী বলেই জেল-জুলুমকে অপ্রতিবাদে মেনে নেয়। আর এঁরা রাজনীতিক বন্দী বলে, তা নিয়ে জেলের ভেতর দল পাকান ও হট্টগোল বাধান। জেলার, জমাদার ও ডাক্তারকে প্রহার করা বা জেল-আইন ভঙ্গ করার দরুণ দণ্ড দেওয়া হলে, অনশন ধর্মঘট করা, এঁদের নিত্যকর্ম বিশেষ। অনাচার কদাচারেও এঁরা কারুর চেয়ে কম যান না। মিথ্যা অসুখের ছুতায় হাঁসপাতালে যাওয়া এবং সেখানে নার্সদের সঙ্গে ইয়ার্কি দেওয়া বা জেল-ইয়ার্ডে কিশোর বয়স্ক কয়েদীকে ভুলিয়ে বা জোর করে আনার বহু বিবরণ জেল-রেকর্ডে পাওয়া যাবে। এমন কি, বিখ্যাত ব্যক্তিদের রেকর্ডও এদিক থেকে অনেক সময় বেশ পরিষ্কার নয়। কোন যশস্বী নেতার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি জেলে অনুষ্ঠিত আর এক বিখ্যাত ব্যক্তির অনুচিত আচরণের কাহিনী সুবিদিত। গুপ্ত সাহচর্যের ফলে সন্তান সম্ভাবিতা এক নার্স কোন সুপরিচিত রাজবন্দীর নামে খোর-পোষের মামলা করেছিলেন, এ-ও আশা করি অনেকের মনে আছে।'

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জঙ্গী-মুল্লুকে যৌনাচার

অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই হক, আর অন্য দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েই হক, কোন রাষ্ট্র যখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তখন অনেকানেক সমস্যার মতো যৌন-সমস্যাও তার সমাজ-জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। যুদ্ধের আহ্বানে বয়স্ক ও কর্মক্ষম পুরুষদের খুব বড় একটা অংশ যখন সৈন্য-বাহিনীতে আটক থাকতে বাধ্য হয়, তখন তাদের দিক থেকে যেমন, গৃহে পরিত্যক্ত নারীদের দিক থেকে তেমনি, আসঙ্গ লিপ্সার প্রবল দাবী প্রবলতর হয়ে ওঠে। তার ফলে কি রণক্ষেত্রে, আর কি যুদ্ধ-নিরত দেশের সমাজ-জীবনে, সর্বত্র একটা অস্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশমান হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তরীণ সৈনিকদের চরিতার্থতা দান একালের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রকাশ্যে অনুমোদন করছে। গৃহ-জীবনে আবদ্ধ সামাজিক নর-নারীদের জন্যে এ রকম প্রকাশ্য স্বীকৃতি না থাকলেও, ব্যাপক হারে অনাচার কদাচারের অনুষ্ঠান ও জারজের আবির্ভাব অনুমোদন করে নিতে হয়েছে সে ক্ষেত্রেও।

যুদ্ধক্ষেত্রে যে-সমস্ত সৈনিক প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে, আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বভাবতই তারা বেপরোয়া। এ অবস্থায় যতটুকু সময় বেঁচে আছে, সেটুকুতে জীবনকে তারা সমগ্র করে ভোগ নিতে চাইবে, এটা খুব স্বাভাবিক। আর এই ভোগের সর্বপ্রধান উপকরণই হচ্ছে যৌন-সঙ্গ। এর যথোচিত সরবরাহ না থাকলে, সৈনিককে কোন রকমে আটকে রাখা সম্ভব নয়। এই জন্যে (মেডিক্যাল-ক্যোর, নার্স-ইউনিট, ভলেণ্টারী শী-ব্যাটেলিয়ন,-গার্ল-গাইড, ক্যানটিন-সিষ্টার,) নানা নামে চিহ্নিত করে যুযুধান সৈনিকদের সঙ্গে বিচিত্র পর্যায়ের নারী-বাহিনী চালান দেওয়া হয় রণক্ষেত্রে। বলা বাহুল্য এদের পরস্পরের মধ্যে অবাধ মিশ্রণ ও আদান-প্রদানে যেমন কোন বাধা থাকে না, তেমনি জন্ম-নিয়ন্ত্রকের ব্যাপক সরবরাহ এই সব আদান-প্রদানের পথকে রীতিমতো সুগমও করে রাখে। আগেকার দিনে পেশাদার পতিতা, ধাত্রী ও অভিনেত্রী নিয়োগ করা হত সামরিক নারী বাহিনীতে, এখন শিক্ষিত নারীরাই এতে স্বেচ্ছায় যোগ দিচ্ছে।

এছাড়া আক্রান্ত বা অধিকৃত দেশ ত আছেই। সেখানে এসে রণোন্মদ সৈনিকরা জোর করে কুল-নারীদের টেনে নিয়ে যায়। অথবা তাদের ঘরে

গিয়ে ঢোকে। প্রথম মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামের পতন হলে, জার্মান সেনাধিনায়করা দাঁড়িয়ে থেকে, মেয়েদের টেনে ঘর থেকে বের করিয়ে এনেছিলেন সামরিক পতিতালয়ে। দশ-বারো বছরের নাবালিকারা পর্যন্ত পরিত্রাণ পায়নি সেই বাধ্যতামূলক পতিতা-বৃত্তি থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলগুলি থেকে জার্মানরা মোট কত মেয়ে টেনে এনেছে, রুশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে তার সরকারী হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে। শুধু জার্মানরা নয়, যে-কোন দেশের বিজয়ী সেনারাই এ কাজ করে। প্রাচীন যুগে ও মধ্যযুগে অধিকৃত দেশের নারীদের সদল-বলে ধরে নিয়ে যাওয়া হত। যুবতীদের যথেচ্ছ উৎপীড়ন করার পর প্রকাশ্য বাজারে বিক্রী করে দেওয়া হত, নয়ত দরাজ হাতে বণ্টন করে দেওয়া হত উপর ওয়ালাদের অনুগৃহীত সেনানী, সামন্ত ও জায়গীদারদের মধ্যে। রূপ-লাবণ্য ও গুণ-গরিমার দৌলতে এই সব নারীর কেউ-কেউ অবশ্য বিজয়ী সম্রাট বা সেনাপতিদের পত্নীত্ব লাভ করেছে। কিন্তু বেশীর ভাগই থেকেছে অপমানিত উপ-পত্নীর পদবী দখল করে। হূন, সেলজুক, তুর্ক, তাতার, আরব, মোঙ্গল, সমস্ত প্রাচীন অভিজেতা জাতিই এই করেছে। আর এই বাধ্যতামূলক সংমিশ্রণ থেকেই হয়েছে এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির রক্তধারার মিশ্রণ এবং প্রত্যাশিত কারণেই এক সভ্যতা আর এক সভ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

অধিকৃত বা শত্রুবাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ দেশে সমাজ ও রাষ্ট্র-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হলে, সেখানকার নারীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েও অনেক সময় বিদেশী সৈনিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। প্রথমত এর পেছনে থাকে প্রবল অন্ন-সমস্যা, দ্বিতীয়ত থাকে ইন্দ্রিয়াধিকার থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত থাকার প্রতিক্রিয়া। কোন-কোন মনস্তাত্ত্বিক বলেন, বিদেশী সম্বন্ধে অনুচিত কৌতূহলও নাকি এর আর একটি কারণ। গত যুদ্ধে অবরুদ্ধ সার্বিয়ায় বয়স্কারা ত বটেই, স্কুলের মেয়েরাও রাত্রিকালে শত্রু-শিবিরে এসে টিন-ফুডের বিনিময়ে মর্যাদা বিক্রয় করত, প্রত্যক্ষ-দর্শীদের বিবরণে তার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত মেয়েদের কেউ-কেউ অবশ্য এই ছদ্মবেশে গুপ্তচরগিরি করত। শত্রু-শিবির থেকে তারা জরুরি তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে, অথবা আপন গভর্ণমেণ্টের গোপন অভিসন্ধী তাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়ে উচ্চ বখশিস আদায় করেছে, তার প্রমাণ আছে।

মোটের ওপর যুদ্ধ হল লোকালয়ের সব চেয়ে বড় আপদ। তা মানুষের শুধু ধন-সম্পত্তিই ধ্বংস করে না, ধ্বংস করে তার শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সন্নীতির

বনিয়াদও। আক্রান্ত বা শত্রু-বিধ্বস্ত দেশের কথা ত বলারই নয়। এমন কি, আত্ম-রক্ষায় সমর্থ দেশেও সমস্যা কিছু কম নয়। যুদ্ধ বাধার আগে যে-সব কুমারী কোন-না-কোন ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদানে নিরত থাকে এবং এই ভাবে সন্তান-সম্ভবা হয়, বাগদত্ত যুবকরা হঠাৎ যুদ্ধে চলে যাওয়ায় তারা পরিণত হয় 'কুমারী মাতা'য়। তাছাড়া পাণিপ্রার্থী যুবকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায়, প্রবৃত্তির আহ্বানও অনেক কুমারীকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করে, এ ত আগেই বলেছি। যে-সমস্ত বিবাহিতা নারী স্বামী-সংসর্গে বঞ্চিত হয়ে সমাজে থাকে, তারাও কেউ-কেউ নিছক প্রয়োজনের তাগিদেই নিষ্কর্মা বৃদ্ধদের অথবা নাবালক ছেলেদের বিপথগামী করে। সলোখবের উপন্যাসে আশা করি সকলেই দেখেছেন, স্বামী শিক্ষা-শিবিরে আটক থাকা কালে ডেরিয়া তার বৃদ্ধ শ্বশুরকে একদিন কি ভাবে পাগলের মতো চেপে ধরেছিল। শুধু উপন্যাসে নয়, বাস্তবেও অবস্থা এই হয়। বহু দুরতিক্রম্য সম্বন্ধের ব্যবধান নর-নারী এই সময় লঙ্ঘন করে ফেলে। শিক্ষক, পাদ্রী, চিকিৎসক, লোক-কল্যাণকর্মী, এ-সবের সঙ্গেই সাধারণত যোগাযোগ হয়ে থাকে। এ ছাড়া নিকট-দূর আত্মীয়-স্বজন ত আছেই।

বলাই বাহুল্য যুদ্ধের পটভূমিতে অনিবার্য ভাবেই বহু সন্তান জন্মায়, যারা জারজ নামে অবিহিত হবার যোগ্য। শান্তির সময় এই সব জারজের কোন স্থান নেই সমাজে। বেশীর ভাগকে তাদের করা হয় অঙ্কুরে বিনষ্ট। যেগুলি রক্ষা পায়, তারাও শিষ্ট-সমাজ থেকে দূরে অযত্নে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়। কিন্তু যুদ্ধকালীন সমাজ ত জারজকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারে না! কর্মক্ষম পুরুষের বারো-আনাই যখন থাকে যুদ্ধে আটক এবং সেই বারো-আনার কতটা অংশ যুদ্ধান্তে সশরীরে ঘরে ফিরে আসবে, তার সম্ভাবনা যখন থাকে অনিশ্চিত, তখন রাষ্ট্রের পক্ষে তথাকথিত অপজাত সন্তানদের উপেক্ষা করার শক্তি কোথায়? প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্স এবং জার্মানী জারজদের সরকারী সনদ দিয়ে গ্রহণ করেছিল। গত যুদ্ধে ফ্রান্স ও জার্মানীর যে পরিমাণ লোকক্ষয় হয়েছিল, তাতে এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্রান্স তার নর-শক্তি খুব বেশী বাড়িয়ে তুলতে পারেনি। তার এবারের পরাজয়ের নাকি সে-ও একটা কারণ। এবার রক্ষণশীল গ্রেট বৃটেনও মাথা ঘামাচ্ছে জারজদের প্রসঙ্গ নিয়ে। যুদ্ধের মধ্যপর্বে কুমারী ও প্রোষিত-ভর্তৃকা মাতাদের প্রসঙ্গ নিয়ে পাদ্রী ও রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে একাধিক বৈঠক হয়েছে।

পুরানো যুদ্ধকালীন সমাজে গৃহে পরিত্যক্ত নারীদের সমস্যার দিকটা জোর করে ধামা-চাপা রাখা হত। মধ্যযুগীয় ইউরোপে পুরুষেরা দলে দলে যুদ্ধযাত্রা করত নারীর কটিদেশে সতীত্বের বর্ম পরিয়ে দিয়ে। চাবিটি নিয়ে যেত নিজেরা সঙ্গে করে। রাজপুত ও মারাঠী জাতিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল আক্রমণকারী শত্রু-বাহিনীর মুখে আত্ম-রক্ষা অসম্ভব হলে, নারীদের জন্যে অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার রীতি। এ-কালে বর্ম পরানো বা অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ানো নিশ্চয় কেউ সমর্থন করবেন না। আসলে নারীও মানুষ এবং জৈব ক্ষুৎ-পিপাসা তারো৹ যে অনিবায এবং সতীত্বের দোহাই দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখার যে কোন উপায় নেই, এ বুঝেই এ-যুগে মানুষকে অন্য পথ ভাবতে হয়েছে। সে পথ হল 'নিয়োগ-প্রথা সমর্থন করা। প্রকাশ্যে না হলেও, এ-কালের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রকারান্তরে এই প্রথাকে সমর্থন করছে জারজ সন্তানকে স্বীকৃতির সনদ দিয়ে।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত সৈনিকদের অভ্যাস ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে বোধহয় আরো দু-চার কথা বলা দরকাব। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের তৃপ্তি বিধানের জন্যে নানা ছদ্মনামে নারী সরবরাহ করা হয়, এ কথা আগেই বলেছি। এমন কি, প্যারাস্থটের সাহায্যেও অবরুদ্ধ সৈনিকদের ভেতর নারী নামানো হয়েছে এবারকার যুদ্ধে। তাছাড়া সৈনিকদের আনন্দ দেবার জন্যে ভ্রাম্যমান অভিনেত্রীদল পাঠানোর ব্যাপক রেওয়াজ আছে। আর নিজ-নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সঙ্গিনী জোগাড করে নেওয়ার সুযোগও দেওয়া আছে প্রত্যেক সৈনিককে। তা সত্ত্বেও বহু সৈনিককে উপবাসী থাকতে হয়। তারা স্ব-দলের মধ্যে বিচিত্র অনাচার কদাচার করে। আশ-পাশের পল্লী থেকেও নাবালক ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে আসে।

লোকে কথায় বলে সৈনিক, তার মানে সমাজ-বহির্ভূত মানুষ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সদাচার, যা-কিছুর ওপর ভিত্তি কবে সমাজ, তা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে, তাদের নিয়োজিত করা হয় নির্বিচারে নর-ঘাতনে এবং সমুদয় অশিব বৃত্তিকে উৎসাহিত করা হয় সেই কাজের সহায়ক রূপে। কাজেই সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি তাদের ভেতর প্রচণ্ড বীভৎসতা নিয়ে প্রকাশমান হয়। কোন কদর্যতাতেই তাদের কুণ্ঠা থাকে না। আবিসিনিয়া যুদ্ধের বিবরণে দেখেছি, গেরহাইয়ের একটি পরিবারে প্রবেশ করে, ইতালীয় সৈন্যেরা মাতা, কন্যা ও দৌহিত্রীকে নির্মম নিগ্রহে জর্জরিত করেছে, তারপর গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে

পেট্রোল দিয়ে গোটা বাড়ীটা দগ্ধ করে দিয়েছে। অনুরূপ অমানুষিকতার ঘটনা অধিকৃত চীনেও হয়েছে। সেখানে ন-দশ বছরের শিশু-কন্যাদের থেকে সুরু করে, বর্ষীয়সী মহিলাদের ওপর পর্যন্ত, নির্মম যথেচ্ছাচার করেছে জাপানী সৈনিকরা। একজন মার্কিণ রিপোর্টার জাপানীদের আর একটি বীভৎস নৃশংসতার কথা লিখেছিলেন: 'ফুকিয়েনের রণক্ষেত্র থেকে ধৃত একদল চৈনিক বন্দীর ওপর বেয়নেট চার্জের হুকুম হলে, কিশোর বয়স্ক সৈনিকদের ওপর আগে দলবদ্ধ ভাবে অন্যায়চরণ করা হয়, তারপর নাকি শাণিত অস্ত্র দিয়ে তাদের কোন-কোন অঙ্গচ্ছেদ করা হয়। ঘটনা বিশ্বাস্য কি না জানা নেই। তবে রণক্ষেত্রে অঙ্গচ্ছেদের আরো কয়েকটি নজীর পাওয়া গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে কুতলেমাবার অবরোধ কালে এক তুর্কী মেয়ে গুপ্তচর ধরা পড়ে। তার ব্যাগ থেকে পাওয়া যায় সৈন্যিকদের গলার টাই, হাতের ঘড়ি ও আংটি, সেই সঙ্গে কর্তিত একটি প্রজননাঙ্গ। অনুসন্ধানে জানা যায়, সে একটি মৃতদেহ-তল্লাসী দলের সভ্যা'। রণক্ষেত্র থেকে গৃহে ফিরলেও আমরা দেখতে পাই, বিকৃতি ও বৈকল্য সমরকালীন আবহাওয়ায় অত্যন্ত প্রবল।

একখানি বাজেয়াপ্ত জার্মান বই থেকে উদ্ধৃত করে, নরম্যান হেয়ার ফ্রান্সের একটি পাকা ছেলের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রায় চোদ্দ-বছরের ছেলেটি যে ওস্তাদ 'খেলোয়াড', তা হঠাৎ কোন স্কুল-মিষ্ট্রেসের কাছে ধরা পড়ে যায়। তারপর থেকেই ঘরে-ঘরে এই বাহাদুরটির নিমন্ত্রণ হতে থাকে, পরিত্যক্তা মহিলা ও ভাবপ্রবণ তরুণীদের 'খেয়াল সঙ্গী' হবার জন্যে। নারীদের মধ্যে ব্যাপক সমাসক্তির বিবরণও এই বইয়ে স্থান পেয়েছে অনেকগুলি। আরো অনেক রকম বিকৃতি এবং অস্বাভাবিকতার বিবরণ আছে, যার মধ্যে নারী সমাজে কাঁচ ও রবারের Consolator বিক্রীর এবং অনুচিত প্রয়োজনে বালক-ভৃত্য নিয়োগের কাহিনী গুলো উল্লেখযোগ্য।

মোটের ওপর দেখা যাচ্ছে, সমরকালীন আবহাওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তরীণ পুরুষ হক, আর গৃহে অবরুদ্ধ নারী হক, সকলেরই কাম-জীবন যুদ্ধের হিড়িকে উন্মার্গগামী, চঞ্চল ও দুর্দম হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভাঙাগড়া, ওলট-পালট ও অনিশ্চয়তাই তলা থেকে আদি রিপুর উদ্দমতায় ইন্ধন যোগায়। ফলে অবস্থা যা দাঁড়ায়, সে সম্বন্ধে এক-এক পণ্ডিতের মত এক-এক রকম। আগেই বলেছি, জারজের প্রশ্নটাই এই সময় সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়। হিন্দুসমাজ-শাস্ত্রীরা সমরকালীন জারজের সমাজে গ্রহণীয়

বলে স্বীকার করেননি। মহাভারত, মনু, কৌটিল্য, সকলেই বলেছেন, এই ভাবে জাত নারীরা নটী-বৃত্তি নেবে, আর পুরুষেরা হবে সৈনিক। জন্মগত ভাবে সমাজ-সংস্কার বিচ্যুত বলে, এরাই হবে এই দুই পেশায় সর্বাধিক উপযুক্ত। লুথার এদের জন্মমাত্রে ভূ-প্রোথিত বা দগ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু যিনি যা ই বলুন, অতি প্রাচীন কাল থেকেই সমর জনিত অবাধ মিশ্রণের দরুণ সমাজে জারজের উৎপত্তি হয়েছে। তদানীন্তন সমাজ তাদের কৌলীন্য দেয়নি, কিন্তু পরবর্তী কালে তারা হয় জাতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, নয় মূল-জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে নূতন একটা সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে। আশ্চর্যের বিষয়, সেই মিশ্র-জাতিই পরবর্তী সময়ে আবার আপনাদের কৌলীন্য নিয়ে আস্ফালন করেছে। ভারতীয় মুসলীমদের পাকিস্তান দাবীই তার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হিড়িকে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে হয়েছে পর্যাপ্ত যৌন-সংমিশ্রণ। হাবসীদের সঙ্গে ইতালীয়দের, স্লাভ, নর্স ও রুশদের সঙ্গে জার্মানদের, চীনা ও পূর্ব-এশিয়াস্থিত মঙ্গোল-মুসলীমদের সঙ্গে জাপানীদের, ভারতীয়দের সঙ্গে বৃটিশ, মার্কিন, নিগ্রো ও অষ্ট্রেলিয়ানদের যে ব্যাপক মিশ্রণ হয়েছে, তা থেকে উৎপন্ন সন্তানরা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে সমাজ-জীবনে, যেমন গেছে স্বদেশে উৎপন্ন জারজরাও। নিঃসন্দেহ, নানা ভাবে প্রভাবিত করবে এই মিশ্রণ একালীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে।

আপাতত শুনতে অস্বাভাবিক ঠেকলেও, এ কথা জীবতত্ত্বে স্বীকৃত যে মানব জাতির স্থিতি ও বিস্তৃতির দিক থেকে নাকি দূরবর্তী রক্ত-ধারার ব্যাপক মিশ্রণই অভিপ্রেত। শান্তির আবহাওয়ায় ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী, শিক্ষার্থী প্রভৃতির সঙ্গে বৈবাহিক আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে এ জিনিষ হয়। যুদ্ধের মতো সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ের সময় হয় হিংস্র নীতিজ্ঞান হীন সৈনিকদের উপদ্রবে ভেতর দিয়ে এবং তার ফলে ভালো-মন্দ নানা জিনিষ আসে সমাজ ও সংস্কৃতিতে। অনেকের ধারণা, ক্রমবর্ধমান মুসলীম সাম্রাজ্যবাদকে বিধ্বস্ত করার জন্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত ভাবে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছিল, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই ক্রুসেডই নাকি ইউরোপে প্রথম সিফিলিস রোগটি আমদানি করে। মধ্যপ্রাচ্যে এই রোগ নাকি আবার এসেছিল মঙ্গোল অভিজেতাদের মারফৎ। গ্রীক ও সারাসেন অভিজেতারাই নাকি এশিয়া এবং ইউরোপে প্রথম পুরুষে-পুরুষে এবং নারীতে-নারীতে সমাসক্তি প্রবর্তন করেছিল। আর

পশু-নিয়োগ নাকি সভ্য জগতে প্রচলিত হয়েছিল আর্য ও ইহুদী ঔপনিবেশিকদের দ্বারা। এ সবই অবশ্য অনুমান। তবে একেবারে অপ্রণিধানযোগ্য হয়ত না ও হতে পারে এর কোন-কোন সিদ্ধান্ত।

মানুষ যুদ্ধকে যে ঘৃণা করে, তা শুধু যুদ্ধ মানুষের সভ্যতা ও সংকীর্তির উৎসাদনকারী বলে নয়। তা মানুষের নৈতিক অস্তিত্বের ভিত্তি শিথিল করে দেয় বলে। কিন্তু আমরা চাই বা না চাই, সমর্থন করি বা না করি, পৃথিবী আজো যে সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক বিধি-ব্যবস্থার অধীন হয়ে রয়েছে, তাতে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ হবেই এবং যুদ্ধ নীতি-বিপর্যয়ও আনবেই সমাজে। সেটা আক্রমণকারী শত্রুর দ্বারাই হক, আর যুদ্ধ-নিরত বা যুদ্ধ প্রত্যাগত স্বদেশীয়দের দ্বারাই হক। যুদ্ধ-প্রত্যাগত নর-নারীরা যে অনেকেই বেশ সুস্থ মানসিকতা নিয়ে সমাজে ফেরে না, এ আমাদের দেশের যুদ্ধপ্রত্যাগত যুবকদের দিকে তাকালে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করলেও টের পাওয়া যাবে। সব চেয়ে বিপদের কথা, সামরিক আবহাওয়া থেকে এরা অনেকে নিয়ে এসেছিল দূষিত ব্যাধি, যা এদের পারিবারিক জীবন ও ভাবী বংশধরদের পক্ষে রীতিমতো দুর্ভাগ্যের সূচনা করেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর ইচ্ছা ও অনুমোদনের বিরুদ্ধে জোর করেই ভারতবর্ষকে এশিয়া-যুদ্ধের সদর-ঘাঁটিতে পরিণত করে। তার ফলে ইংরেজ, মার্কিণ ও ইঙ্গ-মার্কিণ মিত্র-শক্তির তাঁবেদাররা দলে দলে ভারতে এসে জড়ো হয় এবং ভারতের সামাজিক ও নৈতিক জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। বেকার-সমস্যায় বিব্রত শিক্ষিত-সমাজের বৃহৎ একাংশ তাদের নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে কি ভাবে এই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যোগ দিয়েছিল, বা বঞ্চনা-নীতির বিপাকে দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত চাষী-মজুররা কি ভাবে ঘর-সংসার ফেলে যুদ্ধের কাজে নাম লিখিয়েছিল, সে-প্রসঙ্গ আমার আলোচনার বহির্ভূত। আমি শুধু দেখাব, যুদ্ধার্থে আগত ও আহূত সৈন্য বাহিনী এ দেশের সমাজ-জীবনে কি জাতীয় অনাচার এবং দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছিল, আর সেই ধাক্কায় আমাদের সামাজিক অস্তিত্ব কি দুঃসহ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। অনেকেই আশা করি লক্ষ্য করেছিলেন, এই সময় উপকূলবর্তী নগর, বন্দর ও শিল্পাঞ্চল গুলিতে কি হারে পেশাদার পতিতাদের ভীড় জমতে থাকে। বিদেশী সৈন্যবাহিনীর সাহচর্যে মোট টাকা

কামানোর লালসা শুধু মফঃস্বলের পতিতাদেরই সহরে টানেনি, সহরের নিরন্ন গৃহস্থ ও হাফ-গৃহস্থদের মেয়েরাও অনেকে পয়সার লোভে সে সময় পতিতায় পরিণত হয়েছিল। দিন-রাত্রি এই সমস্ত পল্লী বোঝাই থাকত উন্মাদ সৈনিকদের জনতায়। তারা মদ খেত, হৈ-হুল্লোড় করত, দু-হাতে টাকা ছড়াত। বহু তথাকথিত ভদ্রলোক যে পতিতালয়ের 'পেট্রন' হয়ে এই সুযোগে মোটা টাকা কামিয়ে বড়লোক বনে গেছে, এ তারা আজ গোপন করলেও, অভিজ্ঞ লোকদের নিশ্চয় অজানা নেই। এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের অনেকে রীতিমতো অবস্থা ফিরিয়ে এনেছে। ঝি, চাকরাণী ও ঘুষকী দলের একাংশও যুদ্ধের দৌলতে সোনা-দানা এবং টাকা-পয়সা করেছে।

দেশ জুড়ে ব্যাপক ও বিরামহীন পতিতার মিছিল যেন যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সঙ্গে তাল রেখে দিনের পর দিন স্ফীত হয়ে চলেছিল। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে দীন-দুঃখী ঘরের মেয়েরা কেউ আর সৎপথে থেকে, সদ্ভাবে খেটে, অন্ন-বস্ত্র উপার্জনের কথা ভাবতে পারেনি। সকলেই ভেবেছে, সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে ভীড়ে গিয়ে কড়ি কুড়ানোর কথা। কার্যত হয়েছেও তাই। তাই দেখেছি, যেদিন উপার্জনশীল ভদ্র গৃহস্থ ভাত-কাপড় ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতে হিমসিম খেয়ে গেছেন, সেদিন ঝি-চাকরাণী ও নারী-মজুর সমাজ কালো বাজারের বর্ধিত মূল্য উপেক্ষা করে যদৃচ্ছ বাবুগিরি করেছে। যারা যুদ্ধ-প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তাদের দিক থেকে এটা অভিপ্রেত ছিল বলেই, পতিতা-বৃত্তির এই ক্রমবর্ধনশীলতাকে তারা উৎসাহিত করেছে, অবৈতনিক যৌনরোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রবর্তিত করে।

যুদ্ধকালীন পতিতা-মুল্লুকে কি ধরণের দালালী-দস্তুরী, কনট্রোল ও কালো বাজার চলেছিল, তা আশা করি কেউ-কেউ লক্ষ্য করেছেন। ট্রাক বোঝাই দিয়ে প্রত্যহ এক-একটি পল্লীতে অজস্র সৈনিক হাজির হত। সকলকে এক সঙ্গে আশ্রয় দেবার মতো যথেষ্ট সংখ্যক পতিতা কোথাও পাওয়া যেত না। তাই লাইন লাগিয়ে তারা একের পর এক সুযোগের প্রতীক্ষা করত। এই প্রতীক্ষার সময় লাইন ভাঙার বা আগে-পরে যাওয়া-আসার দাবী নিয়ে তাদের ভেতর মারামারি, গুঁতোগুঁতি হত ঠিক সেই ভাবে, যে ভাবে হত কয়লার বা কাপড়ের কনট্রোলে। এদিকে যুদ্ধ পূর্ববর্তী হারের তুলনায় পতিতাদের দক্ষিণাও বেড়েছিল প্রায় চার-পাঁচ গুণ। সাধারণ ভাবে যে-কোন নারীরই পারিশ্রমিকের হার তখন ধার্য হয়েছিল অন্যূন পক্ষে পাঁচ টাকা। অনুসন্ধানে দেখা গেছে,

এই সময় প্রত্যেকটি পতিতা দৈনিক গড়ে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে উপার্জন করেছে এবং প্রত্যেকেই গড়ে অন্তত দশটি করে অতিথি নিয়েছে। তার ভেতর ইংরেজ, মার্কিণ, অষ্ট্রেলিয়ান, নিগ্রো, পাঠান, জাঠ, বেলুচী, গুর্খা, শিখ, তেলেঙ্গী, নানা-জাতির লোক এসেছে। এদের মধ্যে একমাত্র মার্কিণদের পয়সা দেওয়া ব্যাপারে সব চেয়ে হাত দরাজ ছিল বলে, পতিতারা সকলে ছিল তাদের পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে পয়সা কম দেয়, অথচ রকমারি বর্বরতা করে বলে, নিগ্রো ও উত্তর-ভারতীয় সৈন্যদের তারা করত ভীষণ অপছন্দ। সময়-সময় 'তারা ওয়ালা' সাহেবদের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ এবং কালা আদমিদের প্রতি অহেতুক বিরাগ প্রদর্শনের দরুণ পতিতালয়ের দু-দলে ঠেঙাঠেঙি বাধত। মিলিটারী পুলিশ এসে তারপর তাদের টেনে নিয়ে যেত। এই সমস্ত ঠেঙাঠেঙির ফলে দু-চারটি পতিতা এবং দেশী-বিদেশী সৈনিক যে হতাহত হয়েছে, সে সংবাদও আশা করি জানেন কেউ-কেউ।

কিন্তু সামরিক বাহিনীর অনাচার শুধু নির্দিষ্ট পতিতা-পল্লীগুলিতেই আবদ্ধ ছিল না। প্রত্যেকটি সেনানিবাস এবং ছাউনিই তখন হয়ে উঠেছিল এক-একটি গুপ্ত পতিতালয়। সামরিক সরবরাহ বিভাগের সঙ্গে যোগ-সাজোসে বহু ব্যক্তি তখন পাইকারি হারে মেয়ে-চালানির কারবার করেছে। দেশে দুর্ভিক্ষ নেমেছে। দরিদ্রের ঘরে অন্ন নেই। পুরুষ মানুষরা বাড়ী ছেড়ে হয় ভাতের ধান্দায়, নয় চাকরির টানে, দিকে দিকে পালিয়েছে। এই সুযোগে আড়কাঠিরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দুঃস্থ মেয়েদের নানা ফন্দীতে সহরে ভুলিয়ে এনেছে। নারী-শ্রমিক রূপে যুদ্ধের কাজে মোটা টাকা কামানোর লোভ দেখিয়ে, গ্রামাঞ্চল থেকে তারা প্রতিদিন গাড়ী ও নৌকা বোঝাই দিয়ে হাজার হাজার মেয়ে নিয়ে এসেছে বিভিন্ন সামরিক উপনিবেশে। বাইরে এরা সকলেই কুলি, কামিন ও পরিচারিকার কাজ করত। কিন্তু আসলে এদের কাজ ছিল যুযুধান সৈনিকদের কাছ থেকে মোটা দক্ষিণা লাভ করা। কাঁথি-তমলুক এলাকায় এবং চট্টগ্রাম ও আরাকান সীমান্তে এই মেয়ে-চালানির কারবার কি হারে চলেছিল এবং তার ফলে কত মেয়ে রোগগ্রস্ত হয়েছিল, সন্তান-সম্ভাবিতা হয়েছিল, তার কিছু আভাষ পাওয়া যাবে People's War পত্রিকার তদানীন্তন সংখ্যা গুলিতে। শুধু মেয়ে নয়, বহুল পরিমাণে ছেলেও আমদানি করা হয়েছে সৈনিকদের জন্যে এবং সেটাও চলেছে ব্যবসায় হিসাবে। মুখে পাউডার, গলায় চেক-কাটা রুমাল বাঁধা এই সব ছেলেকে দ্রুতগামী জীপে সৈনিকদের সঙ্গে আনা-গোনা করতে কে না দেখেছেন?

পতিতা-পল্লীতে ও সামরিক শিবিরে যে-সব অন্যায় অনাচার হয়েছে, লোকালয়েও এ সময় তার চেয়ে অল্প কিছু হয়নি। খাস কলকাতা সহরেই রাজপথ থেকে ভদ্র মহিলাকে, কলেজের ছাত্রীকে, কম বয়স্কা ফেরীওয়ালীকে মাঝে মাঝে জোর করে ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে অশিক্ষিত সৈনিকরা এবং যৎপরোনাস্তি অত্যাচার ও উপদ্রব করে আবার পথে ছেড়ে দিয়ে গেছে। উপকণ্ঠস্থিত গৃহস্থ পল্লীতে হানা দিয়ে বন্দুক-পিস্তল দেখিয়ে, তারা কুল-নারীদের সর্বনাশ করেছে এবং দুষ্ক্রিয়াস্তে গাড়ী হাঁকিয়ে পালিয়ে গেছে। গড়ের মাঠে বছর-তেরো বয়সের একটি এংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন নিশ্চয় অনেকে। তার জামায় একটি একশো টাকার নোট আলপিন দিয়ে আঁটা ছিল এবং সেই সঙ্গে কাগজে লেখা ছিল 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে'। ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে আর একটি মরণাপন্ন বাঙালী তরুণীকে কুড়িয়ে এনে বাড়ী পৌছে দেওয়া হয়েছিল, সে কাহিনীও আশা করি কারু কারু মনে আছে। মাঝের হাটের ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে নিরাবৃত দেহ, হাত-পা বাঁধা পাঁচটি কুলি-রমণীকে দুর্বৃত্ত সৈনিকদের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং সেই ঘটনায় উদ্ধারকারীদের একজন প্রাণ হারিয়েছিলেন, সে-ও ভুলে যাবার কথা নয়। হাওড়া গোলাবাড়ী থানায় এক পূর্ণগর্ভা তরুণীর ওপর সৈনিকদের দলবদ্ধ বলাৎকার এবং ডায়মণ্ড-হারবারে মাতা ও কন্যাকে ধর্ষণ, তারপর বেষ্টনকারী পল্লীবাসীর কয়েক জনকে এবং ঐ দুই নারীকে গুলি করে হত্যা করা নিয়ে ত দীর্ঘস্থায়ী একটি মামলাই চলেছিল।

এই রকম ঘটনা সর্বত্র হয়েছে এবং প্রায় প্রতিদিনই হয়েছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ এর খুব কম অংশের তদন্ত করেছেন। অপরাধীদের দণ্ডিত করেছেন আরো কম। দক্ষিণ কলকাতার কোন রেল-ষ্টেশন থেকে চাঁপাফুল বিক্রেতা এক বালককে টেনে নিয়ে গিয়ে, চারজন নিগ্রো সৈনিক তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করে, তারপর তাকে যখন অর্ধ মৃত অবস্থায় এনে লেকের জলে ফেলে দেবার চেষ্টা করে, তখন স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি তাদের গ্রেপ্তার করেছিলেন। দুটি কয়লা-কুড়ানী নাবালিকাকে পাঠান সৈনিকরা পয়সা ও কমলালেবু দেবার নাম করে এক ছাউনির ভেতর নিয়ে যায়। একটি মেয়ে সেখানেই মারা যায়, অন্যটি কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত দেহে পালিয়ে আসে। এই লোকগুলিকে সনাক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু কোন দণ্ড তারা পায় নি। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে যে সৈনিকরা জোর করে টেনে নিয়ে গেছে

বা লোকের ঘরে এসে ঢুকেছে, তা নয়। অনেক সময় দারিদ্র্য এবং অসুস্থ লালসা ছেলে-মেয়েদের আকৃষ্টও করেছে। ছাদ-পিটুনী, ধান-ভানুনী, মজুরণী ও মেথরাণী শ্রেণীর মেয়েরা অনেকে সেনা-নিবাসের আশেপাশে দল বেঁধে ঘুরত এবং ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র ছুটে গিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ত, এমন দৃশ্য আশা করি বহুজন দেখেছেন। নির্জন দুপুরে পথের ভ্রাম্যমান সৈনিককে ইসারায় ডেকে বস্তির মধ্যে নিয়ে গেছে, এমন মেয়ে সব পাড়াতেই দু-দশ জন দেখা যেত সে-সময়।

এই যেমন একদিক, তেমনি আছে আর একদিক: আমি বলছি, সৈনিকদের সঙ্গে গৃহস্থ মেয়েদেব স্বেচ্ছাকৃত ব্যভিচারের কথা। যুদ্ধের মরসুমে এ-আর-পি, ডবল-ইউ-এ-সি, নার্সেস ক্যোর, নানা পর্যায়ের চাকুরিতে ভদ্র ঘরেব শিক্ষিত মেয়েরা ঢুকেছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও অন্ন-কষ্টের দিনে মেয়েদের এই উপার্জন গৃহস্থ ঘরের পক্ষে খুব কল্যাণকর হযেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এই চাকুরির সূত্রে বিদেশীদের সংস্পর্শে এসে অনেক মেয়ে যে একেবারে অধঃপাতে গিয়েছেন, এ-ও আশা করি অভিজ্ঞ লোকরা স্বীকার করবেন।

শিক্ষিত মার্কিণ ও ইংরাজ যুবকদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগ পেয়ে, তাঁরা বিশেষ উল্লসিত হয়েছেন এবং অনেকে দলে দলে তাদের সঙ্গে খোঁপায় জাল ও ঠোঁটে রং লাগিয়ে ঘোরা-ফেরা করেছেন, বার-এ, নাইট ক্লাবে ও কাফেতে। তাঁরা যে-সব মূল্যবান উপহাব-সামগ্রী ঘরে এনেছেন, উপরি পাওনার নাম করে নিত্য যে ভাবে গোছা-গোছা নোট বাড়ী এনেছেন, তার মুখ চেয়ে অভি-ভাবকরা আপত্তি করেন নি। ইতিমধ্যে তাঁদের কারু হয়েছে সন্তান সম্ভাবনা, কেউ হয়েছেন সিফিলিস বা গণোরিয়া গ্রস্ত, কেউ মদ্যপানাসক্ত। মধ্যবিত্ত ঘরে শিক্ষিতা মেয়েদের এই গোপন পাতিত্য কি হারে বেড়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে কত জারজ জন্মেছে, কত গর্ভনাশের ঘটনা হয়েছে, কত কুৎসিত রোগ গোপানে চিকিৎসিত হয়েছে, তা বহু জনের জানা থাকার কথা। যুদ্ধাবসানের ঠিক পরেই ডবল-ইউ এ-সি'র পক্ষ থেকে যে মর্মান্তিক আবেদন কাগজে প্রকাশিত হয়, বা ষ্টেটসম্যানে এক এংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণী যে খোলা চিঠি লেখেন, তাতে বিপন্ন ও বিপথগামী মেয়েরা স্ব-মুখেই এই সব দুষ্কৃতি ও অধঃপতনের কথা স্বীকার করেছেন।

অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য মেয়েদের পয়সার লোভ দেখিয়ে বা চাকরির ওপর চাপ দিয়েও প্রথমটা পাপের পথে নামানো হয়েছে। তার দু-একটা দৃষ্টান্ত

এখানে দিই। এক গ্র্যাজুয়েট তরুণী বলেছিলেন যে নিছক অর্থের প্রয়োজনেই তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে চাকরি করতে পাঠান। তিনিও তাতে সম্মত হন। কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পর তিনি দেখলেন, অন্যান্য মেয়েরা দ্রুত উন্নতি করছে, তাঁর আর পদোন্নতি হচ্ছে না। তখন তিনি তাঁর ওপর-ওয়ালার কাছে বিষয়টা নিবেদন করলেন। সেই সাহেবটি সেদিন তাঁকে সঙ্গে করে তাঁর চেম্বারে নিয়ে গেলেন এবং পরের মাস থেকে তাঁর বেতন চারশো করা হবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সর্বনাশ করলেন। উপর্যুপরি আরো কয়েকদিন এটা চলল, কিন্তু বেতন আশানুরূপ বাড়ল না। আর-একটি মেয়ে তাঁর দাদার বন্ধুত্ব-সূত্রে আগত এক পদস্থ বিদেশী অফিসারের অনুরোধে যুদ্ধের চাকরি নেন। দাদা বোনকে এগিয়ে দিয়ে অফিসারটির কৃপায় মোটা টাকার কনট্রাক্ট পেতে লাগলেন এবং অফিসারও তার বিনিময়ে বোনটির সর্বনাশ করে চললেন। পরিবারের এমন হিতকারী বন্ধু, কাজেই বাড়ীর সকলে তাঁকে বিশেষ খাতির করতেন। তিনি বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলে, তাতে কেউ অমত করতেন না। শ্বেতাঙ্গ যুবক এই অবসরে ঐ তরুণীকে নিয়ে যত্র-তত্র যেতে লাগলেন। অবশেষে মেয়েটি যখন গর্ভবতী, তখন বাড়ীর সকলের হুঁস হল। তাঁরা তাঁকে তখন অন্যত্র সরিয়ে দিলেন, সাহেবের অনুগ্রহও সেখান থেকেই শেষ হল।

অপর একটি মেয়ের কাহিনীও প্রায় একই রকম। তাঁর সহকর্মী এক মার্কিন যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব অল্পদিনেই প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়। তারপর একদিন ঐ যুবক তাকে সিনেমা দেখানোর নাম করে নাইট ক্লাবে নিয়ে যায় এবং সেখানে আট-দশ জন পানোন্মত্ত সৈনিকের সঙ্গে একত্র হয়ে সে তাঁর মর্যাদা হরণ করে। মেয়েটি গুরুতর রূপে আহত হয়ে প্রায় মাস-দেড়েক কাল হাঁসপাতালে পড়ে থাকেন। সেখান থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তিনি ঘৃণাবশে চাকরি ছেড়ে দেন। এই মেয়েটির আত্মীয়া আর-একটি মেয়ে তাঁর বন্ধু-পরিচয় দিয়ে মাঝে মাঝে অফিসের চার-পাঁচটি বিদেশী যুবককে বাড়ী নিয়ে আসতেন। তারা তাঁর মাকে মা, বৌদিকে বৌদি বলে ডেকে বাড়ীতে বেশ পসার জমিয়ে তোলে। তারা প্রায়ই আসত এবং উপহারের নাম করে নানা মূল্যবান জিনিষ দিয়ে যেত। অবশেষে বড়দিনের রাত্রে একদিন গাড়ী বোঝাই দিয়ে তারা জনা-দশেক ওদের বাড়ী এসে ওঠে। আলমারি, টেবিল-চেয়ার ভেঙে, পুরুষদের মার-পিট করে এবং ঐ তরুণীকে, তাঁর মাকে, বৌদিকে, দুই ছোট বোনকে যথেচ্ছ গুণ্ডামিতে জর্জরিত করে, তারা ব্যারাকে পলায়ন

করে। দশ আর বারো বছরের ছোট বোন দুটি এর অল্প পরে বিশ্রী রোগাক্রান্ত হয়। তরুণীটি সেই রাত্রেই আত্মহত্যা করেন। দাদা এই ঘটনায় বিবাগী হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যান। সমগ্র সংসারটাই তাঁদের ছারখার হয়ে যায় এই দুর্বিপাকের ফলে।

ঠিক এই রকম জুলুম-জবরদস্তির বা নিরুপায়তার সুযোগে চাপ দিয়ে বিপন্ন করার ঘটনা যা ঘটেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী ঘটেছে মেয়েদের স্বেচ্ছাকৃত অধঃপাত বরণের, এ কথা আগেই বলেছি। যুদ্ধের হিড়িকে এক শ্রেণীর শিক্ষিতা মেয়ে হঠাৎ যেন কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার বিসর্জন দিয়ে তাঁরা বৈদেশিক মিতালির নেশায় মেতে উঠেছিলেন। প্রতিদিন স্পেন্সেস হোটেল ও গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে ব্যাগ-ধারিণী বাঙালী তরুণীদের বেরুতে দেখেছি মার্কিণ বা ইংরেজ সৈনিকদের হাত ধরে। প্রতিদিন জীপে চড়ে বিদেশীদের দেহলগ্ন হয়ে তাঁদের যেতে দেখেছি রাজপথ দিয়ে। গড়ের মাঠ ও ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধের আশে পাশে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে, ডায়মণ্ড-হারবারের নদীতীরে, ওয়াটার-প্রুফ পেতে বসে বা শুয়ে থাকতে দেখেছি বাঙালী মেয়েদের অ-বাঙালী খাকীধারীদের সঙ্গে। এ-সবই গুপ্ত পাতিত্য এবং এ দুর্নীতি ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করেছে, মধ্যবিত্ত ঘরের সুপরিচিত দারিদ্র্যের সুযোগে। যুদ্ধকালীন সমাজের অবশ্যম্ভাবী উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রাপ্ত-বয়স্কা মেয়েদের অ-বিবাহজনিত দেহক্ষুধা, বিদেশীদের সঙ্গে অপ সম্পর্কে লিপ্ত হবার অনুচিত প্রলোভন, অনেক কিছুই যে ইন্ধন জুগিয়েছে সেই সঙ্গে, এ আশা করি আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

পতিতা-পল্লীতে, সামরিক ছাউনিতে, বা বস্তি মুল্লুকে দুষ্ক্রিয়া করে বেড়িয়েছে যে-সব সৈন্য-সেনানী, তারা সবাই অশিক্ষিত এবং তথাকথিত ছোটলোক শ্রেণীভুক্ত। স্বদেশেও তারা যে ভাবে বেঁচে থাকে, বিদেশে এসেও ঠিক সেই ভাবেই বাঁচতে চেয়েচে। কিন্তু শিক্ষিত, ভদ্র ও দায়িত্বশীল বিদেশীদের যে আচরণ আমাদের দেখার দুর্ভাগ্য হল, তা বাস্তবিকই নৈরাশ্য-জনক। বোধহয় এরা পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দাসত্বে আবদ্ধ দেশ পেয়েই, এখানে এসে মনুষ্যোচিত আচরণের প্রয়োজন বোধ করেনি। তাছাড়া এ দেশের লোক নারীর সম্মান নিয়ে এই ভাবে ছিনিমিনি খেলাকে অসহায় স্থৈর্যে বরদাস্ত করেছে, প্রতিকারে জাপানের মতো 'চপেটাঘাত বাহিনী' তৈরী করেনি, এতেও হয়ত তারা প্রশ্রয় পেয়েছে। এটা আক্রান্ত বা অধিকৃত

দেশ ছিল না। ছিল মিত্র-দেশ এবং এ দেশের অন্ন-বস্ত্র, ধনবল, ও জনবল ভাঙিয়েই বিদেশীরা বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করল। তার বিনিময়ে তারা এ দেশে পাইকারি হারে যৌনব্যাধি, জারজ সন্তান ও নৈতিক কুরুচি ছড়িয়ে গেল. মানুষ হলে, এ কথা ভারতবাসী কোনদিন ভুলবে না।

কত মেয়ের এই ভাবে সর্বনাশ হয়েছে, কত অশ্লীল বই, অশ্লীল চিত্র, অশ্লীল ছায়া-ছবি দুর্নীতির অন্ধ অলি-গলি বেয়ে সমাজে ঢুকেছে, কত পাপার্জিত অর্থ কত পরিবারের আকস্মিক স্ফীতির কারণ স্বরূপ হয়েছে, তা ভাবলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে মস্ত একটা অভিশাপই মনে করতে হবে ভারতবাসীর। এই সব বে-আইনী সংস্রবকে কোন-কোন বিদেশী ভদ্র সন্তান বিবাহের মর্যাদা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সমুদ্রপারবর্তী বিবাহকে এক আপৎকালীন আইনের সাহায্যে নিষিদ্ধ করে তার পথ বন্ধ করে দেন। তাতে একটা ভালো হয়েছে যে এংলো-ইণ্ডিয়ান পল্লী থেকে সংগৃহীত বধূদের মতো বিদেশে গিয়ে অন্য ভারতীয় মেয়েরা ফাঁপরে পড়েনি। কিন্তু এই সব ভ্রষ্টকৌমার্য তরুণী দেশেও আর মানুষের মতো জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে পেরেছে কি ?

চতুর্দশ অধ্যায়

উন্মাদ মহল

পুরাতন চিকিৎসা-ব্যবসায় উন্মত্ততা বা মস্তিষ্ক-বিকৃতিকে বায়ুরোগ নামে অভিহিত করা হত। বায়ুর প্রকোপ শান্ত করাকেই তাই উন্মত্ততার প্রতিকার বলে প্রচার করা হত। 'কিন্তু একালীন মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে উন্মত্ততা একটি মানসিক ব্যাধি। মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-কল্পনার স্বাভাবিক প্রবাহ কোন বাধার দরুণ প্রতিহত হলে এবং সেই আঘাতকে সহজ ভাবে মেনে নেবার মতো স্নায়বিক শক্তির অভাব হলে, মনের প্রবাহ বিকৃত হয়। সেই বিকৃতির নামই হল উন্মত্ততা।' জন্মগত ভাবে মস্তিষ্ক-শক্তির অপূর্ণতা থেকেও কতক লোক জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। বয়সোচিত দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে তাদের মনন শক্তির বিকাশ হয় না। প্রচলিত হিসাবে এদেরও লোকে পাগল বলে। কিন্তু জড়তবুদ্ধিতা ও মস্তিষ্ক-বিকৃতির মধ্যে একটি মূলগত পার্থক্য আছে। প্রথম অবস্থাটি জন্মগত, সেই কারণেই অপ্রতিকার্য। দ্বিতীয় অবস্থাটি আহৃত, সেই কারণেই চিকিৎসায়ত্ত। এই চিকিৎসা পদ্ধতি আগে আবিষ্কৃত হয়নি, বা যা হয়েছিল, তা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়েছিল। তাই এতকাল উন্মত্ততা মানুষের পক্ষে একটা প্রতি-কারহীন অপচয় বলে বিবেচিত হয়েছে।

আগেই বলেছি উন্মত্ততা দৈহিক ব্যাধি নয়, মানসিক ব্যাধি। কাজেই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে এর চিকিৎসা সম্ভাব্য। একথা অবশ্য ঠিক যে মন বলে নির্বিশেষে কোন বস্তু নেই। দেহান্তর্গত মস্তিষ্ক এবং তার বোধ-বৃত্তি ও চিন্তন-প্রণালীকেই বলা হয় মন। অর্থাৎ মন দেহেরই অন্তর্ভুক্ত। সে হিসাবে একে দৈহিক ব্যাধি বললেও খুব ভুল হয় না। কিন্তু প্রচলিত অর্থে মনের আপেক্ষিক একটি অস্তিত্ব আমরা মেনে নিয়েছি। সেই অনুসারে মস্তিষ্ক-বিকৃতিকে মনোরোগ হিসাবে গ্রহণ করাই সমীচীন। মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে যে মনের দুটি অবস্থা : চেতন, আর অবচেতন। যে বাস্তব সংস্থিতির মধ্যে আমরা থাকি, চলি, ফিরি, তার সঙ্গে যোগ রেখে চলেছে যে সম্বিৎ, তা-ই হল চেতন মন। আর তারই আড়ালে শত শত ইচ্ছা, আকাঙ্খা ও প্রবৃত্তিকে গোপনে বহন করেছে যে সম্বিৎ, তা হল

অবচেতন মন। একটা ব্যক্ত, অন্যটা গুপ্ত। কিন্তু দুইয়ের সমন্বয়েই হল মনের গঠন। বাস্তব বা প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজন নিষ্পন্ন করে চেতন মন, আর সেই কর্ম-শক্তিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা দেয় অবচেতন মন। সে হিসাবে একটি অপরটির ওপর ষোল-আনা নির্ভরশীল। কিন্তু মুখ্যত জীবন ও কর্মের কারবার চেতনা নিয়েই। অবচেতনা আড়ালের জিনিষ, সে আড়ালেই থাকে। নানা ভাবে, নানা অবস্থায় অভিব্যক্ত হলেও, চেতন মনের ওপর তা কখনই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। যেখানে তা করে, অর্থাৎ যেখানে অবচেতনার প্রাধান্যে চেতনার সহজ প্রবাহ যায় আবিল হয়ে, সেখানেই মানুষের কথা-বার্তা, কার্য-কলাপ ও চিন্তা-ধারা শৃঙ্খলা এবং পারম্পর্য, বোধ্যতা এবং প্রকৃতিস্থতা হারায়। সেই অবস্থার নামই হল উন্মত্ততা।

∴ কিন্তু অবচেতনা কেন এবং কেমন করে মানুষের সক্রিয় বা চেতন মনের ওপর চেপে বসে তাকে বিপর্যস্ত ও বিপথগামী করে, সেটা অনুধাবনযোগ্য। পূর্বেই বলেছি, মানুষ বাস্তবে যে জীবন যাপন করে, তা থেকে স্বতন্ত্র আর একটি জীবন যাপন করে 'ভাবে'। এই ভাবের জীবনটা প্রকৃতপক্ষে শত শত ইচ্ছার সমবায়ে গঠিত। মানুষের জীবনে ইচ্ছার অন্ত নেই। সম্ভব-অসম্ভব, শোভন-অশোভন, সুস্থ-বিকৃত, রকমারি ইচ্ছা মানুষের অন্তশ্চেতনাকে প্রতিনিয়ত অধিকার করে রয়েছে। এই ইচ্ছারাশির অতি অল্প অংশই বাস্তবে চরিতার্থ হতে পারে। বেশীর ভাগকেই অবদমিত করতে হয় কোন-না-কোন প্রত্যক্ষ বাধার মুখ চেয়ে। এই বাধা আসে ধর্ম সমাজ এবং রাষ্ট্রের রকমারি আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ থেকে। কিন্তু অবদমিত ইচ্ছাগুলি কার্যত অপূর্ণ থাকলেও, ভাবত জাগ্রতই থাকে। অবচেতনায় বসে তারা নানা খেলা খেলতে থাকে। ভেতরে ও বাইরে এই যে মনোগত বিরোধ, একে সহজ ভাবে বহন করতে পারেন না যিনি, তাঁরই মন প্রকৃতিস্থতার বল্গা হারিয়ে ফেলে। তাঁর চেতন মনটি যায় আড়ালে সরে, অবচেতন মনটি আসে সামনে এগিয়ে। কথায়-বার্তায়, কাজে-কর্মে, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, সৌন্দর্য ও সুরুচি বিবর্জিত অসংলগ্নতাই তখন হয়ে দাঁড়ায় তাঁর মনোধর্মের মুখ্য পরিচয়। বলাই বাহুল্য, এ পরিচয় পাগলের। অর্থাৎ অবদমনই পাগলামির অন্তর্নিহিত কারণ। ∴

অবশ্য প্রশ্ন উঠবে যে অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকেই ত বহু ইচ্ছা অবদমিত করতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষই ত পাগল হয় না, এর কারণ

কি? মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, অবদমিত ইচ্ছাসমূহ এক পথে প্রতিহত হয়ে যদি অন্য পথে প্রবাহিত হয়ে যায়, তাহলে মনের গভীরে তারা জটিলতার আবর্ত সৃষ্টি করতে পারে না। যদি মনের অন্তরালে পঞ্জীভূত থেকে তারা ক্রমাগত অসন্তোষ, ক্রোধ ও অতৃপ্তির অগ্নি-কুণ্ড রচনা করতে থাকে, তাহলেই আসে বিকৃতি। অবদমিত ইচ্ছা সমূহকে মুক্ত করে দেবার ব্যবস্থা করিয়ে, অথবা ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিয়ে, অনেক উন্মাদকে সুস্থ করা গেছে। 'ইচ্ছাপূরণ' পদ্ধতির এই চিকিৎসাই এ যুগে উন্মাদ-রোগের সর্বোত্তম চিকিৎসা বলে গণ্য। সাধারণ ভাবে বেশীর ভাগ লোকের জীবনেই এই ইচ্ছাপূরণের কতকগুলো স্বাভাবিক ধারা আছে। এই ধারাগুলির সাহায্যে অবদমিত মন আপনা থেকে আত্মমুক্তি লাভ করে বলে সাধারণ লোক সচরাচর অপ্রকৃতিস্থ হয় না।

সাহিত্যসেবা, শিল্পচর্চা, জন-কল্যাণ, পশু-প্রীতি, শিশু-প্রীতি, সজ্জানুরাগ, ধর্মচর্চা ইত্যাদি ইত্যাদি নানা পথে অবদমিত ইচ্ছা সমূহকে মুক্ত করে দিয়ে তারা মনের ভারসাম্য রক্ষা করে। কতকটা অবদমিত ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্যে দিয়েও চরিতার্থতায় পৌঁছায়। যারা এই সব পথের আশ্রয় নিতে পারে না এবং প্রতিহত ইচ্ছার বেগ যাদের স্নায়বিক শক্তিও স্বচ্ছন্দে বহন করতে পারে না, তাদেরই মানসিক শক্তি কেন্দ্রভ্রষ্ট ও বিকল হয়ে পড়ে। প্রত্যেক দেশের মোট জনসংখ্যা হিসাবে এরা নগণ্য, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজস্ব ভাবে এদের সংখ্যা খুব কম নয়। কাজেই উন্মাদ নর-নারীর সমস্যাকে একটা সামাজিক সমস্যা রূপেই গণ্য করতে হবে এবং বিকৃত, বিকল, বিপথগামী এই মনুষ্য-গোষ্ঠীর মুক্তি কোন পথে, তা-ও ভাবতে হবে। এই ভাবনার পথে আমাদের সব চেয়ে বড় সহায় হল এ-কালের পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব, যার সাহায্যে মনোবিজ্ঞানীরা বহু অপচিত-সম্বিৎ মানুষকে আবার প্রকৃতিস্থতায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন।

অনুসন্ধানে দেখা যাবে, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ও ন্যায়-নীতির, এক কথায় সভ্যতার খাতিরে মানুষকে যত রকমের আসক্তি দমিত করতে হয়, তার ভেতর কামাসক্তির স্থানই সর্বাগ্রে। স্বভাবতই অবদমন জনিত মানসিক বৈকল্যের পনেরো-আনাই মুখ্য বা গৌণভাবে কামাসক্তিকে কেন্দ্র করে জন্মায় ও পুষ্টি-লাভ করে। নারীর বাধ্যতা মূলক একনিষ্ঠতা ও বৈধব্য এবং পুরুষের একপত্নীত্ব, বিপত্নীকতা ও অনুচিত-গমনের বিধি-নিষেধ এক দিকে, অন্যদিকে নারী-পুরুষ উভয়ের বিলম্বিত কৌমার্য, দাম্পত্য অসমন্বয়, অতি-সন্তান প্রবণতা, নানা কারণ

উভয়কে পদে পদে যৌন অবদমনে অভ্যস্ত করে। এই অবদমন জনিত অবসাদ দুর্বল-স্নায়ু ও দীন-মস্তিষ্ক নর-নারীর ক্ষেত্রে বিকৃতিতে পর্যবসিত না হয়ে পারে না। শুচি-বাই, ব্যাধি-বিলাস, কলহপ্রিয়তা, ধর্ম-বাতিক প্রভৃতি নারীর এবং সজ্জাবিলাস, ক্লেদাসক্তি, সংঘাতশীলতা প্রভৃতি পুরুষের বিকৃতি গুলির মূল এই স্থানে। যেখানে এই রকম ছোটখাটো দু-একটি বিকৃতি সত্ত্বেও জীবন ও কর্মের বৃহত্তর দিকগুলিতে প্রকৃতিস্থতার ব্যত্যয় হয় না, সেখানে সাধারণ ভাবে এ-সবের অনুষ্ঠানকারীদের আমরা প্রকৃতিস্থ বলেই গণ্য করি। যেখানে এক দিকের গুরুতর বৈকল্য সব দিককেই বিকল করে ফেলে, সেখানে সহনশীলতার সীমা বাঁচিয়ে চলা অসম্ভব। সেই অবস্থাই উন্মত্ততা। নইলে অল্পাধিক ছিট, বাতিক, বদ খেয়াল বা ব্যতিক্রম অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষেরই দেখা যায়। তার কারণ প্রত্যেক মানুষকেই কোন-না-কোন ক্ষেত্রে কিছু-না-কিছু কঠিন রকমের অবদমন বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়। সভ্যতার আইনই তা মানায়।

অবশ্য কেবলমাত্র যৌনাসক্তিকেই যে মানুষের অবদমন করে চলতে হয়, তা নয়। সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক কারণ-পরম্পরায় নানা রকমের অবদমনই মানুষকে পদে-পদে মেনে চলতে হয়। তার ফলেও ক্ষতিকর মানসিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কিন্তু একালীন মনোবিজ্ঞানীরা কামের সংজ্ঞাকে এত বৃহৎ ও ব্যাপক বলে ধরেন যে যে-কোন ইচ্ছাই তাঁদের বিচারে কাম বা কামনা পর্যায়ভুক্ত। তাঁদের মতে তাই ধনস্পৃহা, খাদ্যলালসা, সজ্জা-বিলাস, প্রহারেচ্ছা, আত্মপ্রচার, যশোলিপ্সা, আর মিথুনাসক্তির মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নেই। একই জৈব-প্রেরণা নানা খণ্ড-অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করছে যে অখণ্ড মানসিকতা, তাঁদের মতে তা সর্বৈব কাম-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ এই মত অনুসারে সব অবদমনই কামাত্মক। এই অবদমনের সুস্থ ও সুন্দর প্রকাশ হয় আর্টে, ধর্মে, রকমারি সুকুমার বৃত্তির অনুশীলনে, আর বিকৃত, অসুস্থ ও অবাঞ্ছিত প্রকাশ হয় দুর্বৃত্ততা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অ-প্রকৃতিস্থতায়। তারই পারিভাষিক নাম উন্মত্ততা। কাজেই যে ভিত্তি থেকে মানব-মনের উর্ধ্বায়িত বৃত্তিগুলির স্ফুরণ হয়, সেই ভিত্তি-ভূমি থেকেই উন্মত্ততার উদ্ভব হয়, শুধু আধার অনুসারে। আধার বলতে বোঝায় জন্মগত ভাবে লব্ধ দেহ-সংস্থিতি ও মানসিক প্রবণতা এবং আবেষ্টনীর প্রভাবে প্রাপ্ত সংস্কৃতি ও রুচির বৈশিষ্ট্য। এ-সবের কোন-না-কোন দিকের দৈন্যই যে অবদমনের পৃষ্ঠে ভর করে উন্মত্ততায় প্রকাশমান হয়, এ আশা করি আর বোঝাতে হবে না।

উন্মত্ততার মধ্যেও যে প্রকাশের তারতম্য ও বৈচিত্র্য থাকে, এক জন হয় শান্ত ও প্রতিরোধ হীন পাগল, আর একজন হয় দুর্দান্ত ও উদ্দাম, একজন হয় অশ্লীলতা ও অনাচারণে সিদ্ধ, আর একজন হয় নম্র, সলজ্জ ও সদাচারী, এ-ও ঐ বৈজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত আধারের ফল। মোটামুটি ভাবে এই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পাগলদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে: এক, যারা কোন-কোন বিষয়ে অ-প্রকৃতিস্থ, কিন্তু বেশীর ভাগ বিষয়ে প্রকৃতিস্থ। দুই, যারা বিশেষ-বিশেষ সময়ে অ-প্রকৃতিস্থ, অন্য সময়ে প্রকৃতিস্থ, তিন, যারা সর্ব সময়ে সর্ববিষয়ে অ-প্রকৃতিস্থ। এই তিন মূল-বিভাগের আবার তিনটি উপ-বিভাগ করা হইয়েছে: এক, যারা দুর্ধর্ষ, সংঘাতশীল, অশ্লীলতা ও অনাচার-পরায়ণ। দুই, যারা শান্ত, স্থির, আত্ম-নিমগ্ন। তিন, যারা কখনো শান্ত, কখনো দুর্দান্ত। এই বহু শাখায় বিভক্ত পাগলদের মনের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে তাদের অবদমনের আদি-সূত্রগুলি আবিষ্কার করা এবং ইচ্ছাপূরণ পদ্ধতির সাহায্য সেই অবদমনের গ্রন্থি-মোচন করাই হল একালীন উন্মাদ-চিকিৎসার বিজ্ঞানসিদ্ধ উপায়।

দুঃখের বিষয়, এই ভাবে প্রবণতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাগ করে উন্মাদদের রাখার এবং চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই আমাদের দেশে। দু-একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান যা আছে, তা চলছে ষোল-আনা সাবেকী পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাছাডা চাহিদার অনুপাতে সঙ্কুলান হবার মতো স্থানও নেই সেগুলিতে। কাজেই এ দেশে উন্মাদেরা সাধারণত আশ্রয় ও চিকিৎসার কোন সুযোগ পায় না। অধিকাংশ পাগলই ঘর-বাডী ছেড়ে, আত্মীয়-পরিজনেব সংস্রবচ্যুত হয়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়। যত্রতত্র পড়ে থাকে, যা-তা খায়, যদৃচ্ছ আচরণ করে। তারপর এই ভাবেই একদিন মরে শান্তি পায়। পরিবারবর্গ যাদের সম্পর্কে কিছুটা যত্ন বা সতর্কতা অবলম্বন করেন, তারা হয়ত বাডীতেই থাকে এবং কিছু-কিছু চিকিৎসাও পায়। কিন্তু বেশীর ভাগ স্থলেই চিকিৎসার নামে তারাও পায় বন্ধন, পীডন, নির্যাতন, যাতে বিকৃতি তাদের কমার বদলে যায় আরো বেড়ে।

হাতে বা গলায় লোহার কড়া পরানো, ব্যাঙের মাংস বা ঘৃতকুমারীর পাচন খাওয়ানো, ভিজে চট পরানো, হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বপদ করে বেঁধে রাখা, তারই সঙ্গে নিম, বাবলা, জারুল প্রভৃতির ডাল দিয়ে প্রহার করা ইত্যাদি ইত্যাদি যে-সমস্ত টোটকা-চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাতে পাগলামি সারা অপেক্ষা

বাড়াই যে বেশী প্রত্যাশিত,এ কথা আশা করি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। কিন্তু এ দেশে এখনো পাগলের চিকিৎসা বলতে এগুলোরই ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। কাজেই দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত ঘরে যারা পাগল হয়, তারা যুগোচিত পথে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন সুবিধা পায় না। ফলে উপায় থাকতেও, বহু মূল্যবান জীবন অকালে অস্বাভাবিকতার আক্রমণে বিপর্যস্ত ও নিঃশেষিত হয়ে যায়। দেশের দারিদ্র্য এর একটা কারণ, আর একটা কারণ, মানসিক ব্যাধির গতি-প্রকৃতি ও চিকিৎসা সম্বন্ধে চিকিৎসক সমাজের অজ্ঞানতা। ফ্রয়েডোত্তর পৃথিবীতে এ দুরবস্থা লজ্জাজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু জ্ঞান ও সংস্কৃতি, জীবন ও কর্মের কোন ক্ষেত্রেই বা আমরা যুগ-প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পেরেছি? সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ মানুষই যে-দেশে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত নয়, বিকৃত-মস্তিষ্ক ও উন্মাদ যে সে-দেশে উপেক্ষিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু সমগ্র ভাবে পাগলদের প্রসঙ্গ আমার আলোচ্য নয়। যে-সমস্ত অতৃপ্ত বা অবদমিত যৌনাসক্তির ফলে মানুষ তার প্রকৃতিস্থতা হারায় এবং অপ্রকৃতিস্থতার মুখে যে-সমস্ত বিকৃত বীভৎস যৌনাসক্তি কথা-বার্তা বা কাজ-কর্মে প্রকাশ করে, আমি শুধু তারি কতকগুলো দিক এখানে লিপিবদ্ধ করব। যে জাতীয় বিকৃতি ও বৈকল্যের কথা আমি বলব, সে রকম বা আরো অন্য অনেক রকম দৃষ্টান্ত আশা কবি সময়ে-অসময়ে সকলেরই চোখে পড়েছে। পাগলের পাগলামি বলেই হয়ত তাঁবা তা উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু এ-সবের প্রত্যেকটাই যে কোন-না-কোন আদি-কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তারপর রোগীর নিজ-নিজ প্রবণতানুযায়ী পথে গডাতে গডাতেই যে তা এক-এক রকম চেহারা ধরেছে, এ সম্ভবত অনেকে ভেবে দেখেননি। সেই ভাবনার সূত্রটাই শুধু আমি এই অধ্যায়ে ধরিয়ে দিতে চাইব।

এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হয়ে পত্নী-শোকে নিতান্ত অধীর হয়ে পড়েন। আট বৎসর কাল তিনি এই শোকে এত অভিভূত ছিলেন যে আহার-বিহার, সাজ-সজ্জা, হাসি-খুসী, কোন কিছুতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় নি। তারপর পঞ্চাশে পৌঁছে সহসা তাঁর ভাবান্তর হল। আঠারো বৎসর বয়স্কা এক দূর-সম্পর্কীয়া তরুণীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন এবং প্রভূত টাকা পয়সার প্রলোভনে মেয়ের মা-বাপকে ভুলিয়ে তাকে তিনি বিবাহ করলেন। দু-তিন বৎসর তিনি নব বধূকে নিয়ে ঘর করেছিলেন। তারপর তরুণী এক গৃহ-শিক্ষকের সঙ্গে হঠাৎ একরাত্রে গৃহত্যাগ করলেন।

এরপরই ভদ্রলোক গেলেন পাগল হয়ে। কেমন করে জানি না, তাঁর ধারণা হল তিনি শিবাবতার। গায়ে ছাই মাখতে লাগলেন। মাথায় জটা রাখলেন। হাতে ত্রিশূল ও অঙ্গে বাঘ-ছাল ধারণ করলেন। বেদিয়াদের কাছে সাপ ধরা এবং দারোয়ানদের কাছে গাঁজা-সিদ্ধি খাওয়া অভ্যাস করলেন। তাঁর প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র তখন ডাক্তারী পাশ করেছে। তার পরবর্তী মেয়েটির বিবাহ এবং সন্তান-সন্ততি হয়েছে। প্রথম-প্রথম সকলেই জিনিষটাকে ধর্মনিষ্ঠার আতিশয্য হিসাবে নিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে যখন সবাই দেখল, কুল-বিগ্রহ মহাকালীর মন্দিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তিনি দেবী-মূর্তিকে আলিঙ্গন করেন এবং অশ্লীল অশ্রাব্য কথা উচ্চারণ করে অনাচারে প্রবৃত্ত হন, তখন সবাই বুঝল, তিনি পাগল হয়েছেন।

পরিবারস্থ অনেকে বলেছেন, কোন তান্ত্রিক সাধু নাকি তাঁকে কি-একটা যৌগিক প্রক্রিয়া শেখাতে গিয়ে পাগল করে দিয়েছে। হতে পারে হয়ত তা। কিন্তু প্রথমা পত্নীর অকাল-মৃত্যু জনিত শোক এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গৃহত্যাগ-জনিত অবমাননাই যে আগে তার মানসিক প্রকৃতিস্থতা হরণ করেছে, তারপর এক দিকে অতৃপ্ত ক্ষুধা, অন্যদিকে তান্ত্রিক প্রদত্ত দীক্ষা যে তাঁকে এই বিকৃতির ভেতর এনে ফেলেছে, এতে আর সন্দেহ নেই। এটা বোঝা যাবে তাঁর উন্মত্ততার প্রকৃতি নিয়ে অনুসন্ধান করলেই। কালী মূর্তির কাছ থেকে জোর করে তাঁকে টেনে আনা হলে, তিনি সরোষে চীৎকার করে মহাকালীর উদ্দেশে জঘন্য গালাগালি বর্ষণ করতেন। বলতেন, ওকে কি আমি বিশ্বাস করি? চোখের আড়াল হবামাত্র ··

ঠিক এই রকম ধর্মোন্মত্ততা দেখা গেছে আর একটি মহিলার ক্ষেত্রেও। উন-চল্লিশ বৎসর বয়সে পর-পর দুটি ছেলের মৃত্যু এবং একটি কন্যার বৈধব্য হলে, তিনি সাজ-সজ্জা, খাওয়া-পরা, সব বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন হয়ে পড়েন। উপবাস, প্রার্থনা, অনুতাপ, এই তাঁর দিন-রাত্রির সম্বল হয়ে দাঁড়ায়। স্বামীর সঙ্গে এই সময় থেকে তিনি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললেন। তাঁর ধারণা হল, স্বামীর অত্যধিক জৈব কামনাই তাঁকে নিরয়গামী করেছে। আর সেই পাপেই তাঁর এই দুর্দশা হয়েছে। স্বামীকে দেখলেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে যেতেন। বলতেন, ঐ মহাপাপীকে কেন যমে নেয় না? তখনো তাঁর মাসিক হত। তার সময় এলেই তিনি আরো বেশী উদ্দাম হয়ে উঠতেন। অবিরাম গায়ে গঙ্গা-মাটি ও গোবর লেপন করতেন। চীৎকার করে কাঁদতেন। সকলকে বলতেন, তাঁকে

জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলতে। পরবর্তী অধ্যায়ে এঁকে দেখা যায় গৃহভ্রষ্ট পথচারিণী রূপে। বিবস্ত্র, বিকৃত দেহে, রুক্ষকেশে, মাঝে মাঝে রাজপথে তিনি জিভ বের করে দু-হাত তুলে মা-কালী সেজে দাঁড়াতেন। আর অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে ও অনাবৃত দেহ উদ্ঘাটিত করে চারিদিকে লোক জড়ো করতেন।

এক অকৃতদার নিষ্ঠাবান অধ্যাপক প্রায় সাত-চল্লিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ পাগল হয়ে যান। এর যখন পঁচিশ বৎসর বয়স, প্রফেসারীতে সবে প্রবেশ করেছেন, তখন প্রতিবেশী একটি বালিকার সঙ্গে এঁর বিবাহের কথা হয়। হঠাৎ টাইফয়েড হয়ে মেয়েটি মারা যায়। তারপর থেকেই তিনি চিরকুমার থাকার সিদ্ধান্ত করেন। একটি ছোট বোন ছিল, তাকে তিনি নিজের আদর্শানুযায়ী শিক্ষা দিতে থাকেন এবং ঠিক করেন, দুই ভাই-বোন ওঁরা চিরদিন অকৃতদার থেকে দেশের ও সমাজের কাজ করবেন। ভদ্রলোকের বয়স যখন চল্লিশ, বোনটির উনত্রিশ-ত্রিশ, তখন পর্যন্ত ওঁরা এই আদর্শেই চলে এসেছেন। তারপর বোনটি দাদার সহকর্মী কোন অধ্যাপকের সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ হন। কিছুদিন পরে এর ফলে তাঁর সন্তান-সম্ভাবনা হয় এবং নিরুপায় হয়ে সব কথা তিনি দাদার কাছে ব্যক্ত করেন ও বিবাহের অনুমতি চান। দাদা অনুমতি ত দিলেনই না, ক্রোধ ও উত্তেজনায় অধীর হয়ে বোনকে প্রহার করে, বাড়ী থেকে বিদায় করে দিলেন। বলা বাহুল্য, মহিলাটি এর পর উক্ত অধ্যাপকের সঙ্গে বিবাহিত হলেন। এদিকে ভদ্রলোক ধীরে ধীরে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়লেন। চাকরি ছেড়ে দিলেন। বহিরঙ্গিক কর্মক্ষেত্র থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিলেন। সর্বদা গুম হয়ে থাকেন, কথা বলেন না, খান না, স্নান করেন না। এক-এক সময় কাঁদেনও। দেখতে দেখতে অল্পদিনেই তিনি পূরো উন্মাদ হয়ে পড়লেন।

তিনি ছিলেন উদ্ভিদতত্ত্বের অধ্যাপক, এ ছাড়া তাঁর ছিল ছবি আঁকার অভ্যাস। এই সময় থেকে দেখা গেল, হয় তিনি ক্ষুর নিয়ে বসে বসে শাক-সব্জীর ত্বকচ্ছেদ করেন, নয় নিবিষ্ট চিত্তে একা-একা ছবি আঁকেন। তাঁর অঙ্কিত ছবি কিছু কিছু আমি দেখেছি। বেশীর ভাগ নারী-মূর্তিতেই তাঁর ভগিনীর মুখের আদল ফুটেছে। আর তাকে কেন্দ্র করে ফুটেছে উন্মাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিকৃত মনের নানা ন্যক্কারজনক খেয়াল। নিখুঁত অঙ্গ-বিন্যাস সম্বলিত এই কদর্য ছবিগুলি কোন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানীর হেপাজতে আছে। এগুলিই উক্ত ভদ্রলোকের মনস্তত্ত্ব অনুধ্যানের সর্বোত্তম নিরিখ। কি তাঁর অবদমনের

আদি-সূত্র, কিসে তাঁর প্রকৃতিস্থতা ব্যাহত হয়েছে, কেন অমন সদাচারসম্পন্ন ভদ্রলোকের এই ভয়াবহ পরিণাম হল, সবই ছবিগুলো মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করলে বোঝা যায়।

অনুরূপ সংস্কৃতি ও সুরুচিসম্পন্ন এক সম্ভ্রান্ত মহিলারও হঠাৎ মস্তিষ্ক-বিকৃতি হতে দেখেছি। তাঁর স্বামী একজন দেশখ্যাত পণ্ডিত। তিনি নিজেও গ্র্যাজুয়েট। কিছু কাল কোন বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেছিলেন। কয়েকখানা শিশু-পাঠ্য গল্পের বইও লিখেছিলেন। অতিশয় রূপবতী, অত্যন্ত শান্তস্বভাব এই মহিলা পাগল হয়ে এমন সমস্ত আচরণ করতে লাগলেন, যা শুধু অসুন্দর নয়, অভাবনীয়। যখন-তখন বিবস্ত্র হয়ে নৃত্য করেন, অনুচ্চার্য কথাসমূহ উচ্চারণ করেন। এ-সবে বাধা দিলে চীৎকারে বাড়ী মাথায় করেন। সময়ে-অসময়ে জলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে ঘরে-দোরে আগুন দিতে যান। অনুসন্ধানে জেনেছি, মহিলাটির বয়স যখন পনেরো, তখন তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের দেড় বৎসর পরে তাঁর একটি কন্যা হয়। তারপরই তাঁর স্বামী তাঁর সঙ্গে দেহ সংস্রব ছিন্ন করে তাঁকে সাত্ত্বিক ভাবে 'মানুষ' করতে থাকেন। দর্শন-বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব পড়িয়েছেন, একের পর এক পরীক্ষা দিইয়েছেন, সংযম, শালীনতা ও বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে অবিরাম উপদেশ দিয়েছেন। এই স্বামী-নির্দিষ্ট পথেই এক-এক করে মহিলাটি ষোল-সতেরো বছর পাড়ি দিয়েছেন। নিজের কন্যাকেও তিনি ঠিক এই ভাবেই মানুষ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, মেয়ের তিনি বিয়ে দেবেন না। কিন্তু স্বামীর অভিপ্রায়ানুসারে শেষ পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দিতে হল। তারপর থেকেই সুরু হল তাঁর কেমন একটা ভাবান্তর।

এই সময় তাঁর ধারণা হল, তাঁর স্বামী কন্যা-জন্মের পর থেকেই পৌরুষহীন হয়েছেন এবং দাম্পত্য দায়িত্ব পালনের সেই অক্ষমতাকে তথাকথিত সাত্ত্বিকতার আড়ালে গোপন করে, তিনি তাঁকে আজীবন ফাঁকি দিয়েছেন। নইলে মেয়ের বেলা কেন তিনি এই একই সন্নীতির প্রয়োজন বোধ করলেন না? এই চিন্তার ফলেই একদিকে যেমন তাঁর আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল, অন্যদিকে তেমনি স্বামীর ওপর জাগল তাঁর তীব্র অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণা। পক্ষান্তরে জামাতাকে বেষ্টন করে একটা অসুস্থ কামনা মাথা তুলে দাঁড়াল। ফলে আপনা থেকেই কন্যাকে ঘিরে মনে কেমন-একটা অস্বচ্ছ ঈর্ষা ও অসন্তোষ ঘনীভূত হতে সুরু করল। বছর দুই এই ভাবে চলার পর সন্তান-সম্ভাবিতা কন্যা

প্রসব-বিভ্রাটে হঠাৎ প্রাণ হারাল এবং সেই আঘাতেই মহিলা উন্মাদ হয়ে গেলেন। তাঁর বিশ্বাস হল, জামাতা সম্পর্কে অনুচিত মনোভাব পোষণ করেছেন, কন্যার প্রতি বিদ্বেষ বহন করেছেন, তার ফলেই তাঁর এমন সর্বনাশ হয়েছে।

তখন থেকেই একটি মোমবাতি হাতে সর্বদা তিনি ঘুরতে আরম্ভ করলেন এবং বিড়-বিড় করে বকতে লাগলেন। তা-ই অনতিকাল মধ্যে উন্মত্ততায় পর্যবসিত হল। যে-বাস্তব কামনাকে তাঁর স্বামী তথাকথিত সুশিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন, তা-ই তখন বেরিয়ে এল তার ভয়াবহ নগ্ন চেহারা নিয়ে। আমিও মনে করি, মহিলার স্বামীর তথাকথিত শুচিতার কোন বাস্তব কারণ ছিল এবং তার বিপাকেই সংসারট নষ্ট হয়েছে।

আমি প্রধানত ভদ্র নর-নারীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি এই জন্যে যে তাঁদের আদি-ইতিহাস অনুমান করা সোজা। আর মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে তাঁদের চিত্ত-বৃত্তির গতি-প্রকৃতি অধ্যয়ন কবাও কিছুটা সুসাধ্য। কিন্তু অশিক্ষিত, দরিদ্র ও অসম্ভ্রান্তদের মধ্যেও উন্মত্ততার প্রসার কম নয়। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলে, তাদেব ক্ষেত্রেও অবদমনের ফলে উন্মত্ততা দেখা দেওয়ার দৃষ্টান্ত প্রচুর মিলবে। রব্বানি নামে এক টিনের মিস্ত্রী তার স্ত্রীকে এবং একটি শিশু কন্যাকে কোন অজ্ঞাত কারণে হত্যা করে। তারপর নিজেই রক্তমাখা কাটারি হাতে থানায় এসে হাজির হয় ও পুলিশকে এই হত্যাব বিবরণ বলে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে লোকটি পাগল এবং এই হত্যাকাণ্ড সে করেছে পাগলামির ঝোঁকেই। তখন তাকে উন্মাদাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অদ্যাবধি সে সেখানেই আছে। মানসিক স্বাস্থ্যের তার কিছুমাত্র উন্নতি হয়নি।

রব্বানির ইতিহাস যতটুকু সংগ্রহ করা গেছে, তাতে জেনেছি যে লোকটির একটি উপ-পত্নী ছিল। দেহ-সম্পর্ক তার ছিল প্রধানত তাবি সঙ্গে। স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ছিল না। এ অবস্থার স্ত্রীকে অন্তঃসত্তা হতে দেখে, তার নিদারুণ সন্দেহ হয় এবং যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সে তার গতি-বিধি লক্ষ্য করতে থাকে। কিন্তু কোন দিন কোন সন্দেহজনক ঘটনা তার চোখে পড়েনি। যতই নিজের ধারণা সম্পর্কে প্রমাণের অভাব হয়েছে, ততই সন্দেহ আর অবিশ্বাস তার অন্তরে বেশী করে বদ্ধমূল হয়েছে। বাইরে অবশ্য কিছুই সে প্রকাশ করেনি।

সে ঠিক করেছে, সন্তান আগে হক, তারপর তার মুখ-চোখ দেখে সে ঠিক করবে, কে তার পিতা। অন্তরে অন্তরে অসন্তোষের আগুনে দগ্ধ হয়ে মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করেছে সে। অবশেষে দাতব্য হাঁসপাতাল থেকে স্ত্রী যে মুহূর্তে নবজাত শিশু-সন্তান নিয়ে বাড়ী ফিরেছে, সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছে, এ সন্তান তার নয়। বিড়ি-বিক্রেতা জান মহম্মদের। তার সঙ্গে তার পরিবারের কোন সম্পর্ক নেই। তার স্ত্রী তাকে চেনে না। কোন দিন চোখেও দেখেনি। তবু এই ধারণা তাকে উন্মাদ করে দিল। সেদিনই সে মাতা-কন্যা উভয়কে হত্যা করে ফেলল। আপন প্রকৃতিস্থতার শেষ সম্বল টুকুকেও হত্যা করে বসল সেই সঙ্গে।

এক দিকে অসুস্থ, অসংযত জীবন, অন্য দিকে অধিকতর অসুস্থ সন্দেহ ও আক্রোশ, এ দুইয়ের ধারাবাহিক সঙ্ঘাতেই বেচারা মনের সুস্থতা হারিয়েছে। আমি মনে করি, কন্যা-সন্তান তারি। স্ত্রীও তার সাধ্বীই। কিন্তু সম্ভবত রব্বানি জানত না যে মাত্র একদিন দু-দিনের সহবাসেও নারী সন্তান-সম্ভবা হতে পারে। তাই সে সন্দেহ-বিষে জর্জরিত হয়ে নিজেও মরেছে, ওদেরও মেরেছে। হয়ত তার উপ-পত্নীর ঈর্ষ্যা এবং প্ররোচনাও সাহায্য করেছে তার এই মানসিক ব্যাধির পুষ্টিতে। অন্তত সেটা করাই স্বাভাবিক।

সৈরভী (সৌরভী ?) নাম্নী এক ছাব্বিশ বৎসর বয়স্কা বাল্য-বিধবা কোন ভদ্র পরিবারে পাচিকার কাজ করত। মেয়েটি অতিশয় নম্র, মিষ্টভাষী ও পরিশ্রমী ছিল। চাল-চলনও তার ছিল বেশ পরিমার্জিত, প্রশংসনীয়। হঠাৎ পেটের কি-একটা রোগে মেয়েটি মাসাধিক কাল শয্যাগত থাকে। তারপরই তার মাথার দোষ দেখা দেয়। বিনা কারণে হাসা, বিনা কারণে কাঁদা, হঠাৎ নেচে ওঠা দিয়ে সুরু হয়ে, অচিরেই সে হয়ে উঠল ঘোর উন্মাদ। বাড়ীর বৃদ্ধ কর্তাকে একদিন চেলা কাঠ দিয়ে নিদারুণ প্রহার করল। আর একদিন তাঁর মেজো ছেলেকে সর্বসমক্ষে জড়িয়ে ধরল। সব চেয়ে বেশী উপদ্রব সুরু করল সে বাড়ীর গৃহিণী ও বধূদের ওপর। এরপর ওখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সে আড্ডা নিল নিকটবর্তী এক ঘোড়ার গাড়ীর আস্তানায়। সেখানে অনেকেই তাকে দেখেছেন, ইতর ব্যক্তিদের সঙ্গের কদর্য ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে, বিবস্ত্র হয়ে নৃত্য করতে। এক-এক সময় পথিপার্শ্বস্থ ড্রেন ও ডাষ্টবিন হাঁটকাতে। সতর্ক অনুসন্ধানে জেনেছি, ঐ বাড়ীর অবিবাহিত মেজো ছেলেটির সঙ্গে সৈরভীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে সে উঠে আসত

তার কাছে। বৃদ্ধ কর্তা এটা কি রকম করে জানতে পারেন এবং একদিন তাকে নিভৃতে ডেকে এ জন্যে প্রথমে ভর্ৎসনা করেন। পরে জোর করে তার দেহ-স্পর্শ করেন ও তাঁর সঙ্গে কু-সম্পর্ক স্থাপন করতে অনুরোধ করেন।

মেয়েটি তাঁকে বাবা বলত। সে অনেক হাতে-পায়ে ধরল, কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত করতে পারল না। এই ঘটনার পরই মেজো ছেলেটির বিবাহ হয়ে গেল এবং সৈরভী সম্পর্কে তার আর রইল না কোন আকর্ষণ। বেচারী সৈরভী পড়ে গেল পুরোপুরি দুষ্প্রবৃত্তি পরায়ণ বৃদ্ধের কবলে। তারপরই তার পেটের ব্যারাম এবং তাতে শয্যাগত থাকা। খুব সম্ভব সে সন্তান-সম্ভবা হয়েছিল এবং কোন টোটকা ওষুধ খেয়ে পাতন করিয়েছিল। যাই হক, সর্বশেষে অধ্যায় হল সৈরভীর উন্মত্ততা। অল্পবয়সে বিধবা হয়ে তার চিত্তে জেগেছিল প্রবল একটি কামনা জনিত অতৃপ্তি। এটা উদ্রিক্ত ও সাময়িক ভাবে চরিতার্থ করেছিল মেজো ছেলেটি। কিন্তু সে-পথে যদি বাদ সাধলেন তার বৃদ্ধ পিতা, স্বয়ং তাকে অধিকার করে এবং মৎলব করে তাড়াতাড়ি পুত্রের বিবাহ দিয়ে। এতে একদিকে তার কামনা ও নারীত্ব যেমন আহত হল, অন্যদিকে অনভিপ্রেত বৃদ্ধের বাধ্যতামূলক সংসর্গ তেমনি তাকে বিরক্তি ও আত্ম-ধিক্কারে অস্থির করে তুলল। তার ওপর গর্ভ-পাতনের মতো ভয়াবহ ব্যাপার করল তার দেহ-মনকে বিপর্যস্ত। এ অবস্থায় দুর্বল চিত্ত-বৃত্তি সম্পন্ন গ্রাম্য তরুণীর পক্ষে প্রকৃতিস্থতা হারানো কিছুই আশ্চর্য নয়।

পতি-পরিত্যক্তা এক মাসী ও তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে থাকত দীনু বলে এক যুবক। কি-একটা দোকান-টোকান করত, তারি সঙ্গে কীর্তন গাইত এবং লুকিয়ে লুকিয়ে গাঁজা খেত। হঠাৎ কীর্তন করতে করতে একদিন সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর সেই অবস্থায় তাকে বাড়ী নিয়ে আসা হলে, সযত্ন শুশ্রূষায় তার সম্বিৎ ফিরল বটে, কিন্তু প্রকৃতিস্থতা তার অন্তর্হিত হয়ে গেল চিরদিনের জন্যে। মস্তিস্ক-বিভ্রান্তি তার এত উৎকট হয়ে দেখা দিল যে বর্ষীয়সী মাসীকে পর্যন্ত সে অনুচিত ভাবে আক্রমণ করতে উদ্যত হত। বলত, এসো দু-জনে রাধা-কৃষ্ণ হই। এর ফলে নিছক আত্ম-রক্ষার প্রয়োজনেই মহিলাকে সেখান থেকে পালাতে হল। দীনুও এরপর একেবারে ক্ষেপে গেল। এখন সে দক্ষিণ কলকাতার অলি-গলিতে ভাঙা হাঁড়ি ও ছেঁড়া

চট নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সময়-সময় কীর্তনও গায়। গলাটি তার এখনো বেশ মিষ্টি আছে।

আপাতত এইখানেই আমি থামব। মোটের ওপর দেখা গেল, কোন-না-কোন ভাবে অবদমিত যৌন-বৃত্তিই স্নায়ু দুর্বল নর-নারীর ক্ষেত্রে উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়। সাধারণত দেখা যায়, ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে নারীর এবং চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে পুরুষের মনোবিকার অধিক সংখ্যায় ঘটে থাকে। বয়ঃসন্ধিই সম্ভবত নানা কার্য-কারণ সূত্রে বিকৃতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। অবশ্য এই হিসাবের ব্যতিক্রমও পাওয়া যায়। অপরিণত বয়সে অর্থাৎ কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে যারা পাগল হয়, তারা তা হয় সাধারণত জন্মগত শারীর সংস্থানের ত্রুটিতে এবং তা-ও কোন-না-কোন আকারে যৌন-গ্রন্থির বিকৃতি বা অপরিপূর্ণতারই ফল।

একটি মেয়ের যখন প্রথম মাসিক সুরু হয়, তখন সে এ সম্বন্ধে কিছুই জানত না। সে একে ভয়াবহ একটা ব্যাধি মনে করে দুশ্চিন্তায় অভিভূত হয়ে পড়ে। পরে জ্যেষ্ঠাদের কাছে আনুপূর্বিক সব কিছুর ব্যাখ্যা শুনে কতকটা আশ্বস্ত হয় বটে, কিন্তু ভয় তার একটু থেকেই যায়। ইতিমধ্যে অজ্ঞাত কোন কারণে হঠাৎ কয়েক মাস তার ঋতু বন্ধ থাকে। এতে ঘটল আর এক বিপত্তি, সে ভাবল তার গর্ভ হয়েছে। এই দুশ্চিন্তার ধাক্কাতেই আস্তে আস্তে সে গেল উন্মাদ হয়ে। এখন সে রাঁচীতে আছে। মাঝে মাঝে সুস্থ থাকে। তখন পড়াশুনা করে, গান গায়। একটি ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীর ছাত্র তথাকথিত ব্রহ্মচর্য পালন করত এবং খাদ্যে পরিচ্ছদে সাত্ত্বিকতার আদর্শ মেনে চলত। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের আদর্শে শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তার স্বপ্নবিকার হত, উত্তেজনার তাগিদে এক-এক সময় কৃত্রিম উপায়ও অবলম্বন করতে হত তাকে। এরি মানসিক প্রতিক্রিয়া একদিন উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়। আমার বিশ্বাস অল্প-বয়সের উপযোগী করে যৌন-বিজ্ঞানের জ্ঞান পরিবেষণ করে দেওয়া হলে, এই শ্রেণীর বিপত্তি গুলো না ঘটতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমাদের পাঠ্যতালিকায় এ বিজ্ঞানকে এখনো পাঙক্তেয় বলে গণ্য করা হয়নি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সৌখীনতার অনাচার

সমাজ-জীবনের সর্বস্তরেই আইন ও নিয়ম-শৃঙ্খলাকে ফাঁকি দিয়ে ব্যাপক হারে পতিতা-বৃত্তি চলে, একথা আগেই বলেছি। উচ্চশিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন সমাজের একাংশে এই পাতিত্য যে ভ্রাম্যমান নাইট-ক্লাব এবং বার-রেস্তরাঁর একান্তে অনুষ্ঠিত হয়, তা বোধহয় এই কাজের কাজীরা ভিন্ন অনেকেই জানেন না। হোষ্টেল বাসিনী কলেজের ছাত্রী, মেসে-থাকা নার্স, শিক্ষয়িত্রী ও চাকরিজীবিনী তরুণীদের কতকাংশ ভদ্রবেশী নারী-দলালদের প্ররোচনায় আকৃষ্ট হয়ে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই এসে জোটে বড় লোকের বদ-ছেলেদের সঙ্গে এই সমস্ত মিশ্র-পার্টিতে। এখানে মদ্যপান ও জুয়া খেলা চলে। তারি সঙ্গে চলে নৃত্য-গীত, বে-আইনী ছায়াচিত্র প্রদর্শন এবং যথেষ্ট পরিমাণ অনাচার, কদাচার। দরাজ হাতে মোটা টাকার লেন-দেন হয়, আর সেই টাকার মোহেই গরীব ঘরের মেয়েরা নিজেদের মান-সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দেয়। অনেক সময় ভালো চাকরির বা উচ্চ সমাজে প্রবেশাধিকার পাওয়ার নেশাতেও তারা এই সব পথে পা দেয়। অবশ্য অতি-কৌশলী বা খেলোয়াড় প্রকৃতির মেয়ে হলে, এই জাল কাটিয়ে কেউ-কেউ শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে যেতে বা আখেরের ব্যবস্থা করে নিতে পারে। নইলে বাইরে ভদ্র মহিলা সেজে, ভেতরে ভেতরে ঘৃণ্য পথ আশ্রয় করেই তারা বেঁচে থাকে।

প্রাপ্ত যৌবনা ও শিক্ষিতা তরুণীদের মহলে অপেক্ষাকৃত বয়র্ষীয়সী এক জাতীয় মহিলাকে সর্বদা ঘোরা-ফেরা করতে দেখা যায়। এঁদের কথা-বার্তায় যেমন থাকে মার্জিত আধুনিকতার চটক, সাজ-সজ্জায় তেমনি থাকে লক্ষণীয় পদস্থতার ঔজ্জ্বল্য। স্বভাবতই অনভিজ্ঞ কুমারীরা এঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর এই আকর্ষণের সুযোগেই এঁরা তাদের সর্বনাশ করেন। কার কি রকম প্রবণতা সেটা লক্ষ্য করে, সেই রাজ্যের বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেই, মেয়েরা সেটা লুফে নেয়। কারু গান রেকর্ড করিয়ে দেবার, কারু রচনা মাসিক পত্রে ছাপিয়ে দেবার, কারুকে চাকরি জুটিয়ে দেবার লোভনীয় আশ্বাস দিয়েই এঁরা মেয়ে ধরেন এবং এই সব প্রলোভন নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণীদের কাছে কত বড়, তা আশা করি

বুঝিয়ে বলতে হবে না। কাজেই একবার এই সব দিদি বা মাসীমার খপ্পরে পড়লে, আর মেয়েদের উদ্ধার পাবার আশা কোথায়? বলা বাহুল্য এঁরা থাকেন সর্বঘাটে। রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান, সঙ্গীতের আসর, সাহিত্যের মজলিস. সর্বত্র এঁদের আনা গোনা। সুতরাং একটু ঘোরা-ফেরা করলে, এঁরা অনায়াসেই রকমারি প্রলোভন চরিতার্থ করতে পারেন মেয়েদের এবং তা করেই সুকৌশলে এঁরা নিজেদের দুরভিসন্ধী সার্থক করেন।

অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের অভিভাবক-সমাজেও এঁদের বিশেষ প্রতিপত্তি থাকতে দেখা যায়। তাঁরা এঁদের শিক্ষা-দীক্ষার ঔজ্জ্বল্য ও চাল-চলনের চমৎকারিতায় মুগ্ধ হয়ে মনে করেন, এঁদের সঙ্গে মেলা-মেশা করলে মেয়েরা সত্যিকার শিক্ষা-সহবৎ লাভ করবে, বড় সমাজে ওঠা-বসার এবং উপযুক্ত পাত্রে বিবাহিতা হবার সুযোগ পাবে। কাজেই তাঁরা কতকটা আগ্রহ করেই এগিয়ে দেন মেয়েদের এঁদের হাতে। তবে সাধারণত দেখা যায়, হোষ্টেল, মেস, নারী-সঙ্ঘ, মহিলা কল্যাণ-মূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যেই এঁদের চলা-ফেরার বহর বেশী এবং তার কারণ আর কিছুই নয়, সেখানে সন্দেহের অবকাশ কম, জবাব-দিহির প্রয়োজন আরো কম। অবশ্য বাইরে থেকে এঁরা অনেকেই একটা-না-একটা সম্মান সূচক পদ বা পদবীর অধিকারিণী। তাছাড়া অনেকে বিবাহিতা এবং সন্তান-সন্ততির জননীও। কাজেই সন্দেহ বড়-একটা এঁদের কেউই করেন না। আর যাতে তা না করেন. তার উপযোগী ছলা-কলাও এঁরা কম জানেন না। কেউ বিধবা-কল্যাণী, কেউ বস্তি-উন্নয়নে উৎসর্গীকৃত প্রাণা, কেউ অনাথ শিশুদের দুঃখে বিগলিত-হৃদয়া। কিন্তু আসলে ব্যভিচারিণী ও বদ-চরিত্র ধনী সন্তানদের আড়কাঠি।

আগেই বলেছি, এঁদেয় সাহায্যে মেয়েদের আয়ত্তে এনে যথেচ্ছাচার করা, তথাকথিত অভিজাত সমাজে ইদানীং একটা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জেনে না-জেনে, বহু মেয়ে প্রতিদিন এই ফাঁদে পা দিচ্ছে। এই সব ধনী সন্তান শিক্ষিত। অনেকেই সমাজ-জীবনে যা-হক একটা দায়িত্বজনক পদে অধিষ্ঠিত। বাজার-পতিতাদের নিয়ে বেল্লামি করার অবকাশ তাঁদের নেই। সমাজ-দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তাই গোপনে দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই হল এঁদের অভ্যাস এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তদের আথিক দারিদ্র্যের সুযোগেই সে-অভ্যাস এঁদের চরিতার্থ হচ্ছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলা-মেশার বা সংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ছুতো করে মেয়েরা এঁদের সংস্রবে আসে। তারপর বার-এ

নয়ত নাইট-ক্লাবে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে বাড়ী ফেরে। এই আত্ম-অপচয়ের বিনিময়ে এরা পায় লম্বা দক্ষিণা। স্বভাবতই দুর্নিবার লোভ তাদের পেয়ে বসে। নগদ টাকার আকর্ষণে অভিভাবকেরাও যে অনেক সময় সারল্যের ছলনায় এই অনাচারের প্রশ্রয় দেন এবং সাংসারিক অনটনের মুখ চেয়ে মেয়েদের এই সব কু-সংসর্গে ঠেলে পাঠান, এ আশা করি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা লক্ষ্য করে থাকবেন।

এই সব দুষ্কৃতির সাধারণত কোন নির্দিষ্ট আড্ডা থাকে না। সহরের উপকণ্ঠস্থিত কোন বাগান-বাড়ীতে, নয়ত সাধারণের পক্ষে জানার সুযোগ নেই এমন কোন নিরাপদ জায়গায়, গোপন কু-কর্মের আসর বসে এবং মোটরযোগে সৌখীন প্রেমিক ও প্রেমিকারা সেখানে গিয়ে জড়ো হন। যাওয়ার অজুহাতও থাকে অনেক রকম। লন-টেনিসের প্রতিযোগিতা, সাঁতারের পাল্লা, গানের মজলিস, মুক্তাঙ্গন নাট্যাভিনয়, ব্রিজ বা রানিং-ফ্লাস খেলা, বন-ভোজন, বিতর্ক-সভা, যাহক একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে সামনের পর্দায়, তারি আড়ালে চলে বদমায়েসী, দুর্বৃত্ততা ও কদাচার। সব ব্যাপারই অনুষ্ঠিত হয় নর-নারীর মিলিত উদ্যোগে এবং গোড়াতে যতই শিষ্টাচার বা আদব কায়দা থাক না কেন, শেষটা আসে প্রচণ্ড উলঙ্গতা, ইতরামি, হৈ-হুল্লোড়, মদ্যপান এবং যথেচ্ছাচার। এই সমাজে এ-সবের প্রচলিত পারিভাষিক নাম হল 'ন্যাক্ট কুলটুর' নগ্নতা মূলক সংস্কৃতি।

সাময়িক ভাবে নির্মিত বেদিং-পুলের এক দিক থেকে নিরাবরণা তরুণীরা ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে এগোয়, বিবস্ত্র যুবকেরা উল্টো দিক থেকে সাঁতরে এসে মধ্যপথে তাদের পাকড়াও করে, তারপর সেই স্বল্প জলে দু-দলে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকে, অভাব পক্ষে কয়েকটি পেট্রোম্যাক্স এবং সামান্য একটু অর্কেষ্ট্রার আয়োজন থাকে। জল-কেলির মতো স্থল-কেলিরও রকমারি দিক আছে। বিবস্ত্র তরুণীদের হাই-জাম্প ও লং-জাম্প হয়, আর বিবস্ত্র পুরুষের গজ-ফিতে নিয়ে সেই লাফের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতার পরিমাপ করে। দৌড়ের পাল্লায় একের পর এক করে তরুণীরা যখন নগ্নদেহে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে সাইন-পোষ্টে পৌছায় তখন তাঁদের সযত্নে ধরে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনুরূপ অনাবৃত-দেহ তরুণেরা এবং বলাই বাহুল্য, প্রতিযোগিতার উপসংহার-পর্ব নিষ্পন্ন হয় পর্যাপ্ত ইতরতায়।

কাঁচের চৌবাচ্চা থেকে দলবদ্ধ ভাবে যে Live Drink বা 'জ্যান্ত পান' হয়, তারও অল্প একটু বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক সভ্য এক বোতল করে মদ এই বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত স্ফটিক চৌবাচ্চায় ঢেলে দেবে, এই হল নিয়ম। তারপর চৌবাচ্চা যখন আধা-আধি ভরে উঠবে, তখন দুটি-তিনটি অনাবৃতাঙ্গ তরুণীকে নামিয়ে দেওয়া হবে তার মধ্যে। তারা সেই মদ্য-প্রবাহে হুড়োহুড়ি জড়াজড়ি করবে এবং সভ্যেরা চারিদিকে মণ্ডলাকারে মোড়ায় বসে রূপোর নল সহযোগে সেই জীবন্ত পানীয় শুষে নিতে থাকবেন। এরি নাম হল Live Drink। এছাড়া আছে ব্লু-ফিল্ম প্রদর্শন। এই ব্লু-ফিল্মের কথা আগেই বলেছি। সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নাট্যাভিনয়েও একই রকম ন্যাক্কারজনক বিষয়-বস্তুর সাক্ষাৎ মিলবে। অশ্লীল গানে ও ভাষণে, ততোধিক অশ্লীল আচরণে নাটকের আখ্যানাংশ যখন জমে ওঠে, তখন আর অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। সকলে বেপরোয়া জড়াজড়ি ও ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করে দেন। এই সব নাটকের অনেক বক্তৃতা ও গান সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু তা ছাপার অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা কোন সভ্য দেশে সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য, এ রকম আবহাওয়ায় যৌন-বৃত্তি অনিবার্য ভাবেই উদ্দাম হয়ে ওঠে। স্টেডিয়াম, বেদিং-পুল, স্টেজ, লাউঞ্জ, টেনিস-কোর্ট, পান-শালা, বিলিয়ার্ড টেবিল, সিঁড়ির কোণা, সর্বত্র তাই চলে অবাধ অবল্লিত অনাচার, কদাচার ও বিকৃতাচার। এই রকম উদ্যান-সম্মেলনের অভ্যন্তরে যে-সব অনাচার চলে, তার একটার নাম হল 'ফিগার'। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'অনেক রকম ফিগারেরই নমুনা পাওয়া গেছে। মাটিতে হাঁটু-গেড়ে বসা দুই বিবস্ত্র যুবকের কাঁধে দু পা রেখে, তাদের ঊর্দ্ধোত্থিত দুটি হাত ধরে, এক বিবসনা তরুণী উঠে দাঁড়াবে, আর তাদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে অনুরূপ অবস্থায় এক যুবক, দুই তরুণীর কাঁধে দু-পা রেখে। তারপর মাটিতে উপবিষ্ট নর-নারী চারজন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবে এবং দুই দল ধীরে ধীরে পরস্পরের সম্মুখীন হতে চেষ্টা করবে। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে এই অনুষ্ঠানের নাম হল 'জ্যাজ' বা মিশ্র-বাদ্য।

'জ্যুফিলিয়া' বা পশ্বাচারের অনুষ্ঠানও এই সব আড্ডায় কিছু কিছু চলার খবর পাওয়া গেছে। 'মাজল' বা মুখাবরোধ পরিয়ে মদ্যপানাসক্ত ল্যাপ-ল্যাণ্ডীয়াম বিচকে, বা সুইমিং পুলের ফেন্স-এ দাঁড় করিয়ে গর্দভীকে আক্রমণ

করা পুরুষদের মধ্যে যেমন চলিত আছে, মেয়েদের মধ্যে তেমনি আছে ছাউণ্ড নিয়োগ করা। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের বা পূর্বোল্লিখিত ফিগারাদির ফোটো তোলা এবং অন্তরঙ্গ মহলে তা বিতরণ করাও এই সমাজের বিশেষ একটি বিলাস। অনেক সময় চলন্ত ক্যামেরা সহযোগে এ-সবের ফিল্মও তোলা হয় এবং সেই ফিল্ম বিশেষ-বিশেষ অধিবেশনে ঘটা করে দেখা ও দেখানো হয়। এই জাতীয় ফিল্মেরই পারিভাষিক নাম হল 'ব্লু-ফিল্ম'।

মোটের ওপর তথাকথিত আধুনিকদের নাটক-ক্লাব, রাঁদেভো, সলোঁ-লা-পেতি প্রভৃতির এই হল ভেতরের ছবি। সমাজ-সৌধের যাঁরা তিন-তলা-চার-তলার বাসিন্দা, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কর্ম-যন্ত্রের যাঁরা বড়-বড় অধিনেতা, বাইরে যাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্ত নেই, বিদেশী ডিগ্রী, বড় চাকরি, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ও বাড়ী-গাড়ীর দৌলতে যাঁরা 'বড়মানুষ' রূপে সর্বজন মান্য, সর্বদৃষ্টির আড়ালে তাঁদের বৃহৎ একাংশ এই ভাবে দিনের পর দিন অজস্র অর্থের বিনিময়ে দুষ্কৃতি, ব্যভিচার ও বজ্জাতি খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন, আর গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা, বৌরা কখনো বা টাকার প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে, কখনো বা কিছু না বুঝেই এই সব ভৈরবী-চক্রে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কি ভাবে তারা এই আবর্তে আসে, কারা কি কৌশলে তাদের ভুলিয়ে এই সব পাপের বাসায় নিয়ে আসে, সে কথা আগেই বলেছি।

এই খানে বলে রাখি যে এই সব মিশ্র-মজলিস বাইরে থেকে দেখতে যদিও নিছক স্ফূর্তিবাজীর আড্ডা এবং ফরাসী, জার্মান ও মার্কিন-মুল্লুকের গোপন উলঙ্গ-উপনিবেশেরই এগুলি ভারতীয় সংস্করণ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এগুলির উদ্দেশ্যে এবং কাজ-কারবার শুধু এই টুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। বড় বড় ব্যবসা ও কণ্টাক্টের দালালি, চাকুরির লেন-দেন, রাজনীতিক দল ভাঙা-ভাঙি, মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির-তল্লাস, খুন খারাপি ও ব্ল্যাক-মেলিং-এর প্ল্যান, এমন কোন ব্যাপার নেই, যা এই সমস্ত আড্ডাখানার হৈ-হুলোড়ের আড়ালে নিঃশব্দে অনুষ্ঠিত না হয়। স্বার্থ ও সুযোগান্বেষী গৃহস্থদের কতকাংশ এই সব বড় ব্যাপার থেকে চুঁইয়ে পড়া ছিটে-ফোঁটা প্রসাদের আশায় অনেক সময় জেনে-শুনেও নিজেদের বৌ-ঝিকে এর মধ্যে নিক্ষেপ করেন। এমন কি, পদোন্নতির আশায় বা বিশেষ প্রাপ্তির লোভে মোটামুটি সম্মাননীয় ব্যক্তিকেও এই সব কু-কার্যে মাথা গলাতে দেখা গেছে। মনে রাখতে হবে, এই সব সংস্কৃতিমান বামাচারীদের ভেতর প্রায় সব রকম ক্ষমতাপন্ন পদ ও পদবীর

লোকই থাকেন এবং তাঁরা কৃপা করলে, যেমন অনেকের বরাত খুলে যেতে পারে, তেমনি অকৃপা করলে সর্বনাশ হতেও দেরী লাগে না।

এই সমস্ত বৃহৎ ভ্রাম্যমাণ ক্লাবেরই আবার ছোট-ছোট 'পকেট সংস্করণ' আছে। সেগুলো অনুষ্ঠিত হয় বড়-বড় হোটেল বা বার-এর নিভৃত কেবিনে, নয়ত কাছে-পিঠে বাগান-বাড়ীতে এবং সেখানে কর্ম-তালিকা যথাসম্ভব ছোট করে ছকে নেওয়া হয়। যারা চট করে পেশাদার হতে পারে না, বা আদৌ হতে চায় না, অথচ নিজস্ব বা পারিবারিক প্রয়োজনে অর্থোপার্জন ও সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্যে আত্ম-বিক্রয় ছাড়া অন্য উপায় নেই বোঝে, প্রধানত তারাই সঙ্গোপনে এই সব আড্ডায় এসে জোটে। ভাড়াটে ট্যাক্সী চেপে, চোখে নীল গগলস ও হাতে দস্তানা পরে, ঘোমটা টেনে, যতটা সম্ভব আত্ম-গোপন করেই তারা ব্যবসায় বের হয়। সঙ্গে কেউ নেয় একটা সেতার, কেউ কয়েক খানা বই, কেউ একটা টেনিস-র‍্যাকেট এবং বিশেষ-বিশেষ আখড়ার বয়, বেয়ারা, আর্দালিদের সঙ্গে তাদের এমন জান-পহচান থাকে যে পৌছানো মাত্র তারা তাদের চুপি-চুপি যথাস্থানে পাচার করে দেয়। আবার ঠিক অনুরূপ ভাবেই ফেরার বেলাও গাড়ীতে তুলে দেয়।

এদের কাছে তল্লাসী করলে জন্মনিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি, হাতে-লেখা বা ছাপা অশ্লীল বই, কুৎসিত ছবি, ব্রাণ্ডির শিশি, প্ল্যাস্টিকের কনসোলেটার, অনেক অদ্ভুত জিনিষ পাওয়া যায়। কিন্তু সোসাইটি-গার্লের ভদ্র পরিচয়ে চলে বলেই, সন্দেহ এদের কেউ করে না, আর করলেও, মুখে তা ব্যক্ত করার সাহস পায় না। বাড়ীর লোকে এবং পাড়ার লোকে অনেক সময় অনেক জিনিষ টের পায়। কিন্তু নানা কারণে বাধ্য হয়ে সবাই সব চেপে যায়। এই ভাবেই গোপন পাপ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং একটি মেয়ে এই সর্বনাশা নেশার স্বাদ পেয়ে, আর পাঁচটিকে কৌশলে সেই পথে আকর্ষণ করছে।

এইখানে বলে রাখা দরকার যে এদের মধ্যে অপত্য-সম্ভাবনা বা কুশ্রী ব্যাধি হলে, নিঃশব্দে তার প্রতিবিধান করার মতো ব্যক্তি এবং ব্যবস্থা আছে। খুন-খারাপি হলে, বা মামলা-মোকদ্দমা বাধলে, তা থেকে ছাড়িয়ে আনার লোকের অভাব নেই। এই সব গোপন সম্মেলনের ফলাফল চিরদিন গোপনই থাকে। কদাচিৎ অসতর্কতায় দু-একটা প্রকাশ পেয়ে যায় অবশ্য এবং তা গেলে, তখনই তা নিয়ে হয় হৈ-চৈ গণ্ডগোল। যেমন হয়েছিল কোন কলেজের ছাত্রীর অপ-মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে। কিন্তু সাধারণত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা

দূরে বসে অর্থ ও ক্ষমতার জাল ফেলেই অদৃশ্য হাতে মেয়েদের টানে এবং মেয়েরা প্রাণের দায়ে ধরা দিলেও, মানের দায়টা বাঁচিয়েই চলে। কাজেই এই সব দুষ্কৃতির ইতিহাস হাজারকরা একটাও বাইরে প্রকাশ পায় না।

কালে-ভদ্রে এই সব আড্ডা থেকে হঠাৎ কোন ছেলের সঙ্গে কোন মেয়ের বিবাহ হয়ে যায়। কিন্তু দেখা গেছে, বিয়ের ফলে উক্ত তরুণী নামে-মাত্র মিসেস একটা কিছু হয়েছেন। কাজে আগের মতোই অনেকের সহচরী থেকে গেছেন। স্বামীটিও তাতে বড় বেশী গা করছেন না, কারণ বহুনিষ্ঠ অশুচি জীবনে এই শ্রেণীর বিবাহের মূল্য বা মর্যাদা কতটুকু? এই সব তথাকথিত বিবাহিতারাই হল সব চেয়ে ভয়ঙ্কর, কারণ এরাই হল মেয়ে-ধরার প্রধান আড়কাঠি। নিজেদের ক্রম-ক্ষীয়মান পসার বাঁচানোর উপায় হিসাবেই এরা মক্কেলদের জন্মে নিত্য নূতন মেয়ে জুটিয়ে আনতে এবং তা থেকে মোটা টাকা হাতাতে থাকে। এই সমস্ত শিক্ষিতা নব্য কুট্টনীর কবল থেকে মেয়েদের বাঁচানো বড় কঠিন। এরা কুমারীদের সমাজে যায় আসে, মেলে-মেশে, রকমারি ছদ্মবেশে তাদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা আকর্ষণ করে, ধীরে ধীরে তাদের আয়ত্ত আনে। তারপর নানা চাতুর্য ও ফন্দী-ফিকিরের সাহায্যে আস্তে আস্তে জৈব ব্যাপারে তাদের সজাগ ও আগ্রহশীল করে তোলে। গোপনে তাদের অনুচিত চিত্রাদি দেখায়, নিষিদ্ধ বই পড়ায়, অসুন্দর গল্প শোনায়। এই ভাবে স্নায়বিক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত করে, সকলের অগোচরে গাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার ও ফিরিয়ে আনার নিশ্চিত আশ্বাস দেয়। এই ভাবেই পদস্খলন ঘটে বেশীর ভাগ মেয়ের।

কিন্তু এ কৌশলটা সাধারণত খাটে চোদ্দ থেকে সতেরো-আঠারো পর্যন্ত বয়সের কাঁচা মেয়েদের ওপর। সদ্য-জাগ্রত প্রবৃত্তির কৌতূহলটা মেয়েদের থাকে এই বয়সে সব চেয়ে বেশী। তা চরিতার্থ করার তাগিদটাও থাকে প্রবল। অথচ সাংসারিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে সে জন্মে ভয়-ভাবনা থাকে নিতান্ত কম। তারা তাই অতি সহজেই ধরা দেয়। দুর্বৃত্ত-মহলে এই সব কিশোরীর কদর সর্বাধিক। এরা হল 'দেবুতাঁত' অর্থাৎ আনকোরা নূতন। সুপক্ক বা অনতি পক্কদের সঙ্গে জোটবদ্ধ করেই তারা এদের প্রথম পাকায়। তারপর স্থান-ধর্মে এরাও মানুষ হয়ে ওঠে। তখন এরাই আবার নবাগতাদের পাকানোর ভার নেয়। কিন্তু বয়স যাদের একটু বেশী, এই কুড়ি, বাইশ, চব্বিশ বা তারো ওপরে, তাদের ঠিক এই ভাবে প্ররোচিত করা সহজ

নয়। তাদের জন্যে দরকার হয় নকল ইন্টেলেকটের এবং সেই সঙ্গে নিপুণতর দূতিয়ালীর। বলা বাহুল্য, সে বিষয়েও এই সব শিকারিণীদের দক্ষতার অভাব নেই।

রাজনীতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, রকমারি ছদ্মবেশে এরা ঐসব তরুণীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। ছিটে-ফোঁটা সুযোগ-সুবিধাও মাঝে-মাঝে করে দেয় একে-তাকে। এই ভাবে যখন তারা বেশ একটু কায়দায় এসে যায়, তখন বৈজ্ঞানিক যুক্তির দোহাইয়ে দুষ্ক্রিয়ায় দীক্ষা দিলে, অনেকেই তার গতি রোধ করতে পারে না। যেখানে তাতে ফল হয় না, সেখানে দারিদ্র্যের দিকটা উস্কে দিয়ে এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশাপ্রদ চিত্র উদ্ঘাটিত করে, প্রলুব্ধ করা হয়। এই দ্বিতীয় কৌশলটা শিক্ষিতা কুমারী ও ভদ্র বধূদের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিপজ্জনক ভাবে অনতিক্রম্য। দেশব্যাপী বেকার দশা ও জীবন-যাত্রার মানের ক্রম-বর্ধিত চাহিদাই প্রশ্রয় দেয় জিনিষটাকে।

এই ভাবেই গোপন পাপ তার ডাল-পালা বিস্তার করে চলে, অথচ বাইরে থেকে তার বিন্দু-বিসর্গও কেউ টের পান না। অবশ্য আকস্মিক অবস্থা-স্ফীতি, বাড়ীতে মূল্যবান গাড়ীর আনাগোনা, অজানিত কারণে কুমারী কন্যার কিংবা তরুণী বধূর দু-চার দিন বা অনেক দিন বাড়ীতে অনুপস্থিতি ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে প্রতিবেশী মহলে কানাঘুষো চলে। কিন্তু হাতে-কলমে কোন কিছু কেউ প্রমাণ করতে পারেন না। মেস বা হোষ্টেলবাসিনীদের ত কথাই নেই, পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গের সঙ্গে যারা বাস করে, তাদেরও না। একমাত্র বিড়ম্বিতা 'দেবুতাঁত' বা কোন সময় এই চক্রে ছিল, তারপর কতকটা কাজ গুছিয়ে নিয়ে কৌশলে বেরিয়ে এসেছে, এমন সব মেয়েদের স্বীকারোক্তি থেকে, ঐ সব দুর্বৃত্তদের সাঙ্গ-পাঙ্গ সুহৃৎ-সহযোগীদের সতর্ক আলাপ-আলোচনা থেকে এবং পুলিস ও আদালতে উপস্থাপিত দু-চারটি মামলার ব্যাপার-বৃত্তান্ত থেকে এই মুল্লুকের কতকটা আভাষ সাধারণে পেয়ে থাকেন। স্বভাবতই কিছুটা গুজব ও গাল-গল্প এ-সবের সঙ্গে এসে মেশে। কিন্তু তাই বলে সবই যে বাজে বা অলীক নয়, বেশীর ভাগই যে নয়, তা প্রমাণ করার মতো দলিল-দস্তাবেজ অনেকের সংগ্রহে আছে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা দরকারী কথা বলার আছে। সমাজ-জীবনে যাঁরা উচ্চ পদ ও পদবীর অধিকারী, সেই অবস্থাপন্ন ও তথাকথিত আধুনিক সম্প্রদায় শুধু নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে ও বৌদের ছলে-বলে দুষ্কৃতির

পথে টেনেই ক্ষান্ত থাকেন না, স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাঁরা যথেচ্ছ কদাচার ও দুষ্কৃতির অনুষ্ঠান করেন। যেগুলো স্ত্রী-পুরুষের সম্মতিমূলক ব্যভিচার, তার কথা এখানে অনালোচ্য। কিন্তু স্বার্থ ও সুবিধা সাধনের জন্যে যেখানে এক স্বল্প প্রভাবশালী ব্যক্তি আর একজন অধিকতর প্রভাবশালী ব্যক্তির হাতে আপন মেয়ে-বৌকে ঘুষ হিসাবে সঁপে দেন, সেখানে তাকে গোপন পাতিত্যের উপস্বত্ব ভোগই বলতে হবে। তথাকথিত উচ্চ সমাজে সে-রকম ঘটনার পরিমাণও যে কম নয়, তা আশা করি এই সমাজের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল লোকেরা বিনা তর্কে স্বীকার করবেন। বলা বাহুল্য, উচ্চ চাকুরিয়া-সমাজেই এই গোপন পাপের পরিব্যাপ্তি সব চেয়ে বেশী। এমন কি, পদোন্নতি ও ভাগ্য-পরিবর্তনের এ ছাড়া ইদানীং দ্বিতীয় পথ নেই, এমন কথা বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

কোন বিশিষ্ট রাজ-কর্মচারী চাকুরি স্থলে এমন একটি অপকার্য করে ধরা পড়েন, যাতে তাঁর চাকুরিচ্যুতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারাদণ্ড হতে পারে, এমন আশঙ্কাও কেউ-কেউ করেছিলেন। তখন অনন্যোপায় হয়ে গোপনে স্ত্রীকে পাঠালেন তিনি তদন্তকারী উচ্চতর কর্মচারীর কাছে। স্ত্রীটি ছিলেন রূপবতী, সুশিক্ষিতা এবং চলন-বলনে আধুনিকা। কি কৌশলে জানি না, তিনি তদন্তের গতি আমূল ওলট-পালট করে ত এলেনই, স্বামীর পদোন্নতি এবং বিভাগান্তরে পুনঃ স্থাপনও সম্ভব করে এলেন। এর পরে ঐ বড় চাকুরিয়াটির সঙ্গে এই মহিলার সম্পর্ক দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠ হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আর গোপনীয়তার মধ্যে রইল না। খানসামা পেয়াদা, পিয়ন, সবাই সব জানল। কিন্তু অত উঁচু তলায় যাঁদের বাস, তাঁদের গায়ে কি আর এই সব ক্ষুদ্র কুৎসা-কলঙ্কের আঁচ স্পর্শ করে? এক মাঝারি স্তরের সরকারী কর্মচারীর কন্যা কোন বিদেশী উপর-ওয়ালার নেক-নজরে পড়েন এবং তাঁরি দৌলতে পিতার দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। অবশেষে এই তরুণীকে কেন্দ্র করে অন্য এক অনুরূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির প্রণয়-পিপাসা অদম্য হয়ে ওঠে এবং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিককে সমান ভাবে নাচিয়েই, কৌশলী তরুণী নিজের ও পিতার জন্যে সৌভাগ্যের ফসল কুড়িয়ে চলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বন্দুকবাজী ও বিশ্রী কেলেঙ্কারিতে এই নাটকের যবনিকা পাত হয়। কিন্তু তারপরেও সেই তরুণী অন্য এক জন অ-ভারতীয়ের কৃপা অর্জন করে পুরানো পসার জমিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। এখন তিনি এক জন নামী অফিসারের পত্নী।

দুই ভগিনীতে এক অবাঙালী উচ্চ কর্মচারীর প্রণয়াকর্ষণ নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার এবং জ্যেষ্ঠ ভগিনীর প্ররোচনায় উক্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি নিয়োজিত গুণ্ডাদের দ্বারা কনিষ্ঠা ভগিনীটি গায়েব হওয়ার, অবশেষে উদ্ধার পেয়ে, তাঁর অন্য এক বড় চাকুরিয়ার পত্নীত্ব লাভের একটি নাটকীয় ঘটনাও আমার সংগ্রহে আছে। দুই ভগিনীতে পরে মিলন হয়েছিল এবং দু-জনে পরস্পরের সহায়ক রূপে ইঙ্গ-বঙ্গ মহলে একযোগে ধনাহরণের ব্যবসা চালিয়েছিলেন, এমন কথাও চেষ্টা করলে প্রমাণ করা যাবে। মাতা ও কন্যায় একযোগে এক বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যভিচার করার এবং তা থেকে অর্থাহরণ করার একটি কদর্য ঘটনা সম্ভবত অনেকের জানার সুযোগ হয়েছিল, কারণ বিষয়টা কাগজ-পত্রের মধ্যে এসে পড়েছিল। কন্যাটি তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন যে তাঁকে প্রহরায় নিযুক্ত রেখে, তাঁর জননী দুষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হতেন এবং তাঁর এই কু-কার্যের সহযোগী কয়েকটি নরাধমের উৎপীড়নে তাঁকেও শেষ পর্যন্ত এই বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়সী মাতা তরুণ যুবকদের হাতে রাখার উপায় হিসাবেই বোধহয় তরুণী কন্যাকে বলি স্বরূপ উৎসর্গ করেছিলেন এবং পিতা সব জেনেও কিছু বলতেন না, যেহেতু এই পথে তাঁর তহবিলের পরিসর ক্রমশ স্ফীত এবং পদ-গরিমা বর্ধিত হচ্ছিল। এই বিড়ম্বিতা তরুণীর পরে অভিনেত্রী রূপে আবির্ভাব সবাই দেখেছেন।

এই ইঙ্গ-বঙ্গ বা তথাকথিত এরিস্টোক্র্যাট সমাজের নৈতিক অসংযম ও চারিত্রিক অশুচিতা ইংরেজীয়ানার অন্ধ অনুকরণ থেকে জন্মেছে এবং ভাগ্যান্বেষী পুরুষদের নিঃশব্দ সমর্থন ও কদাচারী ক্ষমতাবানদের বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতাই একে সযত্নে পোষকতা করে চলেছে। দাম্পত্য-বিরোধ, পুত্র-কন্যার সঙ্গে পিতা-মাতার ছাড়াছাড়ি, ভ্রূণ-হত্যা, খুন, ব্ল্যাক-মেলিং নানা কুশ্রী ব্যাপারই অনেক সময় এই সমাজে সংঘটিত হয় এবং মূলানুসন্ধান করলে দেখা যাবে, গোপন পাতিত্যেরই তা অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। কোন বিশিষ্ট পরিবারের একটি তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের মেয়েকে এক দিন সকালে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত। কানা-ঘুষোয় প্রকাশ পায়, আগের দিন দুপুরে মেয়েটি নাকি পারিবারিক চা-চক্রে সম্মিলিত হতেন, এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তার জননীর সঙ্গে বিশ্রী অবস্থায় দেখে। এর পর মেয়েটির সন্দেহজনক মৃত্যুকে হয় ধিক্কার-জনিত আত্মহত্যা, নয় দুরভিসন্ধী জনিত হত্যা বলে মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু বড় ঘরের কথা, এ নিয়ে

তাই কেউ টুঁ শব্দটি করল না। আর একটি বালক অনুরূপ অবস্থায় তার ভগিনী ও এক ভদ্রলোককে ছুরি মেরেছিল। এই বালককে জেরা করে জানা যায় যে সে উক্ত যুবককে তার ভগিনীর সঙ্গে অসভ্যতা সূচক ব্যবহার করতে দেখেছিল। এতে সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয় এবং ক্রোধের আতিশয্যেই উভয়কে ছুরিকাঘাত করে। এই সঙ্গেই সে জানায় যে সে পাগল নয়, সে ওদের দুষ্কৃতি স্বচক্ষে দেখেছে বলেই, এখন তাকে পাগল সাজানো হচ্ছে।

এই সমাজে বয়স্ক নর-নারীর অপকার্যে দূতিয়ালী করতে অভ্যস্ত নাবালক ছেলে-মেয়েদের কি রকম অধঃপতন হয়, তা-ও মাঝে মাঝে জানার সুযোগ হয়েছে। যাতে দু-পক্ষে চিঠি চালাচালি, ইতস্তত আনা-গোনা ও অনুচিত আদান-প্রদানের কথা তারা কারু কাছে প্রকাশ না করে দেয়, তার জন্যে টের পেয়েও ছেলে-মেয়েদের এই অধোগতিকে অভিভাবকরা অনেক সময় নীরবে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। পশ্চিম বাংলার এক মফঃস্বল সহরে জনৈক সম্রান্ত ব্যক্তির কন্যা প্রতিপত্তিশালী কোন ব্যক্তির সঙ্গে মোটরে প্রতিদিন বেড়াতে যেতেন। সঙ্গে যেত একটি দশ-এগারো বছরের বাচ্চা মেয়ে, পারিবারিক সতর্কতার প্রতিনিধি রূপে। দুঃখের বিষয়, চকোলেট, কলম, স্কিপিং-রোপ ইত্যাদি ঘুষ দিয়ে বাচ্চা মেয়েটিকে বশীভূত করে, তার উপস্থিতিতেই উভয়ে অন্যায়ে প্রবৃত্ত হত এবং মেয়েটি তা প্রকাশ করত না। ক্রমে তার ওপরও রকমারি উপদ্রব আরম্ভ হয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে সে-ও গড়িয়ে পড়ল পাপের পথে। অবশেষে কঠিন একটা ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে, মেয়েটি সব প্রকাশ করে ফেলল। পিতা কর্তৃক মাতার পিছনে গুপ্তচর রূপে নিয়োজিত আর একটি পনেরো বৎসর বয়স্ক বালক কি ভাবে কোন অবাঙালী ধনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল, তার কাহিনীও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু আর বোধহয় দরকার নেই তার।

সুতরাং নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাই শুধু অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমাজাদর্শের বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত হয়ে চোরা পাতিত্যের আশ্রয় নিচ্ছে না, উচ্চ মধ্যবিত্ত বা চলতি হিসাবে বড় লোকেরাও এই যে পাপ ব্যবসায়ে আকণ্ঠ ডুবতে সুরু করেছে, এ আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন। এই অন্তঃ-প্রবাহী পাপ বৃত্তিকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে এখনো ধামা চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা হয়। কিন্তু সম্পন্ন পরিবারে এটা ক্রমেই খোলাখুলি হতে চলেছে এবং তাকে উচ্চাঙ্গের আধুনিকতা বলে চালানোরই চেষ্টা হচ্ছে। ওদের

সমাজে এটা mixed friendship বা নর-নারীর বন্ধুত্ব নামে চলে এবং ওদের জাল দেওয়া এলো-খোপা, ম্যানিকুয়োর করা রঞ্জিত নখ, কালো কসমেটিক বুলানো ভ্রূ ও হাই-হিল মণ্ডিত চরণ গরীব গৃহস্থ মেয়েদের মনে অনিবার্য ভাবেই ঈর্ষ্যা উদ্রিক্ত করে। এই ঈর্ষ্যার দাহনই তাদের আরো বেশী করে প্রতিদান-মূলক বন্ধুত্বের জন্যে ব্যাকুল করে তুলছে। তার ফলেই অফিস কোয়ার্টারের আনাচে কানাচে এ্যারিষ্টোক্র্যাট তরুণীদের এবং নাইট-ক্লাব, রেস্তরাঁ ও বাগান-বাড়ীর অন্ধকারে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মেয়েদের গোপন আনাগোনা প্রত্যহ চলছে বহুল পরিমাণে। লজ্জা-সরম বিসর্জন দিয়ে প্রকাশ্য হবার মতো শক্তি বা সাহস হয়েছে খুব অল্প সংখ্যকেরই, কারণ সমাজের কাঠামো এখনো ততটা বদলায় নি।

সব শেষে বলে রাখি যে আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে সম্মতিমূলক ব্যভিচার, ভৃত্য, পাচক ও বাবুর্চি প্রভৃতির সঙ্গে অনাচার এবং এই শ্রেণীর অপরাপর ব্যাপারকে আমি এই তালিকায় ধরিনি। তার কারণ, সে-সব ব্যাপার ঠিক অর্থকরী বা উপার্জন-বুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে এই সমাজে সে জিনিষেরও পরিসর কত বড় এবং সমাজের পক্ষে তা-ও কত খানি বিপদের কথা, তা সমাজ-সচেতন পাঠক-পাঠিকা অবশ্যই আন্দাজ করতে পারবেন।

ষোড়শ অধ্যায়

দুর্নীতির ব্যবসায়

প্রত্যক্ষ ভাবে যারা অপরাধ করে, আর যারা পিছন থেকে অপরাধের প্রেরণা বা উপকরণ জোগায়, আইন তাদের দু-পক্ষকেই অপরাধী বলে গণ্য করে। কিন্তু সাধক, ফকির, উদাসী, অবধূত প্রভৃতির ছদ্মবেশে শত শত লোক এ দেশে যত বিচিত্র অপরাধের উদ্দীপনাও উপকরণ জোগায়, তা তথাকথিত অপরাধীরা করে না। কোনদিন তবু তারা দণ্ডিত হয় না। বশীকরণ, স্তম্ভন ও গর্ভ-পাতনের ব্যবসায়ে নিয়োজিত অজস্র লোক এ দেশের পল্লী-জীবনকে দিনের পর দিন অজ্ঞানতা ও অনাচারে বিধ্বস্ত করে চলেছে। তাদের কার্য-কলাপ হাজার-হাজার নর-নারীকে বিপথগামী, উচ্ছৃঙ্খল ও অপকর্মকারী করে তুলছে। অথচ অশিক্ষা ও অনগ্রসরতা বশে এগুলো যে অন্যায় বা অনুচিত, মানুষ তা বুঝতেও পারছে না। অর্থাৎ সমাজ প্রকারান্তরে এই দুর্নীতির ব্যবসায়কে প্রশ্রয়ই দিচ্ছে বলা যেতে পারে। এ-সব অপরাধ সহরেও অনুষ্ঠিত হয় এবং তার পদ্ধতি ও উপকরণ একটু স্বতন্ত্র রকম হলেও, ফল যে একই, তা আমি এর আগে দেখিয়েছি। কিন্তু গ্রাম্য জীবনের আনাচে কানাচে শিক্ষিত জনের অগোচরে এ সব ব্যাপার কি ভাবে নিষ্পন্ন হয়, তার বিবরণ হয়ত সহুরে মানুষরা জানেন না। সেই কারণেই এ প্রসঙ্গ বিশদ ভাবে আলোচনা করার যোগ্য।

নর-নারীর মধ্যে অবৈধ অনুরাগ সৃষ্টির উপায় হিসাবে বশীকরণ বিদ্যার প্রচলন এ দেশে আছে অনেক দিন থেকে। কোকার কামশাস্ত্রে, কোন কোন তন্ত্রে এবং আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুঁথি-পত্রে বশীকরণ তত্ত্বের উল্লেখ দেখ যায়। নানা রকম তুক-তাক বন্ধ-ধন্ধ, মাদুলী ও কবচ বশীকরণের উপায় রূপে ব্যবস্থিত হয় এবং তান্ত্রিক, বাউল ও ফকির জাতীয় শুভানুধ্যায়ীরাই ছদ্মবেশে সমাজ-জীবনে প্রবেশ করে এই সব জিনিষের লেন-দেন করে। প্রকৃত পক্ষে বশীকরণ বিদ্যা বলে কোন বিদ্যা আছে কি না এবং তাতে সত্যিই কোন ফল হয় কি না, তা নিয়ে তর্ক তোলা নিরর্থক। অনেক রকম অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের মতো এই বিশ্বাসও সমাজের মর্মদেশে বহুকাল থেকে বদ্ধমূল রয়েছে

এবং অসংযত চরিত্র নর-নারীরা গোপনে এই সবের সহায়তায় দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্যোগ করে, লোকালয়ে দুর্নীতির প্রসার ঘটিয়ে চলেছে।

অনুসন্ধানে দেখেছি, অনেক রকম টোটকা ও গাছ-গাছড়া বশীকরণের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যে গরুর এক শিং ঊর্ধ্বমুখী, এক শিং অধোমুখী, তার কপালের রোঁয়া অথবা আগাগোড়া কালো, কপালে ঈষৎ শাদা ছাপ-বিশিষ্ট ভেড়ার চিবানো চাল, অথবা বশীকরণেচ্ছু নর-নারীর মূত্র, থুতু, শুক্র, স্রাব ইত্যাদি আবধৌতিক মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে শোধন করে উদ্দিষ্ট নারী বা নরের দেহে খাদ্য-পানীয়ের সাহায্যে চালান করে দেওয়া হয়। যেখানে এ-সবের সুযোগ নেই, সেখানে বশীকরণেচ্ছু নর বা নারী স্ব-দেহে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত কবচ বা তাবিজ ধারণ করে উদ্দিষ্ট নারী বা নরের দেহ স্পর্শ করলে, এমন কি, সান্নিধ্যে এলেও নাকি সে বশীভূত হয় এবং আপন বুদ্ধি-বিবেচনা ও যুক্তি-সংস্কার বিসর্জন দিয়ে ছায়ার মতো প্রয়োগকারীর পশ্চাদনুসরণ করে।

এছাড়া তেল-পড়া, নুন-পড়া, ধূলো-পড়া, সরষে-পড়া, ঘর-বন্দী, উঠান বন্দী আরো নানা রকম তুক-তাক ও মন্ত্র-তন্ত্র প্রচলিত আছে, যা বশীকরণের উপায় রূপে প্রযুক্ত হয়। তেল-পড়ার তেল মাখলে, নুন-পড়ার নুন খেলে, ধূলো-পড়ার ধূলো বা সরষে-পড়ার সরষে গায়ে ঠেকলেও নাকি নর-নারীর বুদ্ধি-বিভ্রান্তি জন্মায় এবং তারা উদ্দিষ্ট নারী বা পুরুষের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ঘর-বন্দী, উঠান-বন্দী বা পথ-বন্দীরও রকমারি তাক-বাক আছে। ঘরের দেওয়ালে, বাড়ীর উঠানে বা চলার পথে এমন কিছু কল-কৌশল করা হয়, যার ফলে সম্মোহিত হয়েই নাকি নর বা নারী উদ্দিষ্ট নারী বা নরের হাতে ধরা দেয়। ঘরের দেওয়ালে সিঁদুরের তে-কাঠা এঁকে, তার ভেতর গোবরের ফোঁটা দিয়ে ঘর-বন্দী করতে দেখেছি পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে। তে-মাথা পথের গোড়ায় মেটে সরায় হলুদ-বাটা, কড়ি, পান ও মাথার চুল রেখে ন্যাকড়া পুড়িয়ে যাবার দৃশ্য আশা করি অনেকেই দেখেছেন। আর অন্যের উঠানে ঢুকে ন্যাকড়ার পুঁটলিতে বা শালপাতার ঠোঙায় জড়ানো মোরগের ঝুঁটি, গো-সাপের রক্তমাখা কলিজা, গর্ভ-পাতকারিণী কুমারী বা বিধবার হাত-পায়ের নখ বা পরা কাপড়ের টুকরো ফেলে যাওয়ার দৃশ্যও কেউ-কেউ দেখেছেন নিশ্চয়। এ-সবই বশীকরণ বা রোগ-চালানের উদ্দেশ্যে করা হয়। উদ্দিষ্ট নর-নারী এগুলো ছুঁলে বা মাড়ালেই বশীকরণের অধীন হয়, এই হল বহু জনের বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসের প্রসার এত বেশী যে কুমারী ও বিধবা মেয়েদের বা তরুণী বধূদের নিয়ে গৃহিণীরা সর্বদা ব্যস্ত হয়ে থাকেন। কে কখন কোন ফাঁকে খাদ্য-পানীয়ের মাধ্যমে বশীকরণের ওষুধ খাইয়ে বা তুক-তাক করে তাদের ঘরের বের করে নিয়ে যায়, এই তাঁদের ভাবনা। ঘাটে-মাটে যাওয়া, উঠানে নামা, যেখানে-সেখানে বসা ও যার-তার হাতে খাওয়া বা যার-তার কাছে চুল বাঁধার জন্যে মাথা পেতে দেওয়া সম্বন্ধে তাই পল্লী-সংসারে বৌ-ঝিদের ওপর এত রকম বিধি-নিষেধ আছে। আইবুড়ো ছেলেদের সম্বন্ধেও এত খানি না হক, কিছুটা সামাল-সামাল ভাব দেখেছি কোন কোন সংসারে। বস্তুত বশীকরণ-বিদ্যা থাক বা না থাক, তাতে কোন ফল হক বা না হক, তার অস্তিত্ব এবং কার্য-কারিতা সম্বন্ধে সকলেই মনে মনে প্রত্যয় রাখেন। কাজেই দুষ্টেরা স্বেচ্ছায় তার সন্ধান করে, আর শিষ্টেরা তার আওতা থেকে গা বাঁচিয়ে চলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কতক গুলো দৃষ্টান্ত দিয়ে জিনিষটা বোঝাতে চেষ্টা করছি।

একটি কপালীদের বৌ কোন লম্পটের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে কলকাতায় পালিয়ে আসে। কিছুদিন পরে লোকটি তাকে পতিতালয়ে বেচে দিয়ে সরে পড়ে। সেখান থেকে কোন প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় উদ্ধার পেয়ে মেয়েটি আসে এক আশ্রয়-কেন্দ্রে। এখানে তার জবান বন্দী নেওয়া হলে, সে বলে যে ঐ দুর্বৃত্তের ওপর তার কোন আকর্ষণ ছিল না, সে তাকে 'গুণ' করে। তার ফলেই কপাল খেয়ে সে তার সঙ্গে বেরিয়ে আসে। আর একটি বাগ্দী মেয়ে বছর তেরো বয়সে অবৈধ সংসর্গে মাতৃত্ব প্রাপ্ত হয়। এই গর্ভ নিয়ে তার মা ও দিদিমা তাকে প্রহার ও গঞ্জনায় অস্থির করে তোলে। অবশেষে জানা যায় মেয়েটি নির্দোষ, একটি আত্মীয় তাকে 'ওষুধ' করে, ঘুমের ভেতর তার কৌমার্য হরণ করে। একটি বাল-বিধবা নদীতে স্নান করতে যায়। সেখান থেকে বাড়ী না ফিরে সে এক বিপত্নীক কর্মকারের কাছে গিয়ে ওঠে ও তার সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। পরে এই আচরণের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, তুক-তাক করে 'ভুলো' লাগিয়ে লোকটা তাকে টেনে নিয়েছে। স্ত্রী-পুত্র ও ঘর-সংসার ফেলে এক সন্দেহ জনক চরিত্রের বিধবাকে নিয়ে পালায়, এমন একজন পুরুষও বলেছিল, তার কোন দোষ নেই। নষ্ট স্ত্রীলোকটি তাকে ধুলো-পড়া দিয়ে বশ করে পাপের পথে টেনেছে। পরিচারিকার বে-আইনী সন্তান-সম্ভাবনার জন্যে দায়ী এক যুবকও বলেছিল, প্রতি রাত্রে কে যেন আমাকে

টেনে নিয়ে যেত ওর কাছে। দিনের বেলা ওকে ভাবলেও আমার ঘৃণা হত, কিন্তু রাত্রি হলেই কে যেন এসে ভর করত আমার ওপর। আমার আর বুদ্ধি-বিবেচনা থাকত না। এ-ও একটা কিছু বশীকরণের কথাই বলেছিল সম্ভবত।

সাধারণত অশিক্ষিত ও তথাকথিত অনুন্নত গ্রাম্য নর-নারীর মধ্যেই বশীকরণের প্রচার বেশী। এসম্বন্ধে তাদের প্রত্যয়ও বেশী। সহুরে শিক্ষিত সমাজ হয়ত মনে করবেন, লোকে নিজেদের নির্দোষিতার সাফাই হিসাবেই বশী-করণের দোহাই দেয়। দুষ্প্রবৃত্তির প্রভাবে অন্যায় করে তারা বলে, এ জন্যে তাদের নৈতিক দায়িত্ব নেই, কেউ কিছু উপচার প্রযোগ করে তাদের দিয়ে এই কাজ করিয়েছে। এ কথা একেবারে মিথ্যা হযত নয়। বিশেষত গুরুতর আন্তঃপুরিক ব্যভিচার যেগুলো, সেখানে বশীকরণের দোহাইটাই হয়ত আত্ম-রক্ষার সর্বোত্তম উপায়। কিন্তু বিশেষ ভাবে যাচিযে দেখেছি, বশীকরণের কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাসটাও আন্তরিক। কারণ নিরুপায় ভাবে বশীকবণের বিষয়ীভূত হয বলে যেমন অনেকে অজুহাত দেখায়, তেমনি অপরের ওপর স্বেচ্ছায় বশীকরণ প্রয়োগও করে।

অবশ্য শিক্ষিত ভদ্র পরিবারেও বশীকরণেব প্রচলন নেই, তা নয। যে মেয়েকে স্বামী নেয় না, বা যার স্বামী অন্য মেযের সঙ্গে প্রণয় করে, পতিতা-লয়ে যায, সে স্বামীকে আযত্তে আনার জন্যে রকমারি বন্ধে-ধন্ধের আশ্রয নেয়, এমন ঘটনা বহু বাড়ী খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। বাল্যকালে পতি পরিত্যক্তা একটি বধূকে অমাবস্যার রাত্রে একটা নূতন হাঁড়িতে দেহ-জল সঞ্চয় করে, এলো চুলে বিবস্ত্র হয়ে সেই হাঁড়ি আস্তাকুঁড়ে পুঁততে দেখেছিলাম। এলে ফকির নামক এক তথাকথিত উদাসী তাকে এই তুক বাংলে দিয়েছিল। আর এক ভদ্রলোক তাঁর 'হুডকো' স্ত্রীকে বশ করার উপায় হিসাবে একটা মরা কাক, এক-বাটি মূত্র, আর কি-কি সব পদার্থ নিয়ে ছাদে একটা ব্যাপার করেছিলেন, যেখানে বালকদের যেতে দেওয়া হযনি। প্রথম ক্ষেত্রে স্বামী ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্ত্রী বশ হয়েছিলেন কি না জানি না। তবে ঘটনা দুটো বশীকরণের অন্তর্ভুক্ত বলেই অদ্যাবধি মনে আছে। গুপ্তকেশ ছেদন করে গন্ধকের সঙ্গে তা পুড়িয়ে একটা তুক করার কথা শুনেছিলাম কোন তরুণী বিধবা সম্বন্ধে। কিন্তু ঘটনাটা কি সম্পর্কীয়, তা জানার সুযোগ হয়নি। কানাঘুষোয় শুনেছিলাম, কোন দূরাত্মীয়কে আয়ত্ত করার উপায় হিসাবে এটি অনুষ্ঠিত হযেছিল।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কেতায় এবং রীতিমতো প্রকাশ্য ভাবেও বশীকরণ বিদ্যার কিছু চলন আছে। সংবাদপত্রে এমন সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক মাদুলী তাবিজ বা কবচের বিজ্ঞাপন নিশ্চয় সবাই দেখেছেন, যাতে মামলা জয়, পরীক্ষা পাশ ও শত্রুনাশ হয়। অতি কঠিন-হৃদয় নর বা নারী যা ধারণে 'নিঃশ্বাসের মতো আজ্ঞাবহ' হয়। বলা বাহুল্য, অপরাপর সিদ্ধিগুলির উল্লেখ শুধু ভদ্রতা রক্ষার জন্যে। আসল ব্যাপার হল বশীকরণ, যার জন্যেই এগুলো বাজারে চলে। অধিকাংশ মাদুলিতেই গ্যারান্টি দেওয়া থাকে, নিষ্ফল হলে মূল্য ফেরত দেওয়া হবে।

এমনি একটা নিষ্ফলতার ব্যাপারে মূল্য ফেরত দিতে অস্বীকার করায়, কোন কবচ-দাতার বিরুদ্ধে কলকাতার এক শিক্ষয়িত্রী চুক্তি-ভঙ্গের মামলা করেছিলেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ, তিনি তাঁর এক দূর-সম্পর্কীয় মাতুলের সঙ্গে প্রণয়া বদ্ধ ছিলেন। মাতুল তাঁকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর দেহ অধিকার করে। তারপর তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সে আর একটি মেয়েকে ভালোবাসতে স্নুরু করে। তখন শ্রীমতী শিক্ষয়িত্রী উক্ত মাতুলকে ঐ মেয়েটির কবল থেকে উদ্ধার করার এবং আপন আয়ত্তে আনার উপায় হিসাবে উল্লিখিত কবচ ধারণ করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোন ফল হয়নি। যে উকিল এই মামলা পরিচালনা করেছিলেন, তাঁর অনুগ্রহে কবচটি কেটে দেখার স্নুযোগ হয়েছিল। তার ভেতর দুমড়ানো এক কুচি কাগজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই কাগজে ছিল 'গ', 'ব', 'চ' সংবলিত কতক গুলি অশ্লীল শব্দ, আর ছিল বাঁকা-টেরা গোছের একটা গ্রহ-স্ফুটের ছক। অন্য একটি কবচও খোলা হয়েছিল। তার ভেতর পাওয়া গিয়েছিল অল্প কয়েক গাছি চুল। আসলে এগুলো যে কিছুই নয়, এ কথা আশা করি আর বলে বোঝাতে হবে না।

-বশীকরণের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা, তা নিয়ে তান্ত্রিক, অবধূত ও পীর-ফকিরদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। তাঁরা সকলেই উল্লেখ করেছেন, দ্রব্যগুণ সঞ্জাত সম্মোহের কথা এবং আধি-ভৌতিক বা আধি-দৈবিক সম্মোহের কথা। মন্ত্র-তন্ত্র যা বলেছেন, সে-ও এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। বস্তুত সাময়িক সম্মোহন বা 'মেসমেরিজম' বিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও, মন্ত্র বা দ্রব্য-গুণের বা তুক-তাকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে, এ আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। আমি মনে করি, বশীকরণ বলে কোন বিদ্যা নেই। ঐ বিদ্যার নামে যে অন্ধ বিশ্বাস লোক-সমাজে প্রচলিত আছে, auto-suggestion

বা আত্ম-সংবেদন রূপে তা কোন-কোন নর-নারীর বুদ্ধি-বৃত্তিকে সাময়িক ভাবে আচ্ছন্ন করতে পারে। সেই আচ্ছন্নতার মুখে অতৃপ্ত বা অবদমিত বাসনা তাদের বিশেষ কোন নারী বা নরের জন্যে উন্মাদ করেও তুলতে পারে। আর অনিষ্টকর ওষুধ বা গাছ-গাছড়ার বলে আংশিক মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয়েও এক জন আর এক জনের কবলে গিয়ে পড়তে পারে। এই জিনিষটাকেই এ দেশে চিরদিন বশীকরণ বলে চালানো হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এ হল উন্মত্ততারই একটা রূপ। এর সঙ্গে মন্ত্র-তন্ত্র বা ওষুধ-পত্রের কোন সম্বন্ধ নেই।

বশীকরণের চেয়ে অনেক বেশী প্রচলিত এবং অনেক বেশী লোকের দ্বারা অনুসৃত আর একটি জিনিষ আছে, তার নাম স্তম্ভন। স্তম্ভন বলতে বোঝায় জননেন্দ্রিয়ের উচ্ছ্রিতাবস্থা ও অনুষ্ঠান ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করা। ক্রিয়ায় অশ্ববৎ নৈপুণ্য লাভের উপায়ভূত বলে এর আর এক নাম বাজীকরণ। তান্ত্রিকদের বিন্দুসাধন বা কুম্ভক মৈথুন, আর বাজীকরণ প্রকৃত পক্ষে একই পর্যায়ের জিনিষ। তবে বিন্দুসাধন অনুষ্ঠিত হয় ধর্মের নামে এবং তার আদর্শ হল ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিরোধ করা। আর বাজীকরণ করে সংসারী লোক। ক্রিয়ার মাদকতা ও কার্য-কাল বৃদ্ধি করাই তার লক্ষ্য। নইলে মনস্তত্ত্বের বিচারে দুটোই বিকৃতাবস্থা।

কবিরাজী ও হেকিমি শাস্ত্রে শুক্র-তারল্য ও ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য হেতু পুরুষের ক্ষমতা অন্তর্হিত হলে, কি ভাবে সেই বিনষ্ট শক্তি পুনরুদ্ধার করা যায় এবং কি ভাবে স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ অধিকতর শক্তিশালী হতে পারে, ও দুষ্টা ভ্রষ্টা বা ইন্দ্রিয়াসক্তা রমণীকে সংগ্রামে পরাস্ত করতে পারে, তার রকমারি উপায় ও ওষুধ-পত্র বর্ণিত হয়েছে। আবধৌতিক এবং ফকিরী চিকিৎসা তত্ত্বেও বাজীকরণের সহায়ক বিবিধ তুকতাক ও টোটকার উল্লেখ আছে। সমাজ-জীবনে এই সব ওষুধ-পত্র ও টোটকার প্রচলন কত বেশী, সমাজতত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই আশা করি তার খবর রাখেন। নিষ্ঠুরতাকামী যুবক, পৌরুষহীন প্রৌঢ়, তরুণীভার্যা বিশিষ্ট বৃদ্ধ প্রভৃতি ত বটেই, অনেক সুস্থ, শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত লোকও প্রকৃষ্টতর সুখের আশায় গোপনে নানা রকম মোদক, মালিস ও বটিকা সংগ্রহ করে থাকেন, এ কে না অবগত আছেন? মূর্খ, অশিষ্ট বা অসংযত ব্যক্তিরা যে কি হারে এ-সব জিনিস ব্যবহার করে, সে ত বলারই নয়। পতিতালয় গামীদের মধ্যে এর চলন সব চেয়ে বেশী।

কালো বিড়ালের কোমরের অস্থি, সদ্য ঋতুমতী কুমারীর গুপ্তকেশ, গাভীর দেহ থেকে স্খলিত বৃষ-বীর্যে নিষিক্ত ন্যাকড়া তামার মাদুলীতে

রেখে, সেই মাদুলী কোমরে ধারণ পূর্বক ক্রিয়ায় নিরত হলে, রাত্রির এক যাম অবধি অবাধে সংগ্রামের শক্তি হয়, এ কথা এক তান্ত্রিক সাধুর কাছে শুনেছিলাম। চড়াই ও পায়রার ডিম ভেঙে তার শ্লৈষ্মিক পদার্থ অঙ্গে লেপন করলে, ক্রিয়া প্রহরদ্বয় স্থায়ী হয়, এ কথা 'কর্পটিমঞ্জুষা' নামক কামকেলি সম্বন্ধীয় গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হেকিমী পুঁথিতে বলেছে, কাঁচা দুধ খেয়ে ও এক টুকরা কাঁচা হলুদ সঙ্গে রেখে ক্রিয়ায় নিরত হলে, কাক না ডাকা পর্যন্ত নাকি ক্রিয়াবসান হয় না। উদ্দিষ্টা রমণীর কটি-তটে নাগদানী লতার বেষ্টনী পরিয়ে তার সঙ্গে কেলি নিরত'হলে, ঐ বেষ্টনী অপসারিত না করা পর্যন্ত পুরুষের স্খলন হয় না এবং অতি বড় দুষ্টা নারীও ক্লান্ত হয়ে পুরুষের করুণা ভিক্ষা করে, এ কথা দু-তিন-জন ফকিরের মুখে শুনেছি। নাগদানী লতা কি জানি না। মোটের ওপর দেশী মতে বাজীকরণের উপায় রূপে এই জাতীয় ভ্রান্ত ও আজগুবি অনেক কিছু তুক-তাক ও মাল-মসলার প্রচলন আছে। এগুলির সার্থকতা বা কার্যকারিতা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। বশীকরণানুকূল টোটকা ও তুক-তাকের মতোই এগুলোর জন্মও জনগণের অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস এবং অসঙ্গত দুষ্প্রবৃত্তি থেকে।

তবে বাজীকরণের খাঁটি ওষুধও আছে এবং তার ফলাফলও বহু জনের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখেছি, ডাক্তারী, কবিরাজী, হেকিমী, যে-কোন মতের ওষুধই হক, সবই মূলত গাঁজা, সিদ্ধি অথবা আফিং থেকে তৈরী। কোনটা মোদক আকারে, কোনটা বড়ি আকারে পরিবেষিত হয়, এই যা পার্থক্য। এক জন চিকিৎসক বলেছেন, এই সমস্ত উত্তেজক পদার্থ শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করার ফলে সহসা হৃদপিণ্ডের রক্ত-সংবাহন ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। জননেন্দ্রিয়ে তাতেই তীব্র একটা আকস্মিক উদ্দীপনা জাগ্রত হয়। তারপর ভৈষজ্য মাদকতায় সেই উচ্ছ্রিত ইন্দ্রিয় একটা সাময়িক অসাড়তা লাভ করে। তখন দীর্ঘস্থায়ী, এমন কি, অস্খলিত মৈথুনও সম্ভব। তবে তিনি বলেন যে এই জাতীয় ক্রিয়ায়, অনুষ্ঠানকারীর খুব একটা সজাগ আনন্দানুভূতি থাকে না।

জননেন্দ্রিয়ের স্নায়ু ও শিরা-উপশিরা এমনি বিবশ হয়ে থাকে যে ক্রিয়া জনিত স্পন্দনের বেগকে তারা মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে না। আর তা পারে না বলেই, এই জাতীয় ক্রিয়ায় স্খলন এত বিলম্বিত হয়। এই ডাক্তারী সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য ডাক্তাররাই বিচার করবেন। তবে গাঁজা, সিদ্ধি, আফিং, চণ্ডু ইত্যাদির প্রভাবে যে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণেই যে প্রাচ্য মুল্লুকের

বিভিন্ন দেশে এই সব মাদকের প্রচলন এত বেশী, এর আমি বহু উল্লেখযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। এক অহিফেন সেবীকে আফিং ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন কোন ফল হল না, তখন তাকে বিধিমতো নিপীড়ন করায় সে স্বীকার করল যে কালাচাঁদের (অর্থাৎ আফিং-এর) দৌলতে বৃদ্ধ বয়সে সে যুবকের মতো ক্ষমতার অধিকারী। আর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকও দেখেছি রাত্রে শোয়ার আধ-ঘণ্টা আগে রোজ এক বড়ি করে আফিং খেতেন। তাঁর নাতির কাছে তল্লাস নিয়ে জানতে পারি, তৃতীয় পক্ষের পত্নী আহরণ করার পর থেকেই তিনি আফিং ধরেছেন।

আফিং-কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে পেটের রোগের ও বাতের প্রতিষেধক বলে আফিং ব্যবহার করার কথা বহুল ভাবে প্রচারিত থাকলেও, প্রকৃত পক্ষে যৌন-শক্তি সংবর্ধক বলেই, বেশীর ভাগ লোক আফিং বা আফিং থেকে উৎপন্ন ঔষধ-পত্র ব্যবহার করে। গাঁজা, গুলি, ভাং, চরস, মদ, তাড়ি, পচাই, আর যা-কিছু মাদক দ্রব্য সমাজে প্রচলিত আছে, তার কাহিনীও একই। নিছক নেশা করার জন্যে এ-সবের শরণাপন্ন হয়, এমন লোকও আছে ঠিকই। কিন্তু এই সব নেশার ফলে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি প্রবল হয়, ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বলে এদের শরণাপন্ন হয়, এমন লোকের সংখ্যাই বোধ হয় অধিক। প্রতিদিন গোপনে গাঁজা খেতেন, এমন এক ভদ্রলোককে বিধিমতো জেরা করার পর তিনি বলেন যে তাঁর সামর্থ্য প্রায় অপচিত হতে চলেছিল, তখন কোন বন্ধুর পরামর্শে তিনি গাঁজা ধরেন এবং তার ফলে এখন তিনি পূর্ণ শক্তির অধিকারী হয়েছেন। ফ্যাসন হিসাবে যেখানে ভাঙের সরবত খাওয়া হয়, এমন একটি ক্লাবের অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করেছেন যে বাজীকরণের উপায় হিসাবে ভাঙের তুল্য জিনিষ আর নেই। ভাঙের কচুরি এবং কুলপি বরফ খাওয়ার আদি-তত্ত্ব আমি তাঁদের কাছেই প্রথম জানতে পারি।

গুলিতে শক্তি বৃদ্ধি পায় কি না, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। তবে চীনা সমাজে গুলির ও লাম্পট্যের যুগপৎ প্রচলন দেখে মনে হয়, অহিফেনের ফল আর গুলির ফল একই, যেহেতু গুলি আফিং থেকেই তৈরি। সিগারেটের ভেতর চরস পুরে খাওয়া আমাদের বাল্যকালে যুবক সমাজের ফ্যাসন ছিল। এখন তার রেওয়াজ কমেছে, তবে পতিতা-পল্লীতে এখনো চরস-সংবলিত সিগারেট পাওয়া যায় শুনেছি। মদ সম্বন্ধে আলাদা করে কিছু বলবার নেই। মদের সঙ্গে লাম্পট্যের এবং লাম্পট্যের সঙ্গে মদের সম্বন্ধ এমনি অচ্ছেদ্য

যে এদের একটি যে অপরটির পরিপূরক, এ পাঠক-পাঠিকা বিনা প্রমাণেই বুঝবেন।

মদের পরও আর একটি নেশা আছে, নেশাড়ী সমাজে তা রাজনেশা বলে গণ্য। সে হল পঞ্চরং। পাঁচ নৈচা সংবলিত একটি গড়গড়ার খোলে মদ ভর্তি করে, ঐ পাঁচ নৈচায় পাঁচটি কলিকা চড়ানো হয়। তাতে যথাক্রমে গাঁজা, গুলি, চণ্ডু, চরস ও সিদ্ধি ধরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর শুয়ে শুয়ে সটকা যোগে মগু পরিবাহিত সেই পঞ্চ মাদকের ধোঁয়া টানা হয়। এরি নাম পঞ্চরং টানা। কলকাতার কোন-কোন পল্লীতে, বিশেষত পতিতা পল্লীতে পঞ্চরঙের আড্ডা এখনো গোপনে চলিত আছে শুনতে পাই। পঞ্চরং-বিশারদ এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছিলেন, পঞ্চরং টানলে পাঁচ বছরের ছেলেও নারী-হরণ শেখে, বুড়াও দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় পাগল হয়ে যায়। তাঁর স্বীকৃতি মতে জানা গেছে যে একটা পঞ্চরঙোত্তর ক্রিয়ায় তিনি কোন পতিতাকে মূর্চ্ছিত করে ফেলেছিলেন এবং তাঁর অঙ্গ শেষ পর্যন্ত সাম্যাবস্থায় ফিরে না আসায়, তিনি নিজেও যন্ত্রণায় অধীর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর জননেন্দ্রিয় থেকে পরে প্রভূত পরিমাণ রক্ত নির্গত হয়েছিল। বস্তুত বাজীকরণের এ হল চরম অবস্থা। ঠিক এ অবস্থা সচরাচর না হলেও, ঔষধ বা মাদক প্রভাবে দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়া করা এবং তার ফলে রোগাক্রান্ত হওয়ার বিবরণ আরো অনেক পেয়েছি।

মোটের ওপর স্বভাব-নির্দিষ্ট পথে যতটুকু তৃপ্তি স্বাভাবিক ভাবে লভ্য, তার মধ্যে নিজের প্রবৃত্তিকে সীমাবদ্ধ রাখাই বিবেচনাশীল মানুষের কর্তব্য। কোন-না-কোন উত্তেজক ওষুধ বা মাদক দ্রব্যের সাহায্যে স্বাভাবিক শক্তি বর্ধিত করতে যাওয়া প্রথমত কুরুচির পরিচায়ক। দ্বিতীয়ত দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের এবং সামাজিক স্বস্তির দিক থেকে ক্ষতিকারক। আগেই বলেছি, বাজীকরণ-সংক্রান্ত ওষুধপত্র সবই কোন-না-কোন অনিষ্টকর পদার্থ দিয়ে তৈরি, কাজেই শেষ পর্যন্ত তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। আর মাদক দ্রব্যের প্রভাবে শক্তিশালী হতে গেলে, শেষ পর্যন্ত নেশাটি স্বভাবের অঙ্গীভূত হয়ে যাবে এবং তা প্রভূত অনর্থের কারণ হবেই।

পুরুষজাতির এই বদ-অভ্যাসের দোষে বহু মহিলার জীবন যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে। এ-সবের ফলেই জরায়ু-ঘটিত নানা ব্যাধি নারী-সমাজকে পঙ্গু ও জীবন্মৃত করে ফেলে। প্রধানত এই কারণেই স্তম্ভন বা বাজীকরণের অভ্যাসকে যৌন-অপরাধ রূপে গণ্য করা উচিত এবং আইনের সাহায্যে এই ব্যবসা

রহিত করা প্রয়োজন। মানুষ তার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে অশ্বত্ব লাভের চেষ্টা করলে, তাকে পশু ছাড়া কি বলব? আর এই পশুত্বের উদ্দীপনা জুগিয়ে যারা পয়সা কামায়, তাদের সম্বন্ধে কি বক্তব্য?

গর্ভোৎপাদন, গর্ভ-নিরোধ ও গর্ভ-পাতনের উপযোগী ওষুধ-পত্র, টোটকা, পাঁচন ইত্যাদি যা প্রচলিত আছে এবং প্রতিদিন বহুল পরিমাণে যার ক্রয়-বিক্রয় সমাজ-জীবনের সকল স্তরেই চলছে, তার কথাও একটু বলা দরকার। গর্ভোৎপাদনের অনুকূল রকমারি ওষুধপত্র, টোটকা ও তুক-তাক যা আছে, তার বেশীর ভাগই আবধৌতিক পদ্ধতির অন্তর্গত। কাজেই তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যাবে না। তেল-পড়া, ধূলো-পড়া, নেবু-পড়া ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে সাধারণত বন্ধ্যাকে পুত্রবতী করার চেষ্টা হয়। কোমরে ডোর, হাতে তাগা এবং গলায় মাদুলী পরিয়ে গর্ভবতী করার কথাও শুনেছি কোথাও কোথাও। এ ছাড়া বাড়ীর কুল, বেল বা কাঁঠাল গাছে মন্ত্রপূত ন্যাকড়ার পুঁটলি ঝুলিয়ে দেওয়া, পথের চৌ-মাথায় বা শ্মশানের মাটিতে জীবন্ত মুরগী, পায়রা বা ঘুঘু সমাধিস্থ করা ইত্যাদির রেওয়াজও অনেক জায়গায় চলিত আছে। লোক-মত এই যে ঝুলানো পুঁটলির ভেতর মন্ত্রযোগে পূর্বপুরুষদের কারু না কারু আত্মা আবদ্ধ করে রাখা হয়। নিয়মিত জল-দান ও স্তব-স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে সেখানে থেকে বেরিয়ে তিনি উদ্দিষ্ট নারীর গর্ভে আশ্রয় নেন। আর মৃত পারাবত প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয়ে, ভৌতিক উপায়ে কোন মুক্ত আত্মাকে পাকড়াও করে এবং জোর করে তাঁকে সন্তান-রূপে গর্ভে পাঠিয়ে দেয়, এই হল পায়রা পোঁতার আদিতত্ত্ব।

বস্তুত এ সবই বাজে কথা। পুরুষের শক্তিহীনতা বা নারী-গর্ভের অনুর্বরতা হেতু সন্তান হয় না। সে-ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষ বা দু-পক্ষের চিকিৎসায় সুফল হতে পারে। কিছুদিন বা অনেকদিন পরে হঠাৎ আপনা থেকেও পুরুষের অপচিত শক্তি বা নারীর গর্ভধারণ ক্ষমতা ফিরে আসতে পারে। কিন্তু নেবু-পড়া ও ধূলো-পড়া খাওয়ার, তেল পড়া মাখার, কিংবা মন্ত্রপুত ঘুনসী-তাবিজ ধারণের দ্বারা গর্ভ লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। যাঁরা বলেন আছে এবং হতে দেখেছেন, তাঁরা একটু সন্ধান করলেই দেখতে পাবেন, ঔষধদাতা পীর, ফকির, অবধূত, বাউল প্রভৃতি ওষুধের নামে কৌশলে স্ব-বীর্যই চালান করে এবং তার ফলেই গর্ভ হয়। ভিখারী, পীর, সন্ন্যাসী ও সাধু-ফকিরদের প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে সে রকম বহু ঘটনা উল্লেখ করেছি। রসনার দ্বারা বন্ধ্যা, কাক-বন্ধ্যা ও

মৃত-বৎসার অঙ্গ উচ্ছিষ্ট করে সন্ন্যাসী কর্তৃক বন্ধ্যাদের পুত্রবতী করে তোলার বহু কাহিনী পাওয়া গেছে। অভিচার সিদ্ধ অঙ্গুলী গর্ভ-গৃহে সঞ্চারিত করে অসাধ্য সাধন করার কাহিনীও কয়েকটি পেয়েছি। অনুমান করি, এই সুযোগেই ধূর্তেরা শুক্র চালান করে। বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটিয়ে বা ভয় পাইয়ে সরাসরি ক্রিয়া করার ঘটনাও ঘটে। তবে শুক্র-প্রক্ষেপ বা ক্রিয়াদি যা হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী হয় ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচের ব্যাপার, আর ফল তার বিশেষ কিছুই হয় না। বংশ রক্ষার চিন্তায় ও নাতি-নাতনীর মুখ দেখার উগ্র কামনায় অধীর গ্রাম্য গৃহিণীরা স্ব-স্ব বধূ ও কন্যাদের বেশী দিন ছেলে-পুলে না হলেই, গোপনে সাধু-ফকিরদের শরণাপন্ন হন। এই পারিবারিক দুর্বলতার সুযোগেই অবধূতদের অন্যায় প্রতারণার ব্যবসা এমন ভাবে সমাজের অন্তস্তলে পূর্ণ বেগে বেঁচে রয়েছে। বাইরে থেকে পুরুষ সমাজ, বিশেষত ভদ্রসমাজ, তার বার্তা কমই জানতে পারেন। আর নারী সমাজ তাঁদের এ-সব যথাসম্ভব জানতে না দেওয়ারই চেষ্টা করেন।

গর্ভ-নিরোধ ও গর্ভ-পাতনের প্রক্রিয়া এবং ওষুধপত্রের কথাও এই প্রসঙ্গে আলোচনীয়। গ্রাম ও নগরের নষ্ট নারী সমাজে 'পেটপোড়া' নামে এক জাতীয় ওষুধ ও পাঁচন চলিত আছে, যা পতি-পরিত্যক্তা, ভ্রষ্টা সধবা ও ব্যভিচারিণী বিধবারা বা পেশাদার পতিতা ও ঘুষকীরা বেপরোয়া দুষ্কৃতির সহায়ক রূপে ব্যবহার করে থাকে। অনুসন্ধানে এই পেটপোড়ার তত্ত্ব যতটুকু জেনেছি, তাতে দেখেছি, রকমারি উত্তেজক ও অনিষ্টকর পদার্থ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ঘৃতকুমারী ও শিমূলের শেকড়, রাংচিতার ডাল, কণ্টিকারীর ফল, ধুতুরার ফুল একত্রে গরম জলে ফোটালে এক জাতীর পেটপোড়া তৈরি হয়, একথা কোন বর্ষীয়সী পতিতার কাছে জানা গেছে। আর একজন পতিতা বলেছে, সিদ্ধি, আফিং, হিং, কটছাল, শতমূলী, আরো এই রকম দু-একটা জিনিষ বেটে মদের সঙ্গে খাওয়ার কথা। এক বুড়া তান্ত্রিকের ফরমুলাও অনেকটা এই শ্রেণীর। মোটের ওপর দেখা যাচ্ছে, কতক গুলো উত্তেজক দ্রব্য ও ভেষজের মিশ্রণে উৎপন্ন একটা মদ্য জাতীয় উগ্র আরক খাওয়ানো হয়, বা জরায়ুকে বিকল ও নিষ্ক্রিয় করে এবং তার ফলেই নারী বন্ধ্যাত্ব লাভ করে। নিয়মিত ভাবে মদ্যপান করলে বা নিম, নিসিন্দা, তিতপল্লা, তেলাকুচো প্রভৃতির কাত প্রত্যহ 'ডুস' আকারে প্রক্ষেপ করলেও জরায়ু সঙ্কুচিত এবং নিষ্ক্রিয় হয়, এ কথা নানা জনের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

এক চিকিৎসক বন্ধু এই সব ফরমুলা পরীক্ষা করে বলেন যে এগুলো ঠিক গর্ভ-নিরোধক ওষুধ নয়। এই সব বা অন্য যে-কোন প্রকার উগ্র ওষুধ নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করলে, নারী জঠরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য অপচিত হয়। তার ফলেই আর সে গর্ভবতী না হতে পারে। তাঁর মতে, এই ভাবে গর্ভ-নিরোধ করলে, নারীর মাসিক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্তনমণ্ডলের পেশলতা ও নিতম্বের পেলবতা দূর হয়ে গিয়ে মুখে গোঁফের রেখা ফুটতে পারে। বিশেষ অঙ্গের অঙ্কুর প্রবৃদ্ধ হয়ে মনে অস্বাভাবিক বিকার দেখা দিতে পারে। এমন কি, হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়ারও ভয় আছে। তিনি মনে করেন, ব্যভিচারিণী ও কু-পথগামিনী নারীদের পাগল হয়ে পথে পথে ঘোরার পেছনে বেশীর ভাগ স্থলেই গর্ভ-নিরোধ ও গর্ভ-পাতনের জন্য ব্যবহৃত ভৈষজ্য দাওয়াইয়ের প্রতিক্রিয়া আছে। নিম, নিসিন্দা বা তেলাকুচোর 'ডুস' গ্রহণ তাঁর মতে জরায়ু-সংহারক নয়, জন্ম-নিয়ন্ত্রক এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণের এই দেশী ফরমুলাকে তিনি খুব নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করেন না। 'পেসারী', 'ক্যাপ' বা ঐই জাতীয় আধুনিক সরঞ্জামের তুলনায় এগুলো যে অতি কম কার্যকর, তাতে আর সন্দেহ নেই। তাই শিক্ষিত সমাজে পেটপোড়ার পরিবর্তে এ সবই অনাচারের সহায়ক রূপে বেশী প্রচলিত। পেটপোড়া সাধারণত দরিদ্র ও অনগ্রসর সমাজের অবলম্বন এবং যেহেতু তাদের সংখ্যা কম নয়, সেই হেতু এই ভয়াবহ ঔষধের প্রচলনও খুব ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়।

কিন্তু পেটপোড়ার ওষুধ ও পাঁচন যে সর্বক্ষেত্রে ফলপ্রদ হয় না, এ অবশ্য বলাই বাহুল্য। তাই বে-আইনী গর্ভপাতের অভ্যাসও বাংলা দেশে অতি ব্যাপক ভাবে চলিত আছে। যে সমস্ত উপাদান-উপকরণের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, গর্ভাবস্থায় সেগুলোই গর্ভ-পাতনের উপায় রূপে ব্যবহৃত হয়। রাংচিতা, ওলটকম্বল, আলকুষি, আফিঙের কাত, তাড়ির গ্যাঁজ ইত্যাদি গর্ভ-পতনের দাওয়াই রূপে বাংলা দেশে বহুকাল থেকে চলে আসছে। হাতুড়ে ডাক্তার, নিরক্ষর কবিরাজ, দুশ্চরিত্রা গ্রাম্য নারী, বিপন্ন গৃহস্থ ঘরে এই সব ওষুধ বিক্রী করে বা বাংলে দিয়ে মোটা দক্ষিণা আদায় করে, এ যে-কোন অভিজ্ঞ পল্লীবাসীই আশা করি অবগত আছেন। 'যে-কোন কারণে ঋতুবন্ধ মাত্র তিন দিনে পরিষ্কার হয়ে যায়', 'গর্ভাবস্থায় এ ওষুধ কিছুতেই খাবেন না, তাহলে সন্তান রক্ষা হবে না' ইত্যাদি বলে সহরে যে-সব ওষুধ বিক্রী হয়, সে-ও এই সব গাছ-গাছড়া ও শেকড়-বাকড় থেকেই তৈরি। অবশ্য

কদাচিৎ কুইনিন, আরগট বা বেলেডোনা জাতীয় বিলেতী ওষুধেরও মিশ্রণ করা হয়।

তবে কি দেশী আর বিলেতী, যে-কোন রকম গর্ভ-পাতের ওষুধই অনিষ্টকর এবং তার কোন-কোনটায় গর্ভপাত সম্ভব হলেও, গর্ভিণীর জীবন রক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যে পরিমাণ রক্তস্রাব হয়, তাতে ধনুষ্টঙ্কারে প্রাণ হারানো, অথবা ভেষজ প্রভাবে উন্মাদ হয়ে যাওয়া, কিংবা জরায়ুজ কর্কট রোগে আক্রান্ত হওয়া অধিকাংশ স্থলেই অনিবার্য। বাংলা দেশের বহু মেয়েই নিত্য-নয়ত এই অবৈজ্ঞানিক গর্ভপাতের ফলে প্রাণ হারায়।

এ ছাড়া গর্ভ-পাতনের আরো রকমারি বিকট ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কোন প্রকার ভেষজ তৈলে লিপ্ত গাছের ডাল (প্রধানত রাংচিতার) গর্ভিণীর জরায়ু মুখে কয়েক দিন পর্যন্ত সন্নিবিষ্ট করে রাখা, ভিজে কম্বল পেটে জড়িয়ে তার ওপর ইঁট ও পাথর চাপা দেওয়া, গোরু বা ঘোড়ার চোনা গরম করে বাঁশের চোঙা যোগে তা গর্ভিণীর জঠরে নিষেক করা ইত্যাদি বহু বীভৎস প্রক্রিয়ার কথা আবিষ্কৃত হয়েছে। গৃহস্থ ঘরের বয়স্থা কুমারী, যুবতী বিধবা, প্রোষিত-ভর্তৃকা নারী গোপন ব্যভিচারে গর্ভবতী হলে, মানের দায়েই তা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে না। তখন এই সব ভয়াবহ উপায়ের ব্যাপারীরা শুভানুধ্যায়ী সেজে তাদের কাছে আসে ও বখশিসের বিনিময়ে তাদের ওপর এই আসুরিক দাওয়াই প্রয়োগ করে। পরমায়ুর জোরে এ সত্ত্বেও কেউ-কেউ দায়মুক্ত হয়ে টিঁকে যায়। কেউ বা দায় নিয়েই ভব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। সহুরে ভদ্রসমাজে অবশ্য এই হাতুড়ে পদ্ধতির চলন বেশী নাই। তবে উৎকট উপায়ে গর্ভ-পাত সহরেও খুব কম হয় না। তার ফলে বিপর্যয় বা মৃত্যুও মাঝে-মাঝে হতে দেখা যায়। কলকাতার কোন কলেজের ছাত্রীর মৃত্যু ও তৎসংশ্লিষ্ট মামলার কথা আশা করি অনেকে ভোলেন নি। মামলার আকারে প্রকাশ পায় নি, কিন্তু ঘটেছে, এ রকম অপরাপর ঘটনার খবরও নিশ্চয় কেউ-কেউ জ্ঞাত আছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

নগর-জীবনের অন্তরালে দুর্নীতি

বশীকরণ, স্তম্ভন ও গর্ভ-পাতনের সহায়ক রূপে তলায় তলায় পল্লীজীবনে যে দুর্নীতির ব্যবসা চলে, তার কথা ইতিপূর্বে বলেছি। সহরে, বিশেষত কলকাতায় যে দুর্নীতির ব্যবসা চলে, তা আরো বিশ্রী, ব্যাপক এবং ভয়াবহ। কিন্তু মহানগরী কলকাতা তার আফিস-আদালত, যান-বাহন, কল-কারখানা ও কাজ-কারবার নিয়ে দিন-রাত্রি এমন জাঁকিয়ে আছে যে ওপর থেকে চোখ বুলিয়ে কেউ বুঝতে পারে না, এর জীবন-যাত্রায় কোথাও ছন্দ-ভঙ্গ হয়েছে, বা কোথাও অন্যায় ও অনৌচিত্যের স্রোত নিঃশব্দে তরঙ্গিত হচ্ছে। অবশ্য চক্ষুষ্মান ও সন্ধানশীল লোকেরা জানেন, মহানগরী কলকাতার ওপর তলার এই সমারোহময় জীবন-যাত্রার আড়ালে আর একটি জীবন আছে এবং সে-ও এমনি বৃহৎ, বিচিত্র। সে হল তার নীচু তলার জীবন।

এই জীবনে রকমারি পাপ নীরবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গোপন পাপের বীজ অসাধুতার উত্তাপে পরিপুষ্ট হয়ে ডালে-পল্লবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্ধ অলি-গলির আওতা ছাড়িয়ে তা ওপর তলায় ভেসে উঠছে এবং সেখানকার জীবন-প্রবাহকেও আবিল করছে। নানা কৌশলে চোরাই মাদক, জালমুদ্রা, বে-আইনী অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্লীল বই, ছবি, আপত্তিকর ওষুধ-পত্র ও ক্ষতিকর যন্ত্র-পাতির ব্যবসা এই অন্ধকারে পাইকারি হারে বহু জনের মিলিত চক্রান্তে পরিচালিত হচ্ছে। নারীহরণ, অপহৃতা নারী ক্রয়-বিক্রয়, ভদ্রনারীর গোপন পাতিত্য, বিপন্নার গর্ভ-পাতন ইত্যাদি ব্যাপার নিত্য-নিয়ত প্রভূত মুনাফার বিনিময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খুনী, জালিয়াৎ ও চোর, জুয়াচোরেরা হাতে করে এই সব অনাচার কদাচার করে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু সতর্ক অনুসন্ধান ও সজাগ বিচার-বুদ্ধি নিয়ে তল্লাস করলে দেখা যাবে, সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত বহু বড়-বড় রুই-কাতলা পেছনে থেকে বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিত্ত দিয়ে এদের শক্তিবৃদ্ধি করেন এবং লাভের গুড়ে তাঁরাই সর্বাধিক বখরা বসান। বহু জনের ওপর তলার সুখ-সৌভাগ্যের জাঁক যে নীচুতলার এই রসদে সমৃদ্ধ, এ-ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানে হয়ত ধরা পড়বে। কিন্তু তাঁরা এমনি হুঁসিয়ার ও প্রভাবশালী লোক যে, কোন কিছুতেই চট করে তাঁদের গায়ে আঁচড় লাগে না।

গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতায় সময়-সময় যখন গুরুতর হত্যাকাণ্ড, রাহাজানি, জালিয়াতি বা নারীহরণ সংক্রান্ত মামলার আদিসূত্র আবিষ্কৃত হয়, তখনি লোক-চক্ষে এই অন্তঃপ্রবাহী অনাচারের একটা খণ্ড-চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তখনি সমাজ-মনস্তত্ব একটু চঞ্চল হয়। নইলে ভালো মানুষের মতো গায়ে ফুঁ দিয়েই লোকে দিন কাটিয়ে যান, আশে-পাশে ও সুমুখে-পিছনে কি ঘটছে, তা জানতেও পান না। বন্ধু ও উপকারকের ছদ্মবেশে কত ধূর্ত নিম্নবিত্ত ভদ্র-পরিবারে ঢুকে, তাঁদের কন্যা ও বধূদের রসাতলে তলিয়ে দিচ্ছে, কত হোটেল, রেস্তরোঁ, নাইট-ক্লাব নীরবে সে অধঃপতনের সহায়তা করেছে, কত ক্লিনিক, অনাথ আশ্রম ও শিশুসদন উদ্ধারক রূপে এই পাপের পৃষ্ঠপোষকতা করছে, তা শান্তিপ্রিয় গৃহস্থ-সাধারণের জানার সুযোগ নেই। অবশ্য অর্থ-নীতিক সঙ্কট, বেকার সমস্যা ও অবিবাহের বিপাকে দিনের পর দিন সমাজ-ব্যবস্থা যে-রকম বিকল হয়ে পড়ছে, অথচ সমাজ-চেতনায় কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটায়, এই ভাঙা-চোরা সামাজিক কাঠামোটাকেই জোড়াতালি দিয়ে চালানোর প্রয়োজন যে-রকম অনিবার্য হয়ে রয়েছে, তাতে অনেকে জেনেও কিছু না-জানার ভাণ করেন। এমন দরিদ্র অভিভাবক অনেকে আছেন, যাঁরা আর্থিক সহায়তার মুখ চেয়ে এ-সবে প্রশ্রয়ও দিয়ে থাকেন। তাছাড়া সাধারণত যে-সব নারী-দালাল সামনে থেকে নানা ছলে ভদ্র-নারীদের বিপথে টানেন, সমাজে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এমনি প্রচুর থাকে যে লোকে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কোন অবকাশও পায় না। বরং তাদের সঙ্গ, সাহচর্য ও সহযোগিতা মেয়েদের ভাবী জীবন-পথে কল্যাণকর হবে ভেবে, পারিবারিক স্বার্থের দিক থেকে তা কাম্যই মনে করে।

এঁদের চক্রান্তে কত কুলনারী পেশাদার কুলটায় পরিণত হয়েছে, কত কুমারী স্খলিত কৌমার্য হয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছে, কত নাবালক-নাবালিকা চোর, ডাকাত ও ব্যবসায়ী ভিক্ষুকদের কবলে পড়ে ক্রীতদাসের জীবন বরণ করেছে, পেশাদার ভিখারী ও পকেটমারে পরিণত হয়েছে, কত নারী ও শিশু ধর্মান্তরিত হয়ে অন্য সম্প্রদায়ের পরিসর স্ফীত করেছে, তার সীমা-সংখ্যা নেই। মনে রাখতে হবে, এই দুষ্কৃতির ব্যবসা অনুষ্ঠিত হয়ে মোটা টাকা লেন-দেনের ভিত্তিতে এবং এই টাকা যাঁদের তহবিল স্ফীত করে, তাঁরা কেউ ফেলনা লোক নন। এই সব পাপ যে কত ব্যাপক হারে অনুষ্ঠিত হয়, তা অনেকেই হয়ত জানেন না। তবে চোর, জুয়াচোর, পকেটমার, গুণ্ডা, ভিখারী ও পতিতার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা

লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে অন্যায় যা অনুষ্ঠিত হয়, ধরা পড়ে তার ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ। বেশীর ভাগই নিষ্পন্ন হয় ধামা চাপা দিয়ে এবং নিম্নবিত্ত গৃহস্থ সমাজ নিছক মানের দায়ে কিল খেয়ে চুরি করতে বাধ্য হন।

আগেই বলেছি, যুদ্ধকালে বিদেশাগত সৈনিকেরা দরাজ হাতে টাকা ছড়িয়ে ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে দেশের বহু নারীকে পাপের পথে টেনেছে এবং সেই টানাটানির মুখে বহু মেয়ে যেমন স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করেছে, তেমনি সেই ব্যাপারে দালালী করে বহু ভদ্রলোকও তলায় তলার মোটা দক্ষিণা আহরণ করেছেন। এই সৈনিকদের হাত দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র, বেতার যন্ত্র, অশ্লীল বই, ছবি, রবারোপকরণ ইত্যাদিও বহুল পরিমাণে সমাজ-জীবনে পাচার হয়ে গেছে। সেই বিকি-কিনির ব্যাপারেও ভদ্রলোক নামে পরিচিত বহু ব্যক্তি নানা ভাবে জড়িত ছিলেন। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ভেতর যোগাযোগ স্থাপন করে দিয়ে তাঁরা কৌশলে মোটা টাকা কামিয়ে নিয়েছেন। বাইরে থেকে এই সব ব্যবসার খবর অবশ্য অনেকে টের পাননি। কিন্তু এক সময়ের বহু শীর্ণ পকেট যে যুদ্ধোত্তর কালে বিশেষ স্ফীত হয়ে উঠেছে, অন্যান্য অনেক কারণের মতো এ-ও তার একটা কারণ, এ কথা মনে রাখা দরকার। আজ কালো বাজার, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও দুর্নীতির ধাকায় দেশের সমাজ-জীবন যে এমন টলমল করছে, মহাযুদ্ধ এবং তাকে কেন্দ্র করে সুযোগ সন্ধানী সরীসৃপদের দুষ্ট আচরণ সে জন্যে কতটা দায়ী, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের তা ভেবে দেখা উচিত। দাঙ্গা-হাঙ্গামার হিড়িকে দেশে এত বে-আইনী বন্দুক, ষ্টেনগান ও পিস্তল কি করে বেরিয়েছিল, সে কথাও ভেবে দেখা উচিত সেই সঙ্গে।

যুদ্ধকালীন বঞ্চনা-নীতি ও ব্যবসায়িক অসাধুতাব মিলিত প্রতিক্রিয়া দেশে যে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছিল, যার ধারা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে অদ্যাবধি চলেছে, তা পল্লী-সমাজের মেরুদণ্ড যে কতখানি ধ্বসিয়ে দিয়েছে, সম্ভবত তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। বহু চাষী ও দরিদ্র ঘরের মেয়ে এই ধাকায় গার্হস্থ্য জীবনের গণ্ডী থেকে ছিটকে অন্নের আশায় নগরে, বন্দরে, গঞ্জে এসে পড়ে। পতিতালয়ের আড়কাঠিরা সেই সুযোগে তাদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে দীক্ষিত করেছে। উপার্জনশীল পুরুষেরা যখন পেটের ধান্দায় বা যুদ্ধের চাকুরির টানে দিকে-দিকে ছড়িয়ে পডতে বাধ্য হয়েছে, তখন নিরাশ্রয়, নিরভিভাবক পল্লী-নারীর এ ছাড়া আর কি বা উপায় ছিল, সেই সর্বগ্রাসী মন্বন্তরের মুখে আত্মরক্ষা করার? খাদ্য, বস্ত্র ও জীবন-ধারণের আনুষঙ্গিক উপকরণাদির

মূল্য অত্যধিক বাড়ায় এবং সেই অনুপাতে আয় না বাড়ায়, সহরে ভদ্রঘরেও এই সময় থেকেই বহুল পরিমাণে গোপন পাতিত্য সুরু হয়েছে, শুধু আয়ের অঙ্ক ও প্রাত্যহিক ব্যয়ের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের প্রয়োজনে। এই ভাবে দরিদ্র চাষী মজুর এবং নিম্নবিত্ত ভদ্র সমাজের খুব বড় একটা অংশই বাধ্য হয়ে পাপের আবর্তে পা দিয়েছে। আর দুর্বৃত্তেরা তারি সুযোগে সৌভাগ্যের কড়ি কুড়িয়ে লাভবান হয়েছে এবং মান্যগণ্য লোক রূপে সমাজে চেপে বসেছে। যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছে বলে তাদের সবাই তারিফ করে। কিন্তু সে ব্যবসা কিসের, কোন পথে রাতারাতি তাদের বরাত ফিরে গেছে, সেটা তলিয়ে বোঝার অবকাশ হয় না অধিকাংশ মানুষ।

আসলে যাবতীয় অন্যায় ও অনাচারের সদরঘাঁটি হল কলকাতা সহর। এখানকার অসংখ্য অলি-গলি ও প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠানের অন্ধকারে কত যে দুনীর্তির কারবার গোপনে শক্তি সঞ্চয় করছে, তা জনসাধারণ ত দূরের কথা, পুলিশও সব সময় টের পায়না। সমাজ-জীবনের নীচুতলায় বসে এই সব ব্যবসায়ের ঘাঁটিয়ালরা দিনের পর দিন নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। ছদ্মবেশী দালাল মারফৎ তাদের পণ্য নিঃশব্দে ওপর তলায় চালান করে দিচ্ছে। সেখান থেকে নূতন পণ্য ও পয়সা আহরণ করছে। অথচ এমনি সতর্ক ও তৎপর তাদের কার্য-কলাপ যে কালে-ভদ্রে দু-একটা ছাড়া ধরাই পড়ে না কোন ঘাঁটি। কিন্তু অন্যায়ের পরিসর যে ছোট নয়, এ সমাজের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন।

আগেই বলেছি যে অন্তঃপ্রবাহী যৌনাপরাধ থেকে সুরু করে, চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, জালিয়াতি পর্যন্ত, নানা শ্রেণীর সমাজধ্বংসী অপরাধই এই নীচুতলার নায়ক-নায়িকাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। হোটেল, রেস্তরা, বার ও বাগান-বাড়ী থেকে সুরু করে, খোলার ঘরের পতিতাপট্টি, খাটাল, বস্তী ও সদাগরী কারবারের অন্ধকার গুদাম পর্যন্ত, সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গাতেই দুষ্কৃতির জাল ব্যাপক ভাবে বিছানো আছে। গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় এবং ফৌজদারী আদালতের সওয়াল-জবাবে সময়-সময় এই জালের সূত্র কিছু-কিছু হাতে আসে। তা থেকে এমন সমস্ত লোক ও ঘটনার পরিচয় মেলে, যা কণ্টকিত হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু শুধু কণ্টকিত হলে বা ছি-ছি করে চীৎকার করলেই হবে না। এই অন্তঃপ্রবাহী অপরাধের দুষ্ট রক্ত সমাজ দেহ থেকে নিষ্কাশিত করতে হবে। নইলে ভেতরে ভেতরে বিষিয়েই দেশ একদিন

সাবাড় হয়ে যাবে। ব্যক্তি নিয়েই সমাজ এবং সমাজের সমাহারই রাষ্ট্র। সুতরাং ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ, দীপ্ত ও দুর্নীতিমুক্ত করে তুলতে হবে, তবেই তার ওপর গড়ে উঠবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের ইমারত।

দুর্নীতির ব্যবসার সকল দিক আমার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি শুধু যৌনাত্মক অন্যায় এবং অনাচারের ব্যবসাগুলি নিয়েই বিচার করব। প্রথম উল্লেখ করব আমি মাসাজ ক্লিনিক বা অঙ্গ-সংবাহনাগার গুলির কথা। অনেকেই জানেন আশা করি কলিকাতা পুলিশ সহরের কতকগুলি সমাজ-ক্লিনিকে হানা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষে শতাধিক ব্যক্তিকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করেন। এই সূত্রে জানা যায় যে অঙ্গ-মর্দন ও শরীর-বিনোদনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত এই সমস্ত ক্লিনিকে বৈদ্যুতিক দেহ-চিকিৎসার উপায়-উপকরণাদি স্থাপিত করে, তারি আড়ালে চলে গোপন পাপের ব্যবসা এবং এংলো ইণ্ডিয়ান, খাসিয়া, পাঞ্জাবী, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, নানা জাতির মেয়েদের দিয়ে এই ব্যবসা চালায় এই সব ক্লিনিকের মালিকেরা। আশঙ্কা করি, বে-আইনী যৌনাচরণের মতো বে-আইনী গর্ভ-পাতনের ব্যবসাও চলে এই সব ক্লিনিকে। অথবা সে কাজের জন্যেও অনুরূপ ক্লিনিক সহরের ইতস্তত আছে। অনেক 'নার্স-ইউনিয়ন' ও 'মেডিক্যাল সোসাইটি' আছে, অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, যাদের আসল ব্যবসা এই। 'নার্স ও নার্সিং' বইয়ে অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় এই সমস্ত ইউনিয়ন ও সোসাইটির ভেতরকার খবর যে ভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন, তারপর এ সম্বন্ধে আর নূতন কিছু বলার নেই।

কিছু কাল নার্সিং-এর কাজ করেছেন, তারপর এই ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন, এমন কয়েক জন মহিলার জবান বন্দী আমিও নিয়েছি। তাঁরা প্রায় সকলেই বলেছেন যে রোগী ও প্রসূতি পরিচর্যা করানোর নাম করে রাত্রে ইতর ধনীরা নার্সদের নিয়ে যায় এবং প্রভূত অর্থের প্রলোভনে কু-কর্মে লিপ্ত করে। এটা ও-মুল্লুকে এমনি সর্বজনীন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে যে একমাত্র বৃদ্ধ, কুদর্শন ও নির্লোভ চরিত্র না হলে, কোন নারীর নার্সিং-এর ব্যবসায় ভদ্র থাকা দুষ্কর। একজন বলেছেন, কোন ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে প্রসূতি-সেবার নামে আমন্ত্রিত হয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি কলকতার উপান্তে এক বাগান-বাড়ীতে নীত হন এবং সেখানে জনা-দশ মদ্যপের দ্বারা আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হন। এই ঘটনায় তিনি এক রাত্রে হাজার টাকার বেশী উপার্জন করলেও,

বিশেষ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রকৃত পক্ষে এই কারণেই অবশেষে ব্যবসা পরিত্যাগ করেন।

আর একজন বলেছেন; প্রথম-প্রথম তিনি পরিচিত গৃহস্থবাটী না হলে কল নিতেন না। কিন্তু ক্রমশ অন্যান্য মেয়েকে প্রভূত উপার্জন করতে দেখে, নিজেকে তিনি ঠিক রাখতে অপারক হন এবং তখন থেকেই তিনি গোপনে পাপের ব্যবসা গ্রহণ করেন। তাঁর চেহারা ছিল সুশ্রী, তাই ব্যবসা তাঁর ভালোই জমেছিল। তারপর তাঁর কঠিন ব্যাধি হয় এবং সেখানেই তিনি ব্যবসায় ইস্তফা দিয়ে ভদ্র জীবনে ফিরে আসেন। ইনি বলেছেন, নার্সগিরির কাজে নার্সিং এখন গৌণ হয়েছে, মুখ্য হয়েছে পাপের ব্যবসা।

এক যুবক বলেছিলেন, হকি খেলায় পায়ে চোট লেগে তাঁর হাঁটুর গ্রন্থিতে স্থায়ী একটা বাতের বেদনা হয়। ডাক্তার তাঁকে এজন্যে ইলেকট্রোপ্যাথি সম্মত চিকিৎসা ও মাসাজ করাতে পরামর্শ দেন। তিনি যে ক্লিনিকে মাসাজ করাতেন, সেখানে উদ্বৃত্ত বখশিসের বিনিময়ে তিন-চারটি নার্স বিভিন্ন সময়ে সেখানেই তাঁর সঙ্গে 'বন্ধুত্ব' করতে রাজী হন। স্বয়ং প্রধান সিষ্টারও নাকি একাধিক বার এই বিষয়ক ইঙ্গিত দেন। আর এক জনের অভিজ্ঞতাও প্রায় এই রকম। তিনি আলট্রা-ভায়োলেট চিকিৎসার জন্যে এক বীক্ষণাগারে যেতেন। সেখানে তাঁর কাছে সরাসরি দেহ-সম্পর্কের প্রস্তাব আসে একাধিক নার্সের কাছ থেকে। একটি গোপন গর্ভপাতের ঘটনা তিনি লক্ষ্য করেন এই জায়গায়। গর্ভপাতকালীন বিপত্তির ফলে একটি কুমারীর মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার লোমহর্ষণ ঘটনাও পেয়েছিলাম একটি আর এক জায়গায়, যা সুজাতা সরকারের কাহিনীর চেয়ে কম মর্মান্তিক নয়।

কি ভাবে নারী ও নাবালক ছেলে-মেয়ে অপহৃত হয় এবং সেই অপহৃত নারী ও নাবালিকাদের পতিতালয়ে আর ছেলেদের গুণ্ডা ও ভিখারীদের আখড়ায় বিক্রী করা হয়, তার কাহিনী আগেই বলেছি। আটক কারীদের অনবধানতার সুযোগে বা কোন-না-কোন দয়াবান ব্যক্তির অনুগ্রহে এই সমস্ত দুষ্কৃতির আড্ডাখানা থেকে উদ্ধার পেয়ে যারা ফিরে এসেছে, তাদের কাছে জেরা ও জিজ্ঞাসা করে এই মুল্লুকের ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়। ট্রেণ বা নৌকা বোঝাই দিয়ে আড়কাঠিরা এই সমস্ত অপহৃতদের এক ঘাঁটি থেকে আর এক ঘাঁটিতে চালান দেয়। নানা স্থানে নানা ছদ্মবেশী জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান আশ্রয় দানের অজুহাতে তাদের সাময়িক ভাবে

বন্দী করে রাখে। তারপর সুযোগ-সুবিধা মতো রকমারি অছিলায় তাদের ইতস্তত পাচার করে দিয়ে মোটা দস্তুরী কামায়। এই ব্যবসা সহরে ও সহরতলীতে অব্যাহত ধারায় চলেছে। সাধারণত এর একাংশকে আমরা নারীহরণ ও অন্যাংশকে ছেলে-মেয়ে হারানো বলে চালাই। আসলে এই হরণ ও হারানোর বেশীর ভাগই যে দুর্নীতির ব্যবসার আনুষঙ্গিক রূপে ঘটে, তা আমরা জানিনা। মাঝে মাঝে পুলিশ ছেলে-ধরা ও নারী-অপহারক রূপী এই ব্যবসার দালাল দু-চারজনকে ধরে। তখনি সেই টানে পশ্চাদ্বর্তী প্রতিষ্ঠান ও পালের গোদাদের কিছু-কিছু কাহিনী বাইরে বেরিয়ে আসে।

বে-আইনী বই, ছবি-ছাবা, যন্ত্র-পাতি ও ওষুধের কারবার বা অশ্লীল ছায়া-চিত্রের কারবার কি হারে চলে এবং সহর ও সহরতলীর অলি-গলিতে ছদ্মবেশী দালালরা কি ভাবে এই সব পণ্যের লেন-দেন করে তার অভিজ্ঞতা আশা করি এক-আধটু বহুজনের আছে। এদের কৌশলে প্রতারিত হয়ে এই সব দ্রব্য কিনেছেন, অথবা এই সব ছায়াচিত্র দেখেছেন, এমন লোক চেনা-শোনার মধ্যে দু-এক জন আছেন সকলেরই। এক ভদ্রলোক কোন দরিদ্র ব্যক্তির তাগাদায় অস্থির হয়ে তাঁর কাছে কতকগুলি পুরাতন ইংরেজী ও বাংলা বই কেনেন। এই বইগুলি উল্টে-পাল্টে দেখার জন্যে আমার হাতে আসে। কয়েকখানি ইংরেজী উপন্যাস, তিন চারখানি ডাক্তারী বই ও সুলভ ধর্মগ্রন্থ ছাড়া বাকী বইগুলি সবই বে-আইনী মুদ্রণ। অশ্লীল অনাচারের কাহিনী, জঘন্য অশ্লীল ভাষায় লেখা। কোন প্রেসে মুদ্রিত, কার দ্বারা লিখিত, সে-সব বোঝার উপায় নেই। কিন্তু এই মোটা মোটা বইগুলো লেখা হয়েছে, ছাপানো হয়েছে এবং ছবি ও মোলাট সহযোগে বাঁধানো হয়েছে, পাড়ায় পাড়ায় লুকিয়ে বিক্রী করা হচ্ছে, এ দেখেই বোঝা যায় যে একযোগে বহু জন এর পেছনে আছে এবং এ থেকে করে খাচ্ছে। এই উপলক্ষে 'হঠযোগে', 'হেমনলিনীর আত্মকাহিনী', 'সহজ রস-তরঙ্গিণী' প্রভৃতি বাংলা এবং 'Tell Your First Story', 'The Other Side of the Table', 'The Gateway to Heaven' প্রভৃতি ইংরাজী বই নেড়ে চেড়ে দেখেছি, ঘৃণ্যতম পারিবারিক ব্যভিচার ও যৌনাপরাধের কাহিনী এই সব বইয়ে বর্ণিত হয়েছে এবং হয়েছে সেই ভাষায়, যে ভাষায় ইতর ব্যক্তিরা সাধারণ শৌচাগারের দেওয়াল কলঙ্কিত করে।

ছবিও কিছু কিছু দেখেছি। কিনে প্রতারিত হয়েছেন বা জেনে শুনেই কিনেছেন, এমন লোকেরাই দেখিয়েছেন। বিবস্ত্র ও কুকার্য নিরত নর-নারীর একক বা মিলিত দুষ্কৃতির এই সব ফোটোগ্রাফ সাধারণ ভাবে 'প্যারিস পিকচার' নামে চলে। এর ভেতর বিদেশী ছবিই বেশী থাকে, যদিও স্বদেশী ছবিরও অভাব নেই। কি বই, আর কি ছবি, সবই শুনেছি রীতিমতো উচ্চমূল্যে বিক্রী হয়। অবিবাহিত তরুণ-তরুণীদের বা অবস্থাপন্ন দুশ্চরিত্রদের মহলে পতিতা পল্লীতে, বার, রেঁস্তরাঁ ও নাইট-ক্লাবে এই সব বই ও ছবির প্রচলন যথেষ্ট আছে। অশ্লীল ছায়া-ছবির প্রচলনও আছে প্রধানত এই সব জায়গাতেই।

ক্লাবে, মেসে বা বাগান-বাড়ীতে সর্বসাধারণের অগোচরে ব্লু-ফিল্ম দেখিয়ে পয়সা কামায়, এমন ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী বদমায়েসদের দল আছে। আবার অবস্থাপন্ন সৌখীনেরা নিজেদের মধ্যে স্ফূর্তি করার জন্যে এবং ভদ্র কুমারীদের বখাবার জন্যে এই জাতীয় ফিল্ম বানায় ও প্রদর্শন করে, এমনও আছে। উচ্চ বখশিস ভিন্ন যে এ-সব জিনিষের উৎপাদন ও প্রচার হয় না, ত বলাই অনাবশ্যক। মোটা ঘুষ না পেলে মুদ্রাকর এবং দপ্তরী নিশ্চয় এ-সব বই ছাপাতে বা বাঁধাতে রাজী হয় না। ফোটোগ্রাফ বা ফিল্ম তৈরীর জন্যে নিশ্চয় পোষা গুণ্ডা ও পতিতাদের, অথবা কুচরিত্রা প্রণয়িনীদের মোটা দক্ষিণাই দিতে হয়। কিংবা তারাও হয়ত লভ্যাংশে সমুচিত বখরার বিনিময়ে একযোগে ব্যবসা করে। মোটের ওপর এই ব্যবসার পরিধিও ব্যাপক।

এই রকম ফিল্ম বার কয়েক দেখেছেন এমন এক ভদ্রলোক বলেছেন, এই সব ফিল্মে ভয়াবহ পাশবিকতার কাহিনী চিত্রের মাধ্যমে পরিবেষণ করা হয় এবং তথাকথিত পদস্থ ও ক্ষমতাবান লোকেরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বসে তাই দেখেন। সঙ্গে অনেকে প্রণয়িণী কুমারী, পরস্ত্রী বা পেশাদার পতিতাদের নিয়ে যান এবং এক-একটি 'শো' বাবদ একশো-দেড়শো টাকা অকাতরে ব্যয় করে থাকেন। কয়েকখানি বিলেতী ছবিও তিনি দেখেছেন। তার একখানিতে নাকি যীশুখৃষ্ট ও মেরী মাদলিনের জীবনকে কুৎসিত ভাবে চিত্রিত করে দেখনো হয়েছে। আর একখানি পারিবারিক ব্যভিচারের কাহিনী। সেখানি আবার টেকনিকলার বা বহু বর্ণ-সম্বলিত। অবশ্য বিলেতী অপেক্ষা দেশী ছবিরই প্রাদুর্ভাব বেশী এবং তিনি বলেন, পাঞ্জাবী, সিন্ধী ও এংলো-ইণ্ডিয়ানরাই নাকি সাধারণত সে-সবের অভিনেতা, উদ্যোক্তা ও

পরিবেষক। কোন বিখ্যাত ভূম্যধিকারীর বাগান-বাড়ীতে পূর্ণিমা-সম্মেলন উপলক্ষে আহূত এক প্রাইভেট মজলিসে এমনি একটা ছবি দেখার সুযোগ হয়েছিল. এমন এক ভদ্রলোক বলেন যে তার নায়ক-নায়িকাদের ভেতর নাকি তাঁর চেনা মুখ দু-একটির সাক্ষাৎ মিলেছিল। দুষ্কৃতির তাড়নায়, কি অর্থের প্রলোভনে জানি না ভদ্র-সন্তানরা এই ফিল্মে অভিনয় করেছেন, এটা বিস্ময়ের কথা। কিন্তু দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির ইতিহাসে বোধ করি বিস্ময় বলে কোন জিনিষের স্থান নেই।

কিন্তু এ-সবের চেয়ে ধারক-শক্তি বৃদ্ধি ও গর্ভ-নিরোধ সংক্রান্ত ওষুধের ব্যবসা চলে অনেক বেশী পরিমাণে। তার কতকাংশ চলে চিকিৎসা ব্যবসার ছদ্মবেশে। যেমন রকমারি মোদক মালিশ ও বটিকা সোজাসুজি বিজ্ঞাপন দিয়েই বিক্রী হয়। কিন্তু বেশীর ভাগেরই বেচা-কেনা চলে গোপনে। ধারক-শক্তি এসবের প্রভাবে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিংবা এরা কতটা পর্যন্ত গর্ভপাত ও গর্ভ-নিরোধের সহায়ক জানিনা। তবে এই সব হাতুড়ে দাওয়াই ব্যবহারের ফলে অনেক ছেলে পাগল হয়ে গেছে এবং অনেক মেয়ে কঠিন ব্যাধিতে প্রাণ হারিয়েছে, এ জানার অবকাশ হয়েছে।

আর একটা ব্যবসাও বহুল পরিমাণে চলে থাকে, সে হল কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবসা। পারদের বল সম্বলিত জাপানী 'রিনো তামা', রবার নির্মিত বিলেতী 'ডিলডো', এবং কাচ, সেলুলয়েড বা প্লাষ্টিক নির্মিত মার্কিন consolator আশা করি কেউ-কেউ দেখেছেন। বিদেশে নির্মিত এই সব কৃত্রিম জননেন্দ্রিয় অসৎ ব্যবসার অন্ধগলি দিয়ে নিঃশব্দে এ দেশের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে। তা ছাড়া এদেশেও পোড়া মাটি, কাঠ এবং বেলে-পাথরে কৃত্রিম যৌনাঙ্গ তৈরী হয় এবং তারও চোরাই বিকি-কিনি আছে। দাক্ষিণাত্যে তামার এবং উত্তর রাঢ়ে ও উড়িষ্যার পোড়া মাটির লিঙ্গ প্রকাশ্য মেলায় বিক্রী হতে নিশ্চয় অনেক দেখেছেন। মাহেশের রথে অদ্যাবধি সোলার লিঙ্গ প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হয়। এর ভেতর সোলার গুলি ছাড়া অন্যগুলি সবই যে যৌনাধিকারবঞ্চিত নারীদের বিনোদনার্থে তৈরি, তাতে আর সন্দেহ নেই।

মোটের ওপর নগর জীবনের আনাচে-কানাচে ব্যাপক হারে এই সব দুর্নীতির ব্যবসা চলে এবং বহু লোক তার দ্বারা যেমন সমাজে দরাজ হাতে পাপ ও অধঃপতনের বীজ ছড়ায়, তেমনি প্রভূত টাকা অনুচিত পথে আহরণ

করে। এই ব্যবসার মূলোচ্ছেদ করতে হলে, শুধু পুলিশ ও গোয়েন্দাদের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। সমাজ-কল্যাণকামী প্রত্যেক নর-নারীকে এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে এবং গোপন বেশ্যা-বৃত্তির কারবার, অশ্লীল ছবি, বই ও ছায়াচিত্রের কারবার কঠিন হাতেই উচ্ছিন্ন করতে হবে। নারীহরণ ও শিশুহরণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। টোটকা ওষুধ ও আপত্তিকর যন্ত্র-পাতির ব্যবসা সতর্ক কঠোরতায় রহিত করতে হবে। জনসাধারণের অসতর্কতা, নিষ্ক্রিয়তা অথবা গোপন সহযোগিতাই যে এই সব পাপ-ব্যবসাকে জীইয়ে রেখেছে, এতে আর সন্দেহ নেই। অগ্রগামী যুগ ও জীবনের প্রয়োজন চিন্তা করেই এই অন্তঃপ্রবাহী দুর্নীতির ব্যবসা সমাজ-জীবন থেকে উৎখাত করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, এ ব্যবসার গণ্ডী শুধু দেশের চতুঃসীমাতেই আবদ্ধ নয়। অন্য দেশের বিবিধ অপ-পণ্য যে হারে এদেশে আসে, তাতেই অনুমান করা যেতে পারে যে বহুল পরিমাণে এ দেশের এই সব পণ্যও অন্য দেশে যায়। অর্থাৎ সভ্য জগতের শাসন ও শুল্ক-ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে এই দুর্নীতির ব্যবসা আন্তর্জাতিক ভাবে সারা দুনিয়ায় চেপে আছে, ঠিক সেই ভাবে যে-ভাবে আছে চোরাই মাদক, মুদ্রা ও অপহৃত মেয়ে বিক্রীর ব্যবসা। চোরাই মেয়ে বিক্রীর ব্যবসার যে খুব বড় একটা আন্তর্জাতিক রূপ আছে, তার পরিচয় পাওয়া গেছে অনেক আগেই, চীনে, মিশরে, ইরাণে, ও পশ্চিম ইউরোপের নানা স্থানে বিভিন্ন সময়ে অপহৃত ভারতের মেয়ে আবিষ্কৃত হওয়ায়। অন্যান্য দেশেও এ ব্যবসার প্রচলন কম নয়। অনেকের হয়ত স্মরণ আছে, একদা বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘ এই আন্তর্জাতিক অনাচার ও অপব্যবসা বন্ধ করার জন্যে স্বতন্ত্র একটা বিভাগ খুলতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের এ সম্বন্ধীয় পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র গুলি এখনো পড়ে দেখা যেতে পারে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

হরণ ও ধর্ষণ

বাংলা দেশে নারীহরণ ও ধর্ষণ একটা প্রাত্যাহিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যে-কোন দিনের সংবাদপত্র খুললেই দেখা যাবে, একটি-ত্বটি নারী হরণের খবর প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনী সর্বত্র এক। বাড়ীতে বয়স্ক পুরুষ মানুষ ছিল না, এই অবসরে ত্বর্বৃত্তেরা প্রাচীর টপকে বা বেড়া ভেঙে ঘরে ঢুকেছে এবং বলপূর্বক কুলনারীকে টেনে নিয়ে গেছে। নয়ত জনহীন ঘাটে বা মাঠে নিরুপায় নারীকে একা পেয়ে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। কদাচিৎ দলবদ্ধ ভাবে বাড়ী চড়াও, লুণ্ঠন এবং নারীহরণও হয়। তবে সে-রকম ঘটনা পাইকারি হারে কোনদিন ঘটে না।

অপহারক অন্য ধর্মাবলম্বী হলে, সাধারণত এই সব মেয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে কোন-না-কোন লোকের পত্নীত্ব লাভ করে। স্ব-ধর্মাবলম্বী হলে, কিছু দিন বা অনেকদিন অপহারকের জিম্মায় থেকে, তার ও তার সঙ্গী-সাথীদের ত্বষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। তারপর হয় পেশাদার পতিতালয়ে চালান হয়ে যায়, নয় উদ্ধার পেয়ে কোন-না-কোন নারী-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে স্থান পায়। নিজেদের দৌর্বল্য ও অসাবধানতায় যে মেয়েদের আমরা নারী-শিকারীদের কবল থেকে রক্ষা করতে পারি না, উদ্ধার পেয়ে তারা যখন ফিরে আসে, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুদার রক্ষণশীলতা বশে তাদের আমরা ঘরে ফিরিয়ে নিই না। তাই একবার যে মেয়ে অপহৃতা হয়, চিরদিনের জন্যেই সে যায় সমাজের বাইরে চলে।

কি ভাবে অপহৃতা মেয়েকে ধর্মান্তরিত করে বিবাহ করা হয়, তা আর ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। পতিতালয়ের আড়কাঠিদের সাহায্যে অপহৃতা মেয়েক বেশ্যা-মুল্লুকে পাচার করে দেওয়ার কাহিনীও পূর্বে বলেছি। সাধারণত অপহৃতা মেয়ের ভাগ্যে এই ত্বটোর যে-কোন একটা ঘটে। যারা উদ্ধার পেয়ে বাড়ীতে পুনর্গৃহীতা হয়, তারা অবশ্য অধঃপাত থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু যারা বাড়ীতে স্থান না হওয়ায় উদ্ধারাশ্রমে যায়, (তাদের সংখ্যাও কম নয়), তারা প্রায় সকলেই অবস্থা গতিকে আস্তে আস্তে সমাজ-জীবনের বাইরে গিয়ে পড়ে। বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানেই এই সব মেয়েকে সমাজের পক্ষে উপযোগী করে তোলার মতো শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই মোটা টাকার

বিনিময়ে ধর্ষিতা মেয়েদের পাঞ্জাবী, সিন্ধী, ভাটিয়া, নেপালী প্রভৃতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। অথবা অন্ন-বস্ত্র দিয়ে জীইয়ে রেখে, তাদের দ্বারা অন্য ভাবে অর্থাগম করানো হয়। খুব কম মেয়েই এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে পরবর্তী কালে সমাজ-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ভদ্র-গৃহিণীত্ব লাভ করেছে। অর্থাৎ মেয়ে একবার অপহৃতা হলেই, সমাজের খাতা থেকে তার নাম কাটা যায়। তার আর সেখানে স্থান হয় না। এই ভাবে প্রতি বৎসর কত কুমারী, বিবাহিতা ও বিধবা মেয়ে যে বিনা অপরাধে স্বজাতি ও স্বগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তা আমরা ভেবেও দেখি না।

নগর, বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্রে সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখে রং লাগিয়ে যে পতিতারা খরিদ্দারের অপেক্ষা করে, তারা যে কেউ ব্যাঙের ছাতার মতো মাটি ফুঁড়ে ওঠেনি, তারা যে এই সমাজেরই মেয়ে, কোন-না-কোন বিপাকে সমাজ থেকে স্খলিত হয়েই যে তারা এই পথে এসে পড়েছে, একথা আমরা কি কখনো ভাবি? যারা অপহৃতা হয়ে ধর্মান্তরণের পথে এক সমাজ থেকে আর এক সমাজে এসে ঢোকে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সন্তান-সন্ততি দান করে, অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, তাদের জন্যে আমরা কে মাথা ঘামাই? যারা কোন-না-কোন উদ্ধারাশ্রমের মাধ্যমে শুদ্ধীকৃতা ও বিবাহিতা হয়ে আপন অভিরুচির বিরুদ্ধেই অন্য মুল্লুকে চালান হয়ে যায়, তাদের জন্যে আমরা কে দরদ বোধ করি? কিন্তু সংখ্যায় তারা নিতান্ত কম নয়। যে সমাজে বয়স্কা কুমারী ও তরুণী বিধবার সংখ্যা এত বেশী, শিশু-মৃত্যুর পরিমাণ এত অধিক, সে সমাজে এই রকম পাইকারি হারে সম্ভাবনীয় মাতৃত্বের অপচয় হওয়া যে কত বড় দুর্ভাবনার কথা, তা বোধহয় ভেবে দেখা দরকার।

তাছাড়া নিছক মনুষ্যত্বের দিক থেকে বিচার করলেও, বিষয়টা কি দেশ ও জাতির পক্ষে সম্মানের যোগ্য? গৃহপালিত জীব-জন্তু ও তৈজস-পত্রের মতো নারীকে চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে, আমরা তাদের রক্ষা করতে পারব না, উদ্ধার হয়ে এলেও ঘরে নেব না, সেই সুযোগে অপহৃতারা হয় অন্য সমাজে, নয় পতিতালয়ে, নয় ভিন্ন দেশে চালান হয়ে যাবে, নারী সম্পর্কে, সমাজের মাতৃ-জাতি সম্পর্কে, এ কি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব-জ্ঞানের পরিচায়ক? যে সমাজে মানুষ তার আদর্শ ও অভিরুচি অনুযায়ী বাঁচতে পারে না, তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেখানে এই ভাবে দুর্বৃত্তদের বাহুবলে নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সমাজ কি মানুষের পক্ষে বসবাস-যোগ্য? দুঃখের বিষয়, ভারতের মাতৃতান্ত্রিক ধর্ম নিয়ে

আমাদের প্রভূত গর্ব থাকলেও এবং জননী জন্মভূমির নামে হুঙ্কার ছাড়ার অভ্যাস আমাদের প্রবল হলেও, প্রকৃত মাতৃজাতি সম্বন্ধে আমরা কোন কর্তব্য অদ্যাবধি পালন করিনি। আমাদের মেয়েরা দিনের পর দিন এই ভাবে আমাদেরই চোখের ওপর দিয়ে অধঃপাত, গ্লানি ও দুর্দশার পঙ্কে তলিয়ে যাচ্ছে। কি পুরুষ, আর কি নারী, কেউ যে এই হতভাগিনীদের জন্যে খুব বেশী মাথা ঘামান, তার পরিচয় এখনো কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

সহরের বক্তৃতা-মঞ্চে তাঁরা নারী-রক্ষার নামে ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। সর্ব-দৃষ্টির আড়ালে অরক্ষিত গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র কৃষকের ঘর থেকে, কিংবা পুকুরঘাট ও দেবমন্দির থেকে গুণ্ডারা যেখানে অসহায় কুমারী, বধূ ও বিধবাকে টেনে নিয়ে যায়, গাড়ী ও নৌকায় উঠিয়ে দূর দূরান্তরে পাচার করে দেয়, সেখানে কোনদিন তাঁদের পায়ের ধূলো পড়ে না। এই ঔদাসীন্য, নিশ্চেষ্টতা ও গোঁড়ামির ধাক্কায় সমাজ-সৌধের তলা যে কি ভাবে অলক্ষ্যে একটু-একটু করে ধ্বসে যাচ্ছে, তা আজ ভাবার দিন এসেছে।

ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে পুঁজি থেকে কতকগুলো ঘটনা এখানে বিবৃত করছি। তাতে হয়ত পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সমস্যার গুরুত্ব খানিকটা বোঝার সুবিধা হবে। এক নাপিত বধূ পশ্চিম বঙ্গের কোন গ্রাম থেকে একদা অপহৃতা হয়। তিনটি দুর্বৃত্ত তাকে নদীর ঘাট থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং এক গোপন স্থানে আটক রেখে, দলবদ্ধ ভাবে তার ওপর অত্যাচার চালাতে থাকে। কয়েক দিন পরে এক ফাঁকে তাদের হাত এড়িয়ে সে বাড়ী ফিরে আসে এবং তার স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে সরোদনে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে। তারা তাকে আশ্রয় দিল না। এমন কি, তার শিশু সন্তানটিকে পর্যন্ত স্পর্শ করতে দিল না। নিরুপায় হয়ে সে আত্মীয়-স্বজনের দ্বারে দ্বারে ঘুরল। কোথাও আশ্রয় মিলল না। সে ধর্ষিতা, ধর্মভ্রষ্টা, তাকে আশ্রয় দেবে কে? তখন প্রতিহিংসা বশেই সে চলে গেল অপহারকদের কাছে। তাদের একজন তাকে বিবাহ করল। এখন সে সেই বাড়ীর বধূ, তার অনেকগুলি ছেলে-পুলে হয়েছে। বহু চেষ্টায় তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা হয়েছিল। তাকে স্বধর্মে ফিরে আসার অনুরোধও জানানো হয়েছিল। এক কথায় সে সব কথার জবাব দিয়ে দিয়েছে: তোমাদের আমি বিশ্বাস করি না। বিপদের সময় রক্ষা করতে পারো নি। ফিরে গিয়েছিলাম, ঠাঁই দাওনি। এখন ডাকতে এসেছ কেন?

আর একটি গোয়ালা মেয়ে অল্পবয়সে বিধবা হয়ে পিত্রালয়ে থাকত। তার

দেবর তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু ভাইয়েরা ঈষৎ শিক্ষিত হওয়ায়, বোনকে দ্বিতীয় বার আর সাঙ্গা করতে দেয় নি। এই দেবরের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ের ফলে মেয়েটি গর্ভবতী হয়। তখন তাকে গর্ভপাত করতে, অথবা বাড়ী থেকে বিদায় হতে বলা হয়। মেয়েটি বিদায় হয় এবং এক ভিন্নধর্মাবলম্বী তাকে আশ্রয় দেয়। ঐ গর্ভস্থ সন্তান সহ মেয়েটিকে সে গ্রহণ করে। তখন থেকে সে তার স্ত্রী। এই মেয়েটিকে উদ্ধারের চেষ্টাও নিষ্ফল হয়। বে-আইনী গর্ভের জন্যে যে দায়ী, তার চেয়ে তার আশ্রয়দাতা যে তার কাছে বেশী সম্মানের পাত্র, একথা মেয়েটি অসঙ্কোচে ব্যক্ত করে। অন্য ধর্মের আওতায় যাবার ইচ্ছা যে মেয়ে দুটির ছিল না, শুধু নিরুপায় হয়েই যে তারা নিছক বাঁচার প্রয়োজনে চলে গেছে এবং সে-জন্যে যে তাদের আত্মীয়-স্বজনেরাই দায়ী, এ কথা কি অস্বীকার করা যায় কোন রকমে ?

অবশ্য বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করাই বেশী ঘটে। সে রকম কাহিনীও কয়েকটা বলছি। তাঁতীদের এক চোদ্দ বছর বয়স্কা মেয়েকে দক্ষিণ রাঢ়ের কোন গ্রাম থেকে একটি লোক মেলা দেখাবার নাম করে নিয়ে এসে, এক অন্য ধর্মাবলম্বীর হাতে তুলে দেয়। ঐ লোকটি এবং তার পরিবারস্থ মেয়েরা মেয়েটিকে বাড়ীর ভেতর নজর-বন্দী করে রাখে এবং তাকে তাদের ধর্ম নেবার জন্যে অষ্টপ্রহর প্ররোচিত করে। মেয়েটি বিবাহিতা। সে কিছুতেই রাজী হল না। তখন বাড়ীর কর্তা ষাট বৎসরের বৃদ্ধ, তার দুই পুত্র এবং আরো দু-একজন লোক তাকে নিয়মিত পীড়ন শুরু করল। এক বৎসরের অধিক কাল এই ভাবে পীড়িতা ও নিগৃহীতা হবার পর সে যখন গর্ভবতী, তখন তাকে উদ্ধার করা হল। কেউ কিন্তু তাকে ঘরে নিল না। তখন নিরুপায় হয়ে সে আবার ফিরে গিয়ে ওদের আশ্রয় চাইল। ওরা তাকে আশ্রয় দিল। ধর্মান্তরিত করে একটি ছেলের সঙ্গে বিয়েও দিল। কিন্তু পরিবারস্থ পুরুষদের পীড়ন ও মেয়েদের নির্যাতনে অধীর হয়ে মেয়েটি শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারল না। গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ল পতিতালয়ে।

আর একটি মেয়ের কাহিনীও সমান করুণ। তাকে বাড়ী থেকে ডাকাতেরা জোর করে ধরে নিয়ে যায়। বাপ-ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় তাকে রক্ষার চেষ্টা করেন নি। মেয়েটিকে নিয়ে ডাকাতেরা যখন নৌকায় ওঠাচ্ছে, তখন অন্য ধর্মাবলম্বী এক যুবক তাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে। তার বাড়ীতেই মেয়েটি স্থান পায়। কিন্তু পাড়ার মন্দ লোকেরা চেষ্টা করতে থাকে তাকে

কু-পথে টানতে। তখন যুবক তাকে বলে, তুমি যদি আমায় বিবাহ করো, তাহলে আমি তোমায় রক্ষা করতে পারি। নইলে ওদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর সাধ্য আমার নেই। মেয়েটি নিরুপায়, তদুপরি যুবকের কাছে সে কৃতজ্ঞ। সে তাকে বিবাহ করল। তার সন্তান-সন্ততি হয়েছে। বাপ-ভাই তার খবর পেয়ে মামলা করেছিলেন, কিন্তু সে স্বেচ্ছায় ধর্ম-ত্যাগ ও বিবাহ করেছে বলায় মামলা ফেঁসে যায়। এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। আপন ধর্ম, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, সকলের ওপর তার প্রগাঢ় বিতৃষ্ণা জন্মেছে। কিছুতেই তাকে স্বধর্মে ফেরানো যায় নি।

আর একটি মেয়েকে আমি উত্তর বঙ্গের কোন পল্লীগ্রামে ক্ষেত পাহারা দিতে দেখে জিজ্ঞাসা করি, সে কোন ধর্মাবলম্বী? এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে বললে, সে হিন্দু অপহৃতা এবং তার বাড়ী যশোহর। এক অন্য ধর্মাবলম্বী গোলদার তাকে কয়েক টাকা মূল্যে কিনেছে এবং তাকে দিয়ে পতিতা-বৃত্তি করিয়ে টাকা রোজগার করছে। তাকে উদ্ধার করার আয়োজন করি। কিন্তু আশ-পাশের চাষীরা টের পেয়ে তখনি দলবদ্ধ ভাবে এসে হাজির হয় এবং আমার সামনেই মেয়েটির চুল ধরে টানতে টানতে তাকে গ্রামের ভেতর নিয়ে যায়।

এই রকম ঘটনা অনেক আছে, কিন্তু তার আর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। মোটের ওপর মনে রাখতে হবে, আমাদের ঘরেরই অনেক মেয়ে আমাদের অকর্মণ্যতা ও গোঁড়ামির দোষে এই ভাবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ঘরে গিয়ে পড়েছে এবং তাদের গর্ভস্থ সন্তানরা আজ আমাদের মাথা লক্ষ্য করে লাঠি-তলোয়ার হাঁকাচ্ছে। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে এবং সামাজিক মনস্তত্ত্বে আর একটু সহনশীলতা ও ঔদার্য থাকলে, এরা আমাদেরই ঘরে থাকত। এদের ছেলে-মেয়েরা আমাদেরই গোষ্ঠীভুক্ত রূপে দেশ ও জাতিকে, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে পুষ্ট করত। আমরাই বুদ্ধির বিপাকে এদের হারিয়েছি এই ভাবে।

পতিতা-বৃত্তির আওতায় কি করে এত মেয়ে আসে, ঐ বিষয়ক অধ্যায়ে এর আগে তা বর্ণনা করেছি। যে-সমস্ত কারণে নারী পাতিত্য নিতে বাধ্য হয়, তার মধ্যে অপহরণ, ধর্ষণ ও পতিতালয়ে বিক্রী হল সর্বপ্রধান। প্রলুব্ধ করে হক, বল-প্রয়োগ করে হক, কুল-নারীকে ঘরের বের করে দুর্বৃত্তেরা কিছুদিন বা দীর্ঘদিন তার ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। তারপর হয় তাকে ফেলে পালায়, নয় কোন পতিতালয়ে বেচে দেয়। যার আর্থিক অবস্থা ভালো, এমন

এমন লোক কেউ-কেউ হয়ত শেষ পর্যন্ত রক্ষিতা করে রাখে এবং গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু সে-রকম লোক সাধারণত অপহারক-গোষ্ঠীর মধ্যে সুলভ নয়। তাছাড়া আমাদের স্বধর্মাবলম্বীরা অপহরণ ও ধর্ষণে তৎপর হলেও, বৈধ উপায়ে অপহৃতা নারীকে বিবাহ করতে প্রস্তুত নয়। কাজেই একবার অপহৃতা ও ধর্ষিতা হলে সমাজে পুনর্গৃহীত হবার আশা নেই জেনেও, অনেক মেয়ে স্বেচ্ছায় পতিতা-বৃত্তি গ্রহণ করে। কিংবা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন লোক বিবাহের প্রস্তাব করলে, তাতেও সম্মত হয়।

বছর-কুড়ি বয়সের এক সুন্দরী তরুণীকে কলকাতার কোন পতিতালয় থেকে উদ্ধারের চেষ্টা হয়। সে কিছুতেই তার বাড়ীর ঠিকানা বলতে চাইল না। শুধু বলল যে বাড়ীতে তার সবাই আছে, বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী, সবাই। তাদের চোখের ওপর দিয়েই ডাকাতরা তাকে লুঠ করে এনেছে। তারা বাধা দেয় নি। কোথায় সে আছে তা জেনেও উদ্ধার করে নি। কত দিন সে অপেক্ষা করেছে, কত কেঁদেছে! এখন আর সে কি জন্যে ঘরে ফিরে যাবে? তাকে ত সবাই বিসর্জন দিয়েছে! আর একটি পতিতা স্ত্রীলোক এক বার হাওড়া ষ্টেশনে আমার কাছে দুটি টাকা চায়। কথা-প্রসঙ্গে জানতে পারি, সে উলুবেড়ের মেয়ে। বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ছিল, সেখান থেকে এক ব্যক্তি তাকে ফুসলে বার করে আনে ও তার অজ্ঞাতেই তাকে হাড়কাটা গলিতে চালান করে দেয়। এখানে দু-তিন বছর সে বন্দী থেকেছে এবং গুণ্ডা ও বাড়ীওয়ালীর খপরদারিতে দিনের পর দিন গণিকা-বৃত্তি করেছে। এখন তার কঠিন অসুখ, তারা তাই তাকে বিদায় করে দিয়েছে। সে তারকেশ্বরে যেতে চায়, সেখানে সে ভিক্ষা করে খাবে। তাকে সহরতলীর কোন নারী-প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দিই। সেখানে কয়েক মাস থেকে একটু সুস্থ হবার পর সে সকলের অলক্ষ্যে সেখান থেকে পালায়। আর একটি বধূকে একবার উদ্ধার করা হয় কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে। সেখানে একদল গুণ্ডা তাঁকে একটা ভাড়া বাড়ীতে আটক রেখে, বৎসরাধিক কাল পাপের ব্যবসা করাচ্ছিল। এই মেয়েটিকে এক ভারতীয় খ্রীষ্টান বিবাহ করেছেন। এখন এঁর সন্তান-সন্ততি হয়েছে। লেখকের সঙ্গে অদ্যাবধি তাঁর পত্রালাপ আছে। মেয়েটি শিক্ষিতা, বি-এ পর্যন্ত পড়েছিলেন। এক যুবকের সঙ্গে প্রণয় করে গৃহত্যাগ করেন। সেই দুর্বৃত্তই তাঁকে অর্থের বিনিময়ে গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিয়ে সরে পড়েছিল।

এই ভাবে এবং আরো নানা ভাবে মেয়েরা অপহৃতা হয়ে বেশ্যা-বৃত্তির

আওতায় এসে পড়ে। দরিদ্র গ্রাম্যবধূ, বিড়ম্বিতা বিধবা, পিতৃ-মাতৃহীন পথ-কুমারী, পদস্খলিতা ভদ্রনারী, নানা মূর্তিতে বিপাকে পতিতা নারীরা আমাদের আশে-পাশে ঘুরছে। বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে কেউ তাদের পাপের পথে আনে। কেউ বা বিবাহ করার অথবা অন্ন-বস্ত্র দেবার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে আনে, তারপর পতিতালয়ের প্রশস্ত বাজারে তাদের গছিয়ে দিয়ে যায় এবং সেখানে একবার ঢুকলে আর পরিত্রাণ কোথায়? সাধারণত নিম্নতম ঘরের মেয়েদের ভাগ্যেই এই বিপত্তি দেখা দেয়। উচ্চবিত্ত বা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের কারু কারু ভাগ্যেও অবশ্য কদাচিৎ এ বিপাক দেখা দিয়েছে বা দেয়।

জনৈক শিক্ষিত যুবক তার সুন্দরী পত্নীকে নিয়ে রেস-কোর্সে বেড়াতে গিয়েছিলেন সন্ধ্যার দিকে। চারটি লোক তাঁদের ঘিরে ধরে এবং ছোরা দেখিয়ে মেয়েটিকে তাঁদের সঙ্গে এক ঘোড়ার গাড়ীতে উঠতে বাধ্য করে। এই মেয়েটিকে তিন বৎসর পরে কোন বেশ্যালয় থেকে উদ্ধার করা হয়। সর্বাঙ্গে তাঁর উলকি তোলা হয়েছে। মদ্যপানে তীব্র আসক্তি জন্মেছে। আচার-ব্যবহার কোন কিছুতেই তাঁর আর ভদ্র সমাজের কিছুমাত্র লক্ষণ অবশিষ্ট নেই। তাঁর স্বামী তাঁকে বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলেন, কিন্তু পত্নীর মর্যাদা আর দেননি। কিছুকাল পরে ইনি এক কাহার ভৃত্যের সঙ্গে স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেন। অদ্যাবধি তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। আর এক জমিদারের অষ্টাদশী কুমারী কন্যাকে গুণ্ডারা ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে যায়। একাধিকবার বিভিন্ন স্থানে তার অবস্থিতির খবর পাওয়া গেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করা যায়নি। নিম্নবিত্ত গৃহে যে-রকম দুঃসাহসিক মেয়ে চুরি হয়, ধনী বা মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহে সচরাচর সে-রকম হয় না। এই সব মুল্লুকে ছদ্মবেশী বন্ধু ও পাতানো আত্মীয় রূপে মতলবী লোকেরা প্রবেশ করে এবং নানা অছিলায় মেয়েদের বিশ্বাস উৎপাদন করেই তাদের নিয়ে গিয়ে জটিল পাপের আবর্তে ফেলে। কার্নিভাল দেখানোর নাম করে এক ভদ্র-লোকের কন্যাকে নিয়ে গিয়ে কোন যুবক কি ভাবে তাকে সালকিয়ার এক বেশ্যালয়ে আটক করেছিল এবং সেখান থেকে কি হাঙ্গামা করে তাকে বের করে আনা হয়, সে কাহিনী নিশ্চয় অনেকে জানেন।

মোটের ওপর, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে-কোন ভাবে হক, বেশ্যালয়ের আড়কাঠি রূপে কাজ করে, এমন স্ত্রী-পুরুষ সমাজে প্রচুর আছে, এটা মনে রাখতে হবে। অন্য ধর্মাবলম্বী কর্তৃক যত নারী হরণ হয়, এদের দ্বারাও হয়

ঠিক ততই, বা তার কাছাকাছি এবং একের অপহৃতারা ভিন্ন সমাজের গোষ্ঠী বৃদ্ধি করে, অপরের অপহৃতারা করে পতিতাদের দলপুষ্টি। দুই অঞ্চল থেকেই কিছু-কিছু মেয়ে উদ্ধার করে আনা হয়, এ কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সেই উদ্ধার-প্রাপ্তারা শতকরা পাঁচজনও আর আর আপন গৃহ-সংসারে ফিরে যেতে পারে না। তারা সরকারী বা বেসরকারী কোন উদ্ধারাশ্রমে রক্ষিত হয় এবং সেখান থেকে বেশার ভাগই অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে বিবাহিত হয়ে বাইরে চলে যায়। কিছু অংশ থেকে যায় প্রতিষ্ঠানেই, সেখানে তারা আভ্যন্তরীণ কর্মীদের কু-বাসনা চরিতার্থ করে এবং পাপার্জিত অর্থে প্রতিষ্ঠানের তহবিল বৃদ্ধি করে।

এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানে পতিতালয় থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত এক তরুণী সেখানকার কোন কর্ম-কর্তার কৃপায় গর্ভবতী হলে, তাকে গর্ভ-পাতনের ওষুধ দেওয়া হয় এবং তার ফলে মেয়েটির মৃত্যু হয়। আর একটি মেয়েকে পতিতালয় থেকে উদ্ধার করে আনার পর, সেই পতিতালয়েরই এক জন খরিদ্দার কিছু টাকার বিনিময়ে তাকে উদ্ধারাশ্রম থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ করে নিয়ে যায় এবং নিয়ে গিয়ে আবার পূর্ব বৃত্তিতেই নিয়োজিত করে। সেখান থেকে পালিয়ে মেয়েটি প্রতিষ্ঠানে চলে এলে, তাকে পত্রপাঠ বিদায় হতে বলা হয়। বলপূর্বক অপহৃতা ও ধর্মান্তরিতা এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে তার অভিভাবকবর্গ একটি প্রতিষ্ঠানে রেখে যান। এই মেয়েটিকে মিথ্যা করে বয়স বাড়িয়ে, এক ধনী অবাঙালীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার দরুন উক্ত প্রতিষ্ঠানকে মামলায় জড়িত হতে হয়েছিল। পরে সেই বিবাহ বাতিল হয় এবং উদ্ধার পেয়ে মেয়েটি বলে যে তার স্বামী প্রকৃত পক্ষে তাকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করানোর জন্যে বিয়ে করেছিল। প্রতিদিন সে নূতন নূতন ছোকরা নিয়ে আসত এবং তাদের সঙ্গে মেয়েটিকে ঘরে বন্দী করে রাখত।

উত্তর ভারতের কোন ক্ষুদ্র শহরে এই ভাবে বিবাহের দ্বারা স্থানান্তরিতা এক বাঙালী তরুণী লাল ঘাঘরা পরে কুয়ো থেকে জল তুলছিল। একটি বাঙালী পর্যটককে দেখতে পেয়ে সে দৌড়ে কাছে আসে এবং সোজা বাংলায় জানায় যে সে বাঙালীর মেয়ে। তাকে এক দুর্বৃত্ত টাকা দিয়ে বিয়ে করে এনেছে, তারপর সে ও তার আত্মীয়-স্বজনেরা দলবদ্ধ ভাবে তার ওপর প্রতি দিন অত্যাচার করছে। প্রতি দিন আট-দশ জনের পীড়ন ও প্রহারে সে মরণাপন্ন হয়েছে। ভদ্রলোক বিশেষ চেষ্টা করেও মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পারেন নি।

অন্যান্য মেয়েদের কাছে খবর পেয়ে, বহু পুরুষমানুষ লাঠি-সোটা নিয়ে চার দিক থেকে যুবকটিকে ঘিরে ফেলে এবং বেগতিক দেখে তিনি সাইকেল হাঁকিয়ে পলায়ন করেন।

একটি উদ্ধারাশ্রমের বিবাহে লেখক সাক্ষী ছিলেন। বিয়ের কয়েক মাস পরে বেরিলি থেকে সেই মেয়েটি চিঠিতে জানায় যে তার জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। তার দুর্বৃত্ত স্বামী তাকে অত্যাচার করে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছে। উদ্ধারাশ্রম থেকে বিবাহিতা মেয়েকে দেশে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন তার সঙ্গে ঘর-করনা করার পর গোটা কতক সন্তান-সন্ততি হয়ে গেলে, তাকে বিদায় করে দেওয়ার ঘটনা খুব কম ঘটে না। অনেক নাকাল ও নির্যাতন ভোগ করার পর গড়াতে গড়াতে আবার স্বদেশে ফিরে এসেছে, এ রকম কয়েকটি মেয়ের সংস্রবে আসার সুযোগ হয়েছে। তাদের বিবৃতিতে যে ধরণের নৃশংসতা, ববরতা ও অবিবেচনার কাহিনী পাওয়া যায়, তাতে এই শ্রেণীর বিবাহকে ধর্মান্তরণ ও পতিতা-বৃত্তি গ্রহণের চেয়ে বিন্দুমাত্র ভালো বলা যায় না। বস্তুত এক রকম শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ হওয়া মেয়েকে আর এক প্রদেশের ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন আচার-পরায়ণ অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত লোকের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিলে, সে বিয়ে সুখের হবে কি করে? সে বিবাহের ভেতর প্রথমত থাকে না কোন মর্যাদার যোগ। দ্বিতীয়ত চিত্ত-বৃত্তির অসমন্বয় হেতু সে বিবাহ নিছক যৌন-সংসর্গেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই একেও নারী-ধর্ষণই বলা যেতে পারে। এ ধর্ষণে মধ্যস্থ রূপে থাকে একটা প্রতিষ্ঠান এবং টাকার বিনিময়ে তারা একটা রেজিষ্ট্রেশন করিয়ে দেয়, এই টুকু যা পার্থক্য। এই সব মেয়েকে স্ব-সমাজের যুবকেরা বিয়ে করলে, সে বিয়ে নিশ্চয় সুখের হতে পারে। কিন্তু করে কে? তেমন শিক্ষিত ও উদার-বুদ্ধি যুবক কোথায়?

কি ভাবে নারীহরণ হয় এবং অপহৃতা নারীদের অবস্থা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়, তা আগের পৃষ্ঠাগুলিতে বলেছি। কেন নারী-হরণ হয়, তার কারণ নির্দেশ করতে গেলে দেখা যায়, হয় ব্যক্তিগত দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অভিপ্রায় থেকে, নয় নারী বিক্রয়ের দ্বারা লাভবান হবার অভিপ্রায় থেকেই প্রধানত নারীহরণ হয়। পল্লীগ্রামে নিরক্ষর নিষ্কর্মারা বসে বসেই দিন কাটায়। অল্প একটু চাষ-বাস বা কুটীর-শিল্প করে জীবন ধারণের প্রয়োজনে, বাকী সময় তাদের করার কিছু নেই। স্বভাবতই কোন মেয়ে

বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এল, কোন মেয়েকে তার স্বামী ত্যাগ করল, কোন মেয়ে সাবালিকা হয়ে উঠল, এই নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে ঘোঁট করে। একক ভাবে হক, দল বেঁধে হক, তারা তাদের পিছনে তাক করে থাকে এবং সুযোগ পেলে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে, নইলে কুট্টনী নিযুক্ত করে তার সাহায্যে ফুসলিয়ে তারা তাদের ঘরের বের করে। অপহারকদের মধ্যে বিবাহিতের সংখ্যাই বেশী। তবু তারা এই কু-কার্য করে, শুধু কর্মহীন শিক্ষা-দীক্ষাহীন গ্রাম্য জীবনের অসুস্থ প্রভাবে।

এক পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক নমঃশূদ্র যুবক একটি তেরো বৎসর বয়সের বৈদ্য কুমারীর উপর বলাৎকার করার অপরাধে ধৃত হয়। সে বিবাহিত, স্ত্রী ও ছেলে-পুলে আছে। জেরায় সে বলেছিল, ভদ্রলোকের কুমারী মেয়ের ওপর বলাৎকার করার দুর্নিবার নেশা থেকে সে এ কাজ করেছে। আর একটি পতি-পরিত্যক্তা বধূকে হরণের দায়ে ধৃত এক অহিন্দু বলেছিল, হিন্দু মেয়েরা বেশ সাজ-সজ্জা করে, তাদের শরীর খুব নরম, গায়ের আঘ্রাণও সুন্দর। তাই লোভে পড়ে সে এ কাজ করেছে। দু-জনেরই জেল হয়েছিল। কুসুম নামে এক ব্রাহ্মণ তরুণীকে হরণ, ধর্ষণ ও হত্যার অপরাধে ধৃত এক মালো তার জবান বন্দীতে বলেছিল, কুসুম আমার প্রতিবেশী। বাল্যকাল থেকে আমার ওর ওপর লোভ। কিন্তু ছোটলোক বলে আমার সঙ্গে ওর মা-বাপ ওকে মিশতে দেয়নি। বারো বছর বয়সে ওর বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়ী থেকে ফেরার পর একদিন ওকে দেখে আমি হিতাহিত জ্ঞান হারাই। রায়ের দীঘিতে এক দিন দুপুর বেলা ওকে একলা দেখে, আমি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে পাশের আম বাগানে টেনে নিয়ে যাই এবং প্রেম নিবেদন করি। ও তাতে আমাকে পদাঘাত করে। তখন অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে আমি ওর ওপর বলাৎকার করি। তারপর গলা টিপে ওকে হত্যা করি।

একটি নয় বছরের মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন আটক রাখার অপরাধে দণ্ডিত আর এক ব্যক্তি বলেছিল, খুব ছোট মেয়েরা যৌন ব্যাপারে কতটা পর্যন্ত আগ্রহশীল হতে পারে, তা পরখ করার কৌতূহল বশে আমি ওকে হরণ করি। মেয়েটি তার পীড়নের ফলে গণোরিয়াগ্রস্ত হয়েছিল, এতে অনুমান করি, প্রচলিত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েও দুর্বৃত্ত তার ওপর বলাৎকার করে থাকতে পারে। তারপর ধরা পড়ার ভয়েই হয়ত তাকে লুকিয়ে

রেখেছিল। এর আগে এক বালকের ওপর দুষ্ক্রিয়া করার জন্যে তার তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

অবশ্য যে-সমস্ত ঘটনা ধরা পড়ে, তারই নিদর্শন এগুলো। কিন্তু বেশীর ভাগই যে ধরা পড়ে না, বা পড়লেও সামাজিক রক্ষণশীলতার খাতিরে যে তা নিয়ে কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেন না, এ ত আগেই দেখিয়েছি। যাই হক, অপহৃতাকে ব্যক্তি বিশেষের বা পতিতালয়ের হেফাজতে সরাসরি গছিয়ে দেওয়ার ঘটনা যা ঘটে, তার তুলনায় কিছুদিন বা অনেক দিন কোন গোপন স্থানে আটকে রেখে, দলবদ্ধ ভাবে দুর্বৃত্ততা করার ঘটনাই বেশী ঘটে এবং তারপর অপরাধ গোপনের জন্যেই অপহৃতাদের হয় পতিতালয়ে, নয় অন্য ধর্মাবলম্বীর ঘরে চালান করে দেওয়া হয়। আর মাঝপথে ধরা পড়ে গেলে, অপহৃতারা আসে কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠানে এবং সেখান থেকে বিবাহের নামে আবার চালান হয় অন্যান্য রাজ্যে। অর্থাৎ কোন-না-কোন ভাবে অপহারকদের সঙ্গে পতিতালয়, ধর্মান্তরণ প্রতিষ্ঠান এবং নারী-কল্যাণ আশ্রম সমূহের আড়কাঠিদের যে একটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ-সূত্র রয়েছে, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

এদের যে-কোন এক দলের খপ্পরে পড়লে, কোন মেয়ের আর পরিত্রাণ নেই। গড়াতে গড়াতে তাকে সমাজ-গণ্ডীর বাইরে গিয়েই দাঁড়াতে হবে। এমন ঘটনা অনেক পাওয়া গেছে, যেখানে অপহৃতা মেয়ে উদ্ধার পেয়ে কোন আশ্রমে এলে, আত্মীয়-স্বজনের নির্বন্ধাতিশয্য সত্বেও তাঁরা তাকে আর ফিরে যেতে দেননি। মোটা টাকার বিনিময়ে তাকে অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। কোন ধনী ভদ্রলোকের কুমারী কন্যা অনুচিত সাহচর্যে গর্ভবতী হলে, গোপনে তাকে প্রসব করিয়ে এবং তার সন্তানটি কোন অনাথাশ্রমে গছিয়ে দিয়ে, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে তাঁদের বেশ মোটা টাকাও দেওয়া হয়েছিল। পাঁচ মাস পরে মেয়ে ফেরত নিতে এসে ভদ্রলোক দেখলেন, মেয়ে নেই। এক ভাটিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে প্রচণ্ড হৈ-হট্টগোল ও মামলা-মোকদ্দমা হয়েছিল। কিন্তু এ রকম ঘটনা এত বেশী হয়েছে এবং তার প্রতিকার এত কম হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত হৈ-চৈ কোন কাজে আসেনি। আর অন্য ধর্মাবলম্বীর পরিবার অথবা পতিতালয় থেকে মেয়ে উদ্ধার কি ব্যাপার, তা যাঁরা এই কাজ কখনো করেছেন, তাঁরাই বিশেষ ভাবে জানেন

সব চেয়ে বিপদ হয় ধর্মান্তরিত বা পতিতালয়ে নিপতিত মেয়েকে উদ্ধার করতে গেলে। সাধারণত তারা নিজে থেকেই বলে যে তারা স্বেচ্ছায় এ পথে এসেছে এবং সাবালিকা মেয়ের মুখ থেকে এ কথা বের হওয়ার পর উদ্ধার-কার্য কি রকম কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তা ত সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যে এ কথা আসে সমাজে পুনর্গৃহীতা না হবার ভয়ে, অথবা অপহারকদের উৎপীড়ন ও প্ররোচনার ফলে, কিংবা বিকৃত জীবনের প্রতি আসক্তি বশে, এটা মনে রাখতে হবে। সমাজে পুনর্গৃহীতা না হবার ভয়টা যে আদৌ অমূলক নয়, তা ত এর আগেই দেখিয়েছি। উৎপীড়ন, নির্যাতন ও অবমাননায় বাধ্য হয়ে কি ভাবে মেয়েরা এ কথা বলে, তার নিদর্শনও যে-কোন নারী-হরণের মামলাতেই পাওয়া যাবে প্রচুর পরিমাণে। বিকৃত জীবনের প্রতি আসক্তির ঘটনা অপেক্ষাকৃত কম হলেও, তা-ও যে দুর্লভ নয়, এ কথা বিশেষজ্ঞেরা হয়ত জানেন।

দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। একটি তেইশ বৎসর বয়স্কা মধ্য শিক্ষিতা তরুণীকে উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা হলে, সে জানায় যে তার বর্তমান 'মালিক' অসৎ, অশিক্ষিত ও উৎপীড়ক বটে, কিন্তু তাকে সে ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নয়, যেহেতু ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তার অন্তরে একটা আকর্ষণ আছে এবং সে আকর্ষণটা যৌনাত্মক। ঠিক কি জাতীয় জিনিষ তার আকর্ষণের বস্তু, তা বের করা যায় নি, যেহেতু জেরার মুখে মেয়েটি চটে গিয়ে বলেছিল যে আপন জীবন নিয়ে সে যা-খুসী তাই করবে, ভাগ্যবান ভদ্র লোকদের তাতে যায়-আসে কি? পতিতালয় থেকে উদ্ধার-করা আর একটি মেয়ে কোন আশ্রমে থাকা কালে, তত্রস্থ নেপালী চাকরকে প্রলুব্ধ করে। এ জন্যে ভর্ৎসিত হলে, সে বলে যে দরকার বোধ করলে তাকে যেন প্রতিষ্ঠান-কর্তৃপক্ষ দয়া করে পথ দেখিয়ে দেন। এই মেয়েটিকে কোন বাঙালী ক্ষৌরকারের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। তারপর সে স্বামী-গৃহ থেকে পালিয়ে আবার পতিতালয়ে প্রবেশ করে। আর একটি গৃহ-পালিত মেয়েকে এক মুসলমান মোটর-চালকের আওতা থেকে উদ্ধার কালে সে প্রবল আপত্তি জানায়। তার স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যায় যে ঐ লোকটির সঙ্গে মদ্যপান ও আড্ডা-ইয়ার্কির ভেতর সে যে তৃপ্তি পায়, তা কোন ভদ্রলোক বা শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে প্রাপ্তব্য নয়, কাজেই আর সে ভদ্র-জীবনে ফিরে যেতে চায় না।

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এই শ্রেণীর মেয়েরা সবাই ঠিক অপহৃতা

হয় না। অনেক সময় অপহারককে এরা এমন সুযোগ দেয়, যাতে সে টেনে নিয়ে যেতে ভরসা পায়। অথবা এমন অবস্থা বা আবহাওয়া সৃষ্টি করে। যার ভেতর অপহরণ অনিবার্য ভাবেই ঘটে যায়। হঠাৎ এই সব অন্যায় সংস্রব ও যোগাযোগের পথে ধরা পড়ে গেলে, তখনি মানের দায়ে মেয়েরা বলে যে তারা অপহৃতা হয়েছে। নইলে নির্বিবাদেই তারা সমাজ-জীবন থেকে ইতস্তত পাচার হয়ে যায়। স্বামী-পরিত্যক্তা, বাল্য-বিধবা এবং বয়স্কা কুমারীর ভেতর এ রকম স্বেচ্ছাপহৃতা মেয়েও কিছু কিছু পাওয়া গেছে।

একজন স্বামী-পরিত্যক্তা বলেছিল, স্বামী আমাকে নেয়নি। আমার কি কোন কিছুর লালসা নেই? আমি ইচ্ছা করেই ওকে ধরা দিয়েছি। ওর একটুও কসুর নেই। এক জন বাল্য-বিধবা বলেছিল, বিধবা বলে ত কেউ রেয়াৎ করেনি। যে পেরেছে সেই লুকিয়ে ধর্মহানি করেছে। তাই নিজের ইচ্ছাতেই একদিন মনের মতো লোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছি। একজন বয়স্কা কুমারী বলেছিল, চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে হল না। এদিকে বুড়ো কালেও মা-খুড়ীমার হরদম ছেলে-মেয়ে হতে লাগল। দেখে দেখে নিজের মধ্যে জাগল একটা মাৎলামি। পাড়ার ঐ ছোকরাকে আশে-পাশে ঘোরাফেরা করতে দেখে, শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালালাম। এই তিনটি মেয়েই মধ্য-পথে ধরা পড়ে এবং মামলার অপহারকরা স্বল্প দণ্ড পায় শুধু মেয়েদের এই সব স্বীকারোক্তির দরুণ। এর মধ্যে শেষোক্ত মেয়েটিকে পরে এক শিক্ষিত যুবক স্বেচ্ছায় বিবাহ করেন এবং তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছে। অন্য দুটি মেয়ে অপহারকদের কবল থেকে উদ্ধার হলেও, অধঃপতন থেকে রক্ষা পায়নি। একটি অবৈধ গর্ভ-পাতনের ফলে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। অন্যটি অদ্যাবধি গোপন পাতিত্যেই দিন কাটাচ্ছে।

সুতরাং সমুদয় অপহরণের ঘটনাই যে বদ-পুরুষের দ্বারা সংঘটিত হয় না, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বিপাকে নারী মনস্তত্ত্বের বিকৃতিও যে সময় সময় এই দুর্বিপাক ডেকে আনে, এ আশা করি আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। তবে আগেই বলেছি যে সে-রকম ঘটনা কম ঘটে। তার কারণ সাধারণত এ দেশে মেয়েদের মনে মনে ধর্মত্যাগ, গৃহত্যাগ বা ব্যভিচার সম্বন্ধে একটা সংস্কারগত ভীতি আছে। সেই ভীতিই তাদের ঘরের বাইরে পা বাড়াতে দেয় না। তাছাড়া তারা জানে, এক বার বাইরে গেলে, আর ফেরা যাবে না। তব

ঘটনা-চক্রে যারা বাইরে গিয়ে পড়ে, পুনরুদ্ধার ও পুনর্গ্রহণ বিষয়ে সমাজের সজাগতা ও ঔদার্যের অভাবেই যে তারা আরো কত বেশী নেমে যায়, তা ত ইতিপূর্বের আলোচনাতেই দেখানো হয়েছে।

অপহারকদের সম্পর্কে সব শেষে আর একটা কথা বলার আছে। তারা কারা? সাধারণ ভাবে অনেকে মনে করেন, শুধু অন্য ধর্মাবলম্বী একটি সম্প্রদায়ই বুঝি দলবদ্ধ ভাবে নারী-হরণ করে নিয়ে যায়, বাংলায় সংখ্যাল্প বলে বিবেচিত সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সন্ততি-সংখ্যা আরো কমিয়ে ফেলার অভিপ্রায়ে এবং এটা নেহাৎ সামাজিক অপরাধ নয়, এর পিছনে সূক্ষ্ম একটি রাজনীতিক চক্রান্তও নিহিত আছে। কিন্তু কেবল মাত্র এই কারণেই নারী-হরণ হয় না। নগরে, বন্দরে, বাণিজ্য-কেন্দ্রে যত পেশাদার পতিতা দেখা যায়, তারা সবাই একটি বিশেষ সম্পদায়ের মেয়ে। অন্য সম্প্রদায়ের মেয়ে যে হাজারকরা একটিও নেই এবং এই ভূরি পরিমাণ মেয়ে যে অনেকেই অন্য ধর্মাবলম্বীর দ্বারা অপহৃত হয় না, বেশীর ভাগই স্ব-ধর্মাবলম্বীদের ইতরতা, অসংযম ও অবিবেচনার ফলে সমাজ-বহিষ্কৃতা হয়, এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভিক্ষাবৃত্তির আড়ালে যারা বেশ্যা-বৃত্তি করে, যারা অবৈধ গর্ভ বা গোপন ব্যভিচারের দায়ে সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে পথে এসে দাঁড়ায়, যারা নানা সঙ্ঘ, প্রতিষ্ঠান ও উদ্ধারাশ্রমের হাত দিয়ে বাইরে চালান হয়ে, যায়, তারা বেশীর ভাগই যে স্ব ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা নিগৃহীতা হয়, এ-ও ভুলে গেলে চলবে না।

ভুলে গেলে চলবে না যে প্রতি বৎসর পল্লীগ্রামের এবং সহরের হাজার-হাজার দীন-দুঃখী মেয়েকে অন্ন-বস্ত্রের প্রলোভনে বের করে আনা এবং পতিতা-বৃত্তিতে নিয়োজিত করা হয়। নিরাশ্রয় নাবালিকাদের চুরি করে এনে, মোটা টাকার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হয় স্ব-ধর্মাবলম্বীর দ্বারাই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত দুষ্প্রবৃত্তি, দলবদ্ধ ব্যবসাবুদ্ধি ও রাজনীতিক গোষ্ঠী-স্বার্থ, এই তিনটি কারণই একযোগে সমাজে নারী-হরণের মতো ভয়াবহ অপরাধকে দিনের পর দিন জীইয়ে রেখেছে। আর নারীর অশিক্ষা, পরমুখোপেক্ষিতা, আর্থিক স্বাধিকারের ও আত্ম-চেতনার অভাব এই পাপের পোষকতা করে চলেছে।

এর প্রতিকারে চাই সুশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও সমাজ-চেতনার সামগ্রিক বিকিরণ। সর্বোপরি চাই, সমাজে আত্ম-রক্ষার উপযোগী শক্তি ও সঙ্ঘবদ্ধতা

বৃদ্ধি পাওয়া। তা ভিন্ন এ উৎপাত কোনদিন দূর হবে না। এই সঙ্গেই নারীর মধ্যে চাই অধিকতর ব্যক্তিত্ব-বোধ জাগ্রত হওয়া। তাঁরা যদি আত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন, মানবিক অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার মতো সংহতি ও সামর্থ্য অর্জন করেন, পণ্যদ্রব্য বা ক্রীড়নকের মতো বামাচারীদের হাতে যথেচ্ছ নিগৃহীত না হবার জন্যে যদি ব্যাপক প্রস্তুতি সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে এ গ্লানিকর নারী-হরণের ইতিহাস এক দিন অতীতের বিষয় হবে, যেমন হয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে।

উনবিংশ অধ্যায়

ব্যভিচারের মনস্তত্ত্ব

বিশেষজ্ঞ মহলে মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে, পুরুষ কি এক নারীতে তৃপ্ত? প্রশ্নটা তোলার মতো, তাতে আর সন্দেহ নেই। মানুষের সভ্যতা দাবি করেছে, পুরুষ যে নারীকে গ্রহণ করবে, তাকে সর্বজন সমক্ষে বৈধ পত্নী রূপে গ্রহণ করবে এবং অকপট প্রেম ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাকে নিয়ে সংসার করবে, তা হতে পুত্র-কন্যা-লাভ করবে। কিন্তু চিরদিন দেখা গেছে, সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক অনুশাসন লঙ্ঘন করে পুরুষ কুমারী, সধবা, বিধবা, সব রকম পর নারীর সঙ্গ করেছে, উপ-পত্নী রেখেছে, পতিতালয়ে গেছে। যে-কোন দেশে যে-কোন সমাজে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ভদ্র-অভদ্র, সর্বস্তরের পুরুষের এই বহুগামিতার অভ্যাস এই প্রবল যে একে কোন দেশ, সময় বা সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব বলে চিহ্নিত করা যায় না। জিনিষটাকে প্রায় সার্বজনীন ও সার্বভৌম বলে মেনে নিতে হয়। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, পুরুষ কি তাহলে এক নারীতে তৃপ্ত নয়? তার মনোধর্মের স্বাভাবিক প্রবণতাই কি বহুগামিতার অভিমুখে?

এই প্রশ্নের সমাধান করতে হলে, একেবারে সমস্যার মূলে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। পারিবারিক জীবনের শান্তি ও শালীনতা এবং পুত্র-কন্যার বৈজিক বিশুদ্ধি রক্ষার প্রয়োজনে সমাজকে নারীর কাছে কামগত একনিষ্ঠতা দাবী করতে হয়েছে। স্বভাবতই পুরুষকেও যদৃচ্ছ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সুযোগ বা স্বাধীনতা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পুরুষকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত না করলে নারীর একনিষ্ঠতা রক্ষা ত সম্ভব নয়। তাই পুরুষকেও সমস্ত সভ্য দেশের সমাজ-ব্যবস্থায় একনিষ্ঠ হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তথাকথিত রক্ত-কৌলীন্যের অহঙ্কার এবং যৌন-সম্পর্কের একাধিকার কামনাই প্রথম মানুষকে নারীর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সজাগ করেছে। তারপর আপন পরিবারস্থ নারীদের সম্পর্কীয় অনাক্রমণের বোধই তাকে অন্যের পরিবার-ভুক্ত নারীদের সম্পর্কেও অনুরূপ নীতি মেনে নিতে বাধ্য করেছে। এই ভাবেই মানুষের সমাজে বিবাহ এসেছে এবং কেউ কারু বিবাহিত জীবনের সম্ভ্রম, শালীনতা বা স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ না করাটা বৈধ বলে গ্রাহ্য করেছে। এটা মানাতে

দেয়নি হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রথমে পর্যাপ্ত মারামারি কাটাকাটি চলেছে, তারপর মানুষের সমাজ-চেতনা যখন বেশ কিছুটা পরিস্ফুট হয়েছে, তখন কতক গুলি বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত করেই ব্যাপারটা সম্ভব করে তোলা হয়েছে। এসেছে নারীর 'সতীত্ব' সম্বন্ধে সংস্কার এবং পুরুষের সেই সতীত্ব হরণ বা লঙ্ঘন না-করা সম্বন্ধে নৈতিক কর্তব্যবুদ্ধি।

কিন্তু কালক্রমে একনিষ্ঠতা রক্ষার দায়টা শুধু নারীর ওপর গিয়ে পড়েছে। কেননা সমাজ-পতি পুরুষ তাকে রকমারি কৌশলে এটা মানতে বাধ্য করেছে। নারীকে যতদিনই কৌমার্য পালন করতে হক, কুমারী-জীবনের পবিত্রতা তাকে রক্ষা করতে হবে। বিবাহিতা হলে, বিবাহিত স্বামীর একাধিকার তাকে অকপট বশ্যতায় মেনে নিতে হবে। আর বিধবা হলে অটুট ব্রহ্মচর্যে তার মতি অচলা রাখতে হবে। এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হলে, তাকে বলা হবে অসতী। প্রচলিত সমাজের খাতা থেকে সঙ্গে সঙ্গে তার নাম কেটে দেওয়া হবে। তখন হয় তীর্থস্থানে গিয়ে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ, নয় পতিতা-বৃত্তি গ্রহণ করে অধঃপাতে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া আর তার গত্যন্তর নেই। উন্নততর দৈহিক শক্তি ও মননশীলতা সম্পন্ন পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নারী এঁটে উঠতে পারেনি। তার ফলেই আদিম সমাজের সর্বময় কর্তৃত্ব হারিয়ে নারী একদিন পুরুষের অধীন হতে বাধ্য হয়েছে। এই অধীনতার অনগ্রসর অন্ধকারে শতাব্দীর পর শতাব্দী পাড়ি দিতে দিতে নারী তার ব্যক্তিত্ব হারিয়েছে। সতীত্বকে তাই সে একটা নির্বিশেষ আদর্শ বলে বুঝেছে এবং তার স্খলন ও পতন থেকে আত্ম-রক্ষা করতে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে। নারীর পর্দানশীনতাব মূল এই খানে।

পক্ষান্তরে পুরুষ আপন গৃহ-পরিবারে নারীর নৈতিক শুচিতা ও দৈহিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবীটা যত জোর গলাতেই প্রচার করুক, নিজের দিক থেকে কিন্তু নিষ্ঠা ও শুচিতার জন্যে তার অণুমাত্র গরজ দেখা যায়নি কোন দিন। এক পত্নী বিদ্যমানেই সে আর একটি বা একাধিক বিবাহ করে এনেছে। প্রকাশ্যে বা গোপনে রক্ষিতা রেখেছে। নির্বিচারে পতিতালয়ে গেছে। তাছাড়া রকমারি অযৌক্তিক অজুহাতে সে পর-নারী গমনকে সামাজিক অধিকার রূপে ভোগ করেছে। গুরুপ্রসাদী, রাজাপ্রসাদী থেকে সুরু করে, গৌরী-গ্রহণ, কিশোরী-ভজন, বামাচার-সিদ্ধি, কারুণী, কুমারী বা দেবদাসী গমন পযন্ত, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক নানা অনুষ্ঠানে সে যৌন-যথেচ্ছারের একশেষ

করছে। বাই, খেমটা, তরজা ও ঢপ জাতীয় প্রমোদের নামে প্রকাশ্যে ব্যবসায়ী স্ত্রী-লোক নিয়ে মাতামাতি করেছে। নারীর অর্থনীতিক পরাধীনতা ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বোধের অভাবই যে এ-সব অনাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছে এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপ্তি ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে এটা ধীরে ধীরে কমে আসছে, এতে আর সন্দেহ নেই। আজ বহু বিবাহ বা উপ-পত্নী রাখার রেওয়াজ নেই। গুরুপ্রসাদী ইত্যাদি প্রায় উঠে গেছে। বাই-খেমটার অনুষ্ঠানও বিগত ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত হতে চলেছে।

কিন্তু তবু পুরুষের বহুগামিতার অভ্যাসে এখনো ভাঁটা পড়েনি। তার প্রবাহ সমানই রয়েছে। বাজার-বেশ্যা থেকে গুপ্ত বেশ্যা পর্যন্ত, নাইট-ক্লাবের সভ্যা থেকে খুচরা মজুরীর সাময়িক সঙ্গিনী পর্যন্ত, সবই জন্মেছে তার এই গোপন বহুগামিতার খোরাক হিসাবে। দরিদ্র ঘরের মেয়ে ও বউকে অর্থের বিনিময়ে প্রলুব্ধ করে, বা অবিবাহিতা ও উপার্জনকামী তরুণীকে 'কেরিয়ার' ধরিয়ে দেবার নাম করে কি ভাবে লম্পট পুরুষরা শিকার ধরে, তার কথা ত আগেই বলেছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমষ্টিগত ভাবে পুরুষের যৌন বিষয়ক একাত্মতা সেদিনও ছিল না, আজও নেই। সেদিন যেটা ছিল খোলাখুলি, আজ তা হয়েছে পর্দা-ঢাকা, এই টুকু যা তফাৎ এবং এই তফাৎটা এসেছে নারীর মধ্যে শিক্ষার ব্যাপ্তি ও ব্যক্তিত্ব বিস্তারের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

অর্থাৎ পুরুষ যে এক নারীতে তৃপ্ত নয়, এ কথা অনেকটা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। কিন্তু কি এর কারণ? অর্থনীতিক প্রভুত্ব ষোল-আনা পুরুষের করতল গত বলেই কি যদৃচ্ছ আত্ম-তৃপ্তির অবাধ স্বাধীনতা পুরুষ সমাজ চিরদিন ভোগ করে যাচ্ছে? অথবা এ তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা? বিতর্কের বিষয় সন্দেহ নেই। বিশেষজ্ঞ সমাজের সঙ্গে এ বিষয়ে সবাই একমত হবেন আশা করি যে সৃষ্টি-রাজ্যে পুরুষ অসীম প্রাণ-শক্তির অধিকারী। জ্ঞানে, কর্মে, শৌর্যে-বীর্যে তার এই প্রাণ-শক্তি যতটা, যৌন ব্যাপারেও হয় ঠিক ততটাই, বা তার চেয়ে বেশী। কাম-জীবনে তার এক-কেন্দ্রিকতা না থাকার এটাই সম্ভবত প্রধান কারণ। তাছাড়া নারীর যৌন-বৃত্তি মূলত অপত্যানুগামী। অপত্য-বিধানের অনিবার্য ধর্মই তাকে যথাশক্তি এক-কেন্দ্রিক হতে বাধ্য করে। পুরুষের প্রবণতা ঠিক এর বিপরীত বলে, বিবাহিত জীবনের বাধ্যতামূলক একনিষ্ঠতাকে সে বাইরে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তা

এড়িয়ে যাবারই আকাঙ্ক্ষা থাকে তার। যার সুযোগ-সুবিধা আছে, সে সহজেই এড়িয়ে যায়। যার নেই, সে-ও সুযোগ সৃষ্টি করে নেবার জন্যে পদে-পদে ফিকির খোঁজে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে সমাজের অর্থনীতিক তথা সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব তার করতলগত বলে, এ দাবী সে সজোরে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এবং নিজের জন্যে কোন জবাব-দিহির রাস্তা খোলা রাখেনি। অবস্থা-বিপাকে কেউ-কেউ বা অনেকে প্রত্যক্ষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। কিন্তু পুরুষ-মনস্তত্ত্বের স্বরূপ যে মোটামুটি এই, তাতে আর সন্দেহ নেই।

কিন্তু পুরুষের এই স্বভাবসিদ্ধ বহুগামিতার কারণ ও স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা যা বলেছেন, সেখানেই এ প্রসঙ্গের শেষ নয়। এরপরও প্রশ্ন আছে এবং সে প্রশ্ন ঠিক এর প্রতীপ। অর্থাৎ নারী কি স্বভাবতই একনিষ্ঠ বা এক পুরুষে তৃপ্ত? আমি জানি, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া মাত্র মহিলা-সমাজ বিচলিত হবেন এবং হৈ-হৈ করে প্রতিবাদ করতে আসবেন। কিন্তু প্রশ্নটা আমি তুলেছি একেবারে মূলগত সমস্যার দিকে চোখ রেখে। কাজেই পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করব না। আমি আগেই বলেছি যে পুরুষকে যৌন-সম্পর্কের পরিণাম হিসাবে যে দায়িত্ব বহন করতে হয়, তা তার ওপর সমাজ কর্তৃক আরোপিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এ জন্যে নারীর যে দায়িত্ব, তা গোড়া থেকে প্রকৃতি-নির্দিষ্ট। কাজেই পুরুষ ইচ্ছা করলে যা অনায়াসে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে, নারীকে তারি ভার বইতে হয় অপ্রতিবাদে ও অবনত মস্তকে। এ অবস্থায় যৌন ব্যাপারে উভয়ের দৃষ্টি-ভঙ্গী অনিবার্য ভাবেই ভিন্নমুখী হয়ে পড়েছে। গর্ভধারণ জনিত পরনির্ভরশীলতার জন্যেই নারী পুরুষের অনুগত্য স্বীকার করেছে এবং পুরুষ সেই সুযোগে তার ওপর সর্বাঙ্গীণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। এরি প্রধান অস্ত্র হিসাবে নারীর ওপর আরোপিত হয়েছে সতীত্বের, তথা পুত্র-কন্যার বৈজিক বিশুদ্ধি রক্ষার সংস্কার। আর এই সংস্কারের গণ্ডীটা যাতে অনতিক্রমণীয় হয়, তারি জন্যে এর সঙ্গে পাপ-পুণ্যের ও ধর্মাধর্মের বোধটি সংযোজিত হয়েছে।

সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর যে-স্থান এত কাল নির্ধারিত ছিল, তাতে তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা আত্ম-চেতনা পরিস্ফুট হবার সুযোগ ছিল না এক ফোঁটাও। তার ফলে নারী পুরুষের দ্বারা ব্যবস্থিত এই সব বিধি-বিধান অকপট বশ্যতায় মেনে নিয়েছে। বহু শতাব্দী ধরে মানতে মানতে এটা তার এমনি স্বভাবে

পরিণত হয়ে গেছে যে বুঝে হক, না বুঝে হক, আজ পর্যন্ত নারী এর বন্ধন এড়াতে সাহস পায় না। সতীত্বের ভয় তার জীবনে সব চেয়ে বড় ভয়। কিন্তু প্রশ্ন, বাইরের এই বিধি-ব্যবস্থাকে নারী যে কার্য-কারণ বশেই মেনে নিক, মনও তার এটা মেনে নিয়েছে কি? অর্থাৎ তার মনোধর্ম কি এরি অনুকূল? আমি জানি, নারী-সমাজ এক-বাক্যে বলবেন, হ্যাঁ। কারণ এর বিরোধী উক্তি যে সতী-নারীর পক্ষে মস্ত ধিক্কারের কথা!

কিন্তু সংস্কার-মুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যাঁরা বিষয়টির বিচার করবেন, তাঁরা নিশ্চয় এ জায়গায় থেমে থাকতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে, অন্তঃপুরিক অনাচার, ব্যভিচার, পাতিত্য প্রভৃতিতে যে সমস্ত নারী লিপ্ত হয়, তারা সমাজেরই মেয়ে। কোন-না-কোন বাস্তব কারণে হয় তারা সমাজ-জীবনের গণ্ডী থেকে বাইরে ছিটকে পড়ে, নয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকেই লোক-মতকে ফাঁকি দিয়ে অ-কাজ কু-কাজ করে। কোথা থেকে আসে তাদের এই একনিষ্ঠতা-বিরোধী মনোভাব? কেন আসে? এ কথা ঠিক যে বয়স্কা কুমারী ও যুবতী বিধবাদের এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের বর্ষীয়ান স্বামীর তরুণী পত্নীদেরই পদস্খলনটা হয় একটু বেশী মাত্রায় এবং তা হয় প্রত্যাশিত কারণেই। কিন্তু পদস্খলনের গণ্ডী যে কেবলমাত্র এই টুকুতে সীমাবদ্ধ নয়, তা আশা করি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের অজানা নেই। যোগ্য বয়সে উপযুক্ত স্বামীর সঙ্গে বিবাহিতা ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত কাম-জীবনে প্রতিষ্ঠিতা মহিলাদের পদস্খলনের দৃষ্টান্ত এ পর্যন্ত প্রচুর পেয়েছি এবং দৃশ্যত সেই স্খলনের কোন কারণ খুঁজে পাইনি। কাজেই এ কথা না ভেবে পারি না যে এই বহুগামিতার প্রবৃত্তি তাঁদের স্বভাবের মধ্যেই সুপ্ত আছে। বেশীর ভাগ ব্যভিচারের ইতিহাসই যে আসল বিচিত্র কামরুচি চরিতার্থ করার ইতিহাস, এটা বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

এই ব্যভিচারের সূত্র ধরেই আমি বলতে চাই যে নারীর যৌন-প্রকৃতিও আসলে বহুগামী। সমাজব্যবস্থার কঠিন আইন-কানুন ও পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত সতীত্বের সংস্কার তাকে এই জন্মগত প্রবণতা পদে পদে নিয়ন্ত্রিত করে চলতে বাধ্য করে। অথবা ছলনা ও আত্ম-গুপ্তির পথে আত্ম-তৃপ্তি সন্ধান করতে প্রণোদিত করে। সামাজিক দিক থেকে একনিষ্ঠতার ব্যতিক্রম নারীর পক্ষে কত বড় অপরাধ এবং সে অপরাধ কতখানি দণ্ডার্হ, তা ত সবাই জানেন। কাজেই সতীত্ব নামক সংস্কারটি যে অনেকটা বাইরে থেকে আরোপিত এবং তা যে

নারীর সহজাত ধর্ম নয়, এমন কথা বললে হয়ত খুব ভুল বলা হয় না। অবশ্য এ কথা হয়ত কেউ-কেউ যুক্তি হিসাবে বলবেন যে মাতৃত্বের সংস্কার নারীর যৌন-প্রকৃতিতে এমন গভীর ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে যে স্বভাবিক অনুপ্রেরণাতেই নারী এক-কেন্দ্রিক হতে বাধ্য। কথাটা মোটামুটি সত্য, তবে সন্তানবতী নারীকেও যে হারে সমাজ-শাসন ফাঁকি দিয়ে ব্যভিচার করতে দেখা গেছে, তাতে মাতৃত্বের অনুপ্রেরণা বড় জিনিষ হলেও ঠিক কত বড, তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু সে তর্ক থাক। ব্যভিচারের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে আমরা শুধু দেখাতে চাই যে নারীও মনে-মনে পুরুষের মতো বহুগামী এবং এই বহুগামিতার মনোভাব তার বাস্তবে মূর্ত হয় অনুকূল সুযোগ-সুবিধা মিললে, নইলে এটা তাকে ভেতরে-ভেতরে অবদমিত করেই চলতে হয়।

এখানে বলে রাখা দরকার যে এ দেশে বহিরঙ্গিক কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকার এত কাল অনুমোদিত ছিল না। তাকে অন্তঃপুরে পর্দানশীন হয়ে থাকতে হত। বাইরের পুরুষদের সঙ্গে মেশার বা প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ তাই তার ছিল না। পারিবারিক জীবনের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে আত্মীয়-চক্রেব সঙ্গে গোপন ব্যভিচার ও অনাচারের ব্যাপারই তাই সেদিন ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত হত। দেবর, ভগ্নীপতি, নন্দাই প্রভৃতি ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্কের সঙ্গে কতকটা পর্যন্ত বন্ধু ভাবে মেশার সুযোগ সমাজ নারীকে দিয়েছে। তাই এই সব সম্পর্কের সঙ্গে সাধারণত অনুচিত সংসর্গ অধিক পরিমাণে হতে দেখা গেছে। কিন্তু ব্যভিচারের ইতিহাসে লঘু-গুরু এমন সম্পর্ক খুব কম আছে, যার গণ্ডী নর-নারীকে অতিক্রম করতে না দেখা গেছে। শ্বশুর, মামা-শ্বশুর, ভাসুর, খুড়ো, জ্যেঠা, মামা প্রভৃতির সঙ্গে পদস্খলিত হওয়া নারীর খবর আশা করি অল্প-বিস্তর সবাই রাখেন। খুড়তুত ও মামাতুত-পিসতুত ভাইদের, বা এই শ্রেণীর বোনের স্বামীদের সঙ্গে ব্যভিচারের ব্যাপ্তি যে কতটা, সে ত আর বলারই নয়। এমন কি, অধিকতর দুরতিক্রম্য সম্পর্ক লঙ্ঘনের নজীরও ব্যভিচারের ইতিহাসে দুর্লভ নয়।

এ সব ক্ষেত্রে প্রথম প্ররোচিত কে করে, পুরুষ না নারী, সে প্রশ্ন হয়ত অসমীচীন নয়। ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে দেখেছি, যেখানে পুরুষ অধিক বয়স্ক, সেখানে প্ররোচনা সে-ই প্রথম দেয়। আর সহযোগী পুরুষের বয়স যেখানে কম, সেখানে প্রথম প্ররোচিকা হয় নারী। প্রমাণার্থে কয়েকটা বাস্তব কাহিনী এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে। একটি সতেরো বৎসর বয়স্ক বালক

তার প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়স্কা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃ-বধূর সঙ্গে পাপে লিপ্ত হয়। তার স্বীকারোক্তিতে দেখা যায় যে ঐ মহিলা বালকটির ক্রম-বর্ধিত বয়সের প্রতি দৃকপাত না করে, সময়-সময় তার সামনে স্নান বা বেশ পরিবর্তনের অজুহাতে বে-আব্রু হতেন। বালকটি প্রথম-প্রথম ভয় পেত। কিন্তু ক্রমশ এ সম্পর্কে তার তীব্র একটি কৌতূহল জাগতে লাগল। মহিলাটি তা টের পেলেন এবং ফিকিরের সাহায্যে তিনি তাকে অন্যায়ের পথে আকর্ষণ করলেন। এই অন্যায়ের পরিণাম শেষ পর্যন্ত বিষময় হয়। মহিলার স্বামী জানতে পেরে ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যান, বালকটিও আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করে ফেলে। বালকটি শেষ চিঠিতে সবিস্তারে সব ইতিহাস ব্যক্ত করে, তার আত্মীয়-স্বজনকে জানিয়ে গেছে যে এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

আর একটি ঈষৎ বোকা ধরণের আঠারে-উনিশ বছর বয়স্ক ছেলের স্বীকারোক্তিতে দেখেছি, এক গুরুজন স্থানীয়া মহিলা তার নির্বুদ্ধিতার সুযোগে তাকে ধীরে ধীরে অনাচারে অভ্যস্ত করেন। কিন্তু তার বুদ্ধির রাজ্যে আগে যে জড়তাটুকু ছিল, এই ব্যাপারের পর থেকে তা ক্রমশ অপসারিত হয়ে যায় এবং সে কৃত-কর্মের কদর্যতা বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয় এবং সরে পড়তে চায়। কিন্তু এই সুশ্রী স্বাস্থ্যবান যুবককে ঐ প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স্কা মহিলা নানা ছলা-কলায় দিনের পর দিন আটকে রাখেন। অবশেষে যুবকটি তার স্বামীকে একখানি চিঠিতে সব কথা অকপটে জানিয়ে দিয়ে, একদিন বাড়ী ছেড়ে পালায়। আর একটি বিমাতৃ-শাসনে জর্জরিত সতেরো বৎসর বয়স্ক বালকের জবান বন্দীও প্রায় অনুরূপ। বিমাতা তার নামে প্রত্যহ রকমারি মিথ্যা অভিযোগ করতেন। তার ফলে তাকে মাঝে মাঝে নির্মম প্রহার সহ্য করতে হত পিতার হাতে। একদিন মধ্যাহ্নে বালকটি বিমাতাকে তাঁর এই মিথ্যাভাষণের কারণ সম্বন্ধে অকপটে কয়েকটি প্রশ্ন করে। তখন তিনি বলেন যে সে যদি তাঁর সমস্ত আদেশ অপ্রতিবাদে পালন করে এবং কারো কাছে কিছু প্রকাশ না করে, তাহলে তিনি তাকে আর কখনো মার খাওয়াবেন না। প্রহার-ভীত বালক স্বীকৃত হল। সেখান থেকে সুরু হল অন্যায়, যার পরিণামে মহিলাটি স্বামী কর্তৃক বিতাড়িত হলেন এবং ঐ স্বপত্নী-পুত্রের সঙ্গেই অতঃপর দিন কাটাতে লাগলেন।

কোন বিখ্যাত অধ্যাপকের একটি স্বীকারোক্তি আমার শোনায় অবকাশ হয়েছিল। তিনি যখন পনেরো বছর বয়স্ক, সেই সময় তাঁর একুশ-বাইশ

বৎসর বয়স্কা এক মাতুলানী একটি ফাউণ্টেন পেন দিয়ে প্রলুব্ধ করে, তাঁকে একদিন অন্যায়াচারে প্রবৃত্ত করেন। প্রায় বিশ বছর পরে মাতুলানী ঐ ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে, তাঁর কাছে আবার প্রস্তাব করেন। এবার কিন্তু ক্রোধ ও ঘৃণার সঙ্গে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অধুনা অভিনেতা রূপে পরিচিত এক ভদ্রলোক তাঁর একটি আত্মীয়ার কথা বলেন। ঐ মহিলাটি বাল্যকালে তাঁর খেলার সাথী ছিলেন। তাঁর বয়স যখন বারো, ভদ্রলোকটির আট-নয়, তখন তিনি তাঁকে ক্রীড়াত্মক অনাচরণে প্রবর্তিত করেন। পনেরো বছরে তাঁর বিবাহ হয় এবং দশ-বারো বছর তাঁদের দেখা-শোনা বন্ধ থাকে। তারপর আবার দেখা-সাক্ষাৎ হয় এবং পূর্ব সম্পর্কের সূত্র ধরে মহিলাটি তাঁকে আবার পাপে প্রলুব্ধ করেন। দীর্ঘ সাত-আট বৎসর এটা তলায়-তলায় চলে। অবশেষে ভদ্রলোক বিবাহ করে অন্যদিকে মনোযোগ সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তখনো মাঝে-মাঝে দেখা হলে অনাচরণ চলত।

এই কয়েকটি ঘটনায় দেখা গেল, বিবাহিতা, সন্তানবতী ও সহজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত মহিলারা নিছক বৈচিত্র্যের লোভেই কোন না-কোন অল্পবয়স্ক আত্মীয়কে প্রলুব্ধ ও কু-ক্রিয়ায় নিয়োজিত করেছেন। অবশ্য এর উল্টোটাও দেখা গেছে। বয়স্ক আত্মীয় অল্পবয়স্কা আত্মীয়াকে ছলে-বলে আকর্ষণ করে নিয়েছেন, এমন ঘটনাও ঢের পাওয়া গেছে। ঘরোয়া ভাবে অল্প-স্বল্প চিকিৎসা করেন, এমন এক বষীয়ান ভদ্রলোক নিকটাত্মীয়া কোন বিবাহিতা তরুণীর জরায়ু-ঘটিত পীড়ার চিকিৎসা সূত্রে নির্জন ঘরে তার দেহ পরীক্ষা করেন। মেয়েটি একটু বোকা ধরণের থাকায় প্রথমটা বুঝতে পারে নি। ভদ্রলোক কিন্তু এই সুযোগে তার সঙ্গে দেহ-সম্পর্ক করেন। মেয়েটি যখন বুঝল, তখন লজ্জার দায়ে কারু কাছে তা প্রকাশ করতে পারল না। এ দিকে চিকিৎসার নামে রোজ এটা চলতে লাগল। অবশেষে স্বামীর কাছে পালিয়ে গিয়ে সে অব্যাহতি পেল। মেয়েটি তার স্বীকারোক্তিতে বলে যে ব্যাপারটা সম্বন্ধে তার যতটা লজ্জা এবং ভয় হত, অপছন্দ ঠিত ততটা হত না এবং পিত্রালয় থেকে চলে যাবার পরও দু-এক দিন সে অন্তরে-অন্তরে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি কামনা করত।

আর একটি বিবাহিতা তরুণীকে তাঁর অতি-আত্মীয় এক রেলওয়ে গার্ড একবার আপন কামরায় নিয়ে পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পথে তিনি তাঁর কাছে কু প্রস্তাব করেন এবং মহিলাটি প্রথমে অসম্মত হলেও,

পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ির ফলে শেষ পর্যন্ত সম্মত হন। তখন সম্পর্কের ব্যবধান ভুলে, উভয়ে কু-কার্যে নিরত হন এবং তখন থেকে উভয়ের এই গোপন সম্পর্ক দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। মহিলাটি তাঁর কোন বান্ধবীকে অকপটে বলেন যে কাজটা অন্যায় তা তিনি বুঝেছিলেন, কিন্তু এর আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারেন নি! আর একটি যুবতী তাঁর স্বামীর পীড়ার সময় কুমারী বয়সের অভিভাবক জনৈক বিশেষ গুরু-জনকে তাঁর বাড়ী এসে থাকতে অনুরোধ করেন। এক রাত্রে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, উদ্বেগ আর দুর্ভাবনায় তাঁর ঘুম আসছে না, এমন সময় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ঐ ভদ্রলোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। মহিলা প্রথমটা ইতস্তত করেছিলেন, কিন্তু আত্ম-সম্বরণ করতে পারলেন না। এর পর এটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়াল। শেষকালে স্বামীর মৃত্যুর পর তরুণীটি তীর্থবাসের নাম করে ঐ আত্মীয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক পাতিয়ে বসবাস করতে লাগলেন।

পুরুষের দ্বারা প্রথম প্ররোচনার দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা অনাবশ্যক এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য যে পুরুষ প্রথম প্ররোচনা দিলেও, এই শ্রেণীর অপরাধে নারীর নিজেরও তীব্র একটা আসক্তি থাকে। অন্তঃপুরিক ব্যভিচারের পাপ তাই অনায়াসে তার দ্বারা অনুমোদিত হয়। কদাচিৎ হৈ-চৈ ও কুৎসা-কলঙ্ক বা আত্ম-হত্যার ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কিন্তু সাধারণত এটা সম্মতি-সূচক ব্যাপার রূপে চলে। কারণ সমাজ-ব্যবস্থার চাপ যাই দাবী করুক, অব-চেতনায় নারীর কামনাও পুরুষের মতো বহুমুখী ও বৈচিত্র্যকামী।

একটু আধুনিক ভাবাপন্ন ঘরে, বিশেষত সহুরে সমাজে নারীর পর্দান-শীনতা আজ-কাল অনেকটা কমেছে, ফলে পারিবারিক অনাচারের পরিমাণও কমেছে। কিন্তু তার স্থানে এসেছে প্রাইভেট টিউটর, সঙ্গীত-শিক্ষক, স্বামীর বন্ধু, ভাইয়ের বন্ধু, কলেজের সহপাঠী, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক জগতের সহকর্মী প্রভৃতির সঙ্গে ব্যভিচার। সহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে ইদানীং এই শ্রেণীর অন্যায়ের পরিমাণ যে কত বেড়েছে এবং নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার নামে এই সব কদাচার যে কত সহজে সমাজের নাকের ওপর অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, ইতিপূর্বের কয়েকটি অধ্যায়ে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছি। এমন কি. সহুরে নিম্ন-মধ্যবিত্ত অর্থাৎ গরীব ঘরের মেয়েদের বিশ্বস্ত জবান বন্দী থেকেও এটা বোঝার অবকাশ হয়েছে যে সুযোগ-সুবিধা

মতো অনুচিত সংসর্গে লিপ্ত হয়ে, সাময়িক বৈচিত্র্য কামনা চরিতার্থ করতে তাঁরাও কার্পণ্য করেন না।

স্বামী অফিস গেলে একটি শিশু-পুত্র নিয়ে একা সারাদিন বাসায় থাকতেন, এমন একটি তরুণী বধূ এক চুড়ি ওয়ালাকে ডাকেন চুড়ি পরার জন্যে। লোকটি ভেতরে এসে বসলে, তার আকৃতির বলিষ্ঠতা দেখে সহসা তাঁর দারুণ ভাবান্তর হয়। লোক া আগে একটু থতমত খেয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সুযোগের অপব্যবহার করল না। তাকে আবার আসতে বলেছিলেন তিনি। কিন্তু সে আর ও রাস্তা মাড়ায় নি। আর একটি তরুণী গৃহস্থ বধূ একদিন বাথরুমে গা ধুচ্ছেন এমন সময় দেখলেন, বিশ বৎসর বয়স্ক হিন্দুস্থানী ভৃত্য ভাঙা সার্সির ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ তাঁর চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে গেল, তিনি ইসারায় তাকে ভেতরে ডেকে নিলেন। ঐ ভৃত্য অনেক দিন এই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর আর একটি বালককে তার স্থানে রেখে সে দেশে চলে যায়। দ্বিতীয় বালকটিও পরে একই কার্যে নিয়োজিত হয় বলে জেনেছি। আর একটি বধূ রাস্তা থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক অনুসরণ-নিরত যুবককে ডাকিয়ে এনে, তার হাতে আত্ম-দান করেন। তারপর ব্যাপারটা অপরাপর ভাড়াটে মহলে জানাজানি হয়ে যেতে, আত্ম-হত্যা করে তিনি আপন মান রক্ষা করেন।

বাবুর্চি, খানসামা, ড্রাইভার, মালী, আর্দালী, পাচক জল-ভারী চাকর, পরিবার-ভুক্ত রকমারি পোষা-পুরুষের সঙ্গে গোপন ব্যভিচার ধনী-দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত-সাধারণ নির্বিশেষে সকল স্তরের সহুরে সমাজে কি হাবে চলে, তা আশা করি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মোটামুটি জানেন। কুমারী ও বিধবাদের মতো বিবাহিতা এবং সহজ জীবনে প্রতিষ্ঠিতা মহিলাদেরও অনেককে এই কর্মে লিপ্ত হতে দেখে, এ কথা কে অস্বীকার করবেন যে এব বীজ নারীব অন্তরে নিহিত নেই? এই শ্রেণীর নিম্নাভিমুখী ব্যভিচারের একটা সাধারণ মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করা গেছে, যার কথা হয়ত এখানে অনুল্লেখযোগ্য নয়। নারীরা ভদ্রলোকের কাছে আপন গৌরব ক্ষুণ্ণ করতে চান না, কারণ তাতে অসম্মানের ভয় আছে। কিন্তু অন্ত্যজ বরাবর নীচুতে অবস্থিত। সে কিছু প্রকাশও করতে পারবে না, কোন অমার্যাদাও ঘটাতে সাহস পাবে না। সুতরাং তাকে আয়ত্ত করলে বদ-খেয়ালও চরিতার্থ হয়, আবার গৌরবও রক্ষা পায়। তাছাড়া এই শ্রেণীর সহযোগী যোগাড হলে, তাকে দিয়ে এমন কোন কদাচার

হীনাচার নেই, যা অনায়াসে না করিয়ে নেওয়া যায়। পক্ষান্তরে ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে পুরুষই নেয় সব ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা, আর নারীকে করতে হয় নীরবে তার খেয়াল-খুসীর আনুগত্য। সুতরাং এ দিক থেকেও তথাকথিত 'ছোট' লোকই অধিকতর কাম্য।

তবে কি সতী বা একনিষ্ঠা নারী নেই? সবাই কি বহুনিষ্ঠা, অর্থাৎ ব্যভিচারিণী? বলাই বাহুল্য আমি এ কথা বলিনি, বা এ রকম আশঙ্কা উদ্রিক্ত হতে পারে, এমন কোন প্রসঙ্গও উল্লেখ করিনি। নারীর ব্যভিচার ও বহুগামিতার ঘটনা যদিও প্রচুর ঘটে, তবু দেশের সামগ্রিক নারী-সংখ্যার তুলনায় ব্যভিচারিণীর সংখ্যা নগণ্য। বেশীর ভাগ নারীই সমাজ-শাসন নত-শিরে মেনে নেন এবং বিবাহিতা হলে একনিষ্ঠতা এবং কুমারী বা বিধবা হলে শুচিতা রক্ষা করে চলেন। কিন্তু দেহের অন্তরালবর্তী মনের খবরটাও যদি নিই আমরা, অর্থাৎ বাইরের ব্যবস্থা ও বিধি- বিধানের চাপ যে পথেই চালাক মানুষকে, তার মন কি চায়, কোন পথে আত্ম-তৃপ্তি খোঁজে, সে বিচারে প্রবৃত্ত হই যদি, তাহলে দেখব, মনে-মনে নারীও পুরুষের মতো বহুগামী এবং বহু-পুরুষের দেহ-সংস্রবের ভেতর দিয়ে আত্মতৃপ্তি তারো কাম্য। নিজের মনকে অকপটে প্রকাশ করে দেখাতে যাঁরা ভয় পান না, এমন সমস্ত ভদ্র মহিলার স্বীকারোক্তি সংগ্রহ করলে দেখা যাবে, মৌলিক প্রবণতায় নারী-পুরুষে তফাৎ খুব কম। তফাৎ যেটা তা আনুষঙ্গিকের। সেই মৌলিক ঐক্য টুকুই এখানে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করছি।

বিংশ অধ্যায়

ব্যভিচার বনাম বিকৃতাচার

আগের অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে যৌন-রুচির বিচিত্রতা ও বহুমুখিতায় নারী-পুরুষের কোন মূলগত পার্থক্য নেই। শুধু সমাজ-ব্যবস্থা পুরুষের অনুকূলে এবং নারীর প্রতিকূলে থাকায়, পুরুষ তার বহুগামিতার অভ্যাস যথেচ্ছ চরিতার্থ করতে পারে, আর নারীকে বাধ্যতামূলক ভাবে তা হয় দমিত করে চলতে হয়, নয় সমাজ-শাসন ফাঁকি দিয়ে, গোপন ব্যভিচারে তার চরিতার্থতা করতে হয়। হাতে-কলমে ব্যভিচার করার সুযোগ, সাহস বা প্রবৃত্তি যাঁদের নেই, তাঁরাও যে কোন-না-কোন সময় কোন-না-কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অন্তরে বাসনা অনুভব করেন এবং সে-কামনা যে কিছুদিন বা দীর্ঘ দিন তাঁদের মনোলোকে আত্ম-গোপন করে থাকে, এ কথা সত্যনিষ্ঠ নারীরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। কুমারীদের বা অকাল বিধবাদের পক্ষে এটা হয়ত অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সধবাদের বক্তব্যও যখন একই হতে দেখি, তখন বুঝতে বিলম্ব হয় না যে বিচিত্র পথে যৌন-রুচি চরিতার্থতার প্রবৃত্তি নর-নারী উভয়েরই সমান। অনুকূল সুযোগ-সুবিধায় তা বিস্ফোরণের আকারে প্রকাশ পায়, নইলে অন্তরের অন্দর মহলে অবদমিত করে রাখতে রাখতে, অবশেষে তা হয় নিস্তেজ হয়ে যায়, নয় বিকৃতির মধ্যে দিয়ে বিপরীত মূর্তিতে ফুটে বের হয়।

পুরুষের ক্ষেত্রে এই অবদমনের প্রয়োজন নারীর চেয়ে স্বভাবতই কম। প্রথমত পুরুষের কর্মক্ষেত্র বাইরের জগতে নিবদ্ধ বলে, বাইরের চাঞ্চল্যই তাকে ষোল-আনা যৌন-কেন্দ্রিক হতে দেয় না। দ্বিতীয়ত পতিতা গমন এবং পর-নারী গমনের ব্যাপারেও তার পর্যাপ্ত স্বাধীনতা রয়েছে। কাজেই অবদমন জনিত বিকৃতি পুরুষের ওপর তত বেশী প্রভাব বিস্তার করে না। পক্ষান্তরে নারীর ক্ষেত্রে কোন-না-কোন রকম অবদমন ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া প্রায় অনতিক্রম্য বললে চলে। কলহ প্রবণতা, প্রহার পরায়ণতা, শুচিবায়, রোগ-বাতিক, সন্দেহ-বাতিক, পরনিন্দা-প্রীতি, সংসার-বিরাগ, আত্ম-হত্যা স্পৃহা, ভদ্র নারীর এই সুবিদিত ও সার্বভৌম অভ্যাস গুলির মূলানুসন্ধান করলে দেখা যাবে, যৌনাবদমনই পেছন থেকে এগুলোকে সঞ্জীবিত ও উৎসাহিত করে। বলা বাহুল্য, আমি একনিষ্ঠা নারীদের কথাই বলছি।

প্রচলিত অর্থে যাদের আমরা অসতী বলি, তাদের ভেতর এই সব, বা এই জাতীয় কোন স্থায়ী বিকার বড়-একটা দেখা যায় না। এ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে যৌন-বৃত্তির চরিতার্থতা বিষয়ে তারা অনেক খানি নিকুণ্ঠ হতে পারে বলেই, এদিককার কোন গুপ্ত বা সুপ্ত কামনা তাদের মনের রাজ্যে আবর্ত সৃষ্টি করতে পারে না।

কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থা অপরিবর্তিত এবং সতীত্বের আদর্শ সম্মানিত থাকতে, এই পথে স্বাভাবিকতা লাভ অধিকাংশ ভদ্র মহিলার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্তঃপুরের অবরোধে সতীত্বের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেও, হাজার-হাজার ভদ্র-মহিলা কি ভাবে নিজ-নিজ পারিবারিক জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা রকমারি কদাচার এবং কু-অভ্যাসের দৌরাত্ম্যে প্রতিনিয়ত নষ্ট করে যাচ্ছেন, তা অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি আশা করি লক্ষ্য করেছেন। প্রেম, প্রীতি, সহযোগিতা, আনুগত্য, সেবা, সব কিছু দিয়েও তাঁদের মন পাওয়া যায় না কেন, কেন হাতের মধ্যে পেয়েও তাঁদের অন্তরের সমস্ত অলি-গলি স্পষ্ট করে দেখা যায় না, এ প্রশ্ন অনেককে করতে শুনেছি। এর কারণ আর কিছু নয়, স্বতস্ফূর্ত ভাবে অন্তরে যে-সব অবৈধ বাসনা উদ্রিক্ত হয়, তাকে সংসার ও সমাজ-শাসনের দড়ি-দড়া দিয়ে অবদমিত করার এ হল অপরিহার্য পরিণাম।

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, যাঁরা বিবাহিতা, যাঁরা স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা, তাঁদের ত অতৃপ্তি-থাকার কোন হেতু নেই। এ অবস্থায় তাঁদের মধ্যে অনুচিত সংসর্গে লিপ্ত হবার ইচ্ছা কেন জন্মায়? আর সকলেরই যে এটা জন্মায়, তারও কোন প্রমাণ আছে কি? দুটো প্রশ্নেরই আমি আংশিক উত্তর আগে দিয়েছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরো কতকগুলো কথা বলার আছে, যা না বললে হয়ত এ সমস্যার সমাধান হবে না।

যৌনতৃপ্তি লাভের প্রকৃতি পুরুষ ও নারীর যে এক নয়, এ কথা সবাই জানেন। পুরুষের উত্তেজনা যত সহজে জাগ্রত হয়, তত সহজেই তার নিবৃত্তি আসে। পক্ষান্তরে নারীর উদ্দীপনা জাগতে যেমন দেরী হয়, তার নিবৃত্তি হতেও তেমনি সময় লাগে। পুরুষের মতো নারীর যৌন-চেতনা কেবল তার অঙ্গ-বিশেষে আবদ্ধ নয় এবং শুক্র ক্ষরণের মতো কোন প্রত্যক্ষ ঘটনার দ্বারা তার পরিসমাপ্তিও হয় না। এ অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষে পূর্ণ সমীকরণ হওয়া খুব কঠিন, যদি অবশ্য সহযোগী পুরুষ অভিজ্ঞ না হন। দুঃখের বিষয়, সে-রকম পুরুষের সংখ্যা কম। সাধারণত স্বামী নামধেয় ভদ্রলোকেরা মনে করেন,

বুঝি শুক্র-ক্ষেপণের দ্বারাই তাঁরা স্ত্রী সম্পর্কে যথা-কর্তব্য পালন করে থাকেন। বস্তুত তাঁরা বুঝতেও পারেন না যে অপর পক্ষের কামনা অধিকাংশ স্থলেই অনিবৃত্ত থেকে যায় এবং এই অতৃপ্তি তলায়-তলায় তাঁর দেহ ও মনের ওপর বিষম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

তাছাড়া কাম-ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রদর্শন এবং এ সম্পর্কে লজ্জা ও গোপনীয়তাবলম্বন ভদ্র নারীর কর্তব্য বলে সমাজে প্রচারিত থাকার ফলেও, আপন অতৃপ্তির কথা নারীরা কোনদিন পুরুষের কাছে প্রকাশ করেন না। বরং এ জন্যে তাঁদের নিজস্ব কোন গরজ নেই, এমন একটা ভাবই যেন তাঁরা আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ফলে পুরুষের বোঝারও সুবিধা হয় না, তাঁরা কি চান এবং কি চান না। কিন্তু এই চক্ষুলজ্জা-জনিত নিস্পৃহতার আড়ালে ক্ষুধাতুর নারীর দেহ ও মন দিনের পর দিন কি রকম বিবশ ও বিকল হয়ে পড়ে, সে খবর তত্ত্বজ্ঞদের অজ্ঞাত নয়। কাজেই স্বামী-সংসর্গে দিন-যাপনে অভ্যস্ত থাকলেই এবং সন্তান-সন্ততি জন্মালেই যে নারীর আব অতৃপ্তির কোন কারণ থাকে না, এ কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বরং বেশীর ভাগ নারী যে যৌন ব্যাপারে অতৃপ্ত থাকেন এবং তার ফলে যে রকমারি সহনীয় বা অসহনীয় বিকৃতি বা ব্যাধি তাঁদের স্বভাবে বাসা বাঁধে, এটাই হল প্রণিধানযোগ্য কথা।

বিবাহিতা ও সন্তানবতী বহু সুশিক্ষিতা নারী স্বীকার করেছেন যে স্বামী হতে তাঁদের যথোচিত তৃপ্তি হয় না। এই অতৃপ্তিকে তাঁরা হয় নিঃশব্দে বহন করেন, নয় কোন-না-কোন কৃত্রিম উপায়ে একে তৃপ্ত করেন। আত্মীয়-পরিজন, গুরু-জন, লঘু-জন, থিয়েটার-সিনেমার নায়ক, খেলোয়াড, চাকর, খানসামা, এমন কোন পর্যায়ের পুরুষ নেই, যে বা যাবা এই রকম ক্ষেত্রে নারীদের মানস-প্রতীক রূপে আবির্ভূত না হয়! অনেকে লজ্জার সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে প্রকৃতিস্থ মুহূর্তে এই সব পাত্র ও প্রতীকদের কথা চিন্তা করে তাঁরা বিশেষ কুণ্ঠাবোধ করেন। কিন্তু উদ্দীপ্ত মুহূর্তে চেষ্টা করেও এদের হাত থেকে তাঁরা অব্যাহতি পান না।

দেহের দিক থেকে এই সব নারী ষোল-আনা নিষ্কলুষ। কিন্তু এই নিষ্কলুষ সতী-জীবনের অন্তরালে যৌন-অসমন্বয়ের জন্যেই হক, অথবা অন্য যে জন্যেই হক, এঁদের চিত্তে তীব্র অসন্তোষ প্রচ্ছন্ন থাকে। তারি উদ্দীপনা তাঁদের অন্য পুরুষের চিন্তায়, তাদের সঙ্গে সাহচর্যের উত্তপ্ত কল্পনায় আবিষ্ট করে। অথচ

বাইরের কোন পুরুষ যদি সত্যি-সত্যিই কোন দিন তাঁদের দিকে হাত বাড়াতে চেষ্টা করে, কিংবা কোন অভব্য ইঙ্গিত করে, তাহলে তাঁরা ভয় পাবেন, প্রতিবাদ করবেন। এমন কি, তাকে লাঞ্ছিত করার জন্যও অগ্রণী হবেন। একই সঙ্গে মনে ও কাজে এই স্ব-বিরোধিতার মূল কোথায়, সেটা এরপরও আশা করি আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

পারিবারিক জীবনের গণ্ডীতে একান্ত ভাবে আবদ্ধ এবং বাইরের সংস্রব থেকে অনেকটা পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয় বলে, সাধারণত আত্মীয়-চক্রের কোন না-কোন লোকই এ-সব নারীর মনে আধিপত্য বিস্তার করে। আর যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র এটা হয়, প্রায়শ বাহ্য ব্যবহারে তার সম্পর্কে নারীদের মনোভাব বেশ একটু বিরূপ ও বৈরিতাপূর্ণ হয়, এটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। কেউ-কেউ বলেন, এ জন্যেই সচরাচর দেবর, ভাশুর, সপত্নী-পুত্র প্রভৃতি সম্পর্কে নাকি অধিকাংশ একনিষ্ঠা নারীকে বিদ্বিষ্ট হতে দেখা যায়। পুত্রবধূ সম্পর্কে (সেই সূত্রে পুত্র সম্পর্কেও) মাতার, অথবা ভ্রাতৃবধূ সম্পর্কে (সেই সুবাদে ভ্রাতা সম্পর্কেও) বোনের বৈরিতার মূলও অনেক ক্ষেত্রে এই, এ কথা বলেন মনো-বিজ্ঞানীরা। যদিও শেষোক্ত ক্ষেত্রে জিনিষটা থাকে নির্জ্ঞান মনে। কালে-ভদ্রে সজাগ মনে ভেসে ওঠে। যেখানে তা হয়, সেখানেই সুরু হয় স্ব-বিরোধী সঙ্ঘর্ষ, যার কথা একটু আগে বলেছি।

কোন-কোন বিশেষজ্ঞ বলেন, অব-চেতন মনের কামনা সাংসারিক সম্পর্কের প্রাচীরে প্রতিহত হয়েই নাকি শেষ পর্যন্ত আদি-প্রতীক গুলির প্রতি অকারণ বৈরিতায় রূপ নেয়। এ থেকে জনৈক বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করেছেন যে বহু পারিবারিক বিবাদ-বিরোধের মূলে আছে এই অব-চেতনা সঞ্জাত বৈরিতার একটা নিঃশব্দ ভূমিকা।

যে-সব নারীর বাইরে যাওয়া-আসার বা বাইরের পুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ আছে, তাঁদের বহুগামিতার বাসনা অপেক্ষাকৃত সহজে আত্মীয় চক্রের বাইরে ব্যাপ্ত হতে পারে। ইতিপূর্বে বলেছি, এঁদেরই মনোলোঁকে কোন-না-কোন পুরুষ সময়-সময় ছায়াপাত করে। আর এ কথাও বলেছি সেই সঙ্গে যে মনে-মনে এই বহুগামিতাকে ভদ্র নারীরা একটা অপরাধ রূপেই গণ্য করেন এবং কার্যত এর হাত এড়াতে পারেন না যেখানে, সেখানে ভেতরে-ভেতরে এ জন্যে বিশেষ পীড়িতই বোধ করেন। একজন বলেছিলেন, দেহকে তিনি প্রাণপণ শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত রাখলেও, মনকে মোটেই আয়ত্তে আনতে পারেন না।

সময়ে-অসময়ে সে তাঁর সমস্ত সঙ্কল্প ব্যর্থ করে দিয়ে, অনুচিত সংসর্গের কামনা লালন করতে আরম্ভ করে এবং তাঁকে তার নির্দেশ অনুগত ভৃত্যের মতো নতশিরে মেনে নিতে হয়। সুস্থ মুহূর্তে এ জন্যে তাঁর তীব্র আত্ম-ধিক্কার জাগে। আর একজন বলেছিলেন, সজাগ অবস্থায় যে-সব লোকের ছায়া মাড়াতেও তাঁর ঘৃণা বোধ হয়, বিশেষ অবস্থায় তারাই তাঁর মনের রাজ্যে অবাধে প্রবেশ করে এবং মনোবিলাসের অনুষ্ঠানে তাঁর ওপর যথেচ্ছ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, এ কথা ভাবলেও তাঁর গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছা করে।

লক্ষ্য করে দেখেছি, এই সব নারী অধিকাংশই সুশিক্ষিতা এবং অনেকেই বেশ আত্ম-সচেতন। সম্ভবত সেই জন্যেই সংস্থান ও সংস্কারের বিরোধ তাঁদের মধ্যে এত বেশী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। একটু কম বুদ্ধির বা বোকা ধরণের নারীরা দেখেছি, এত খানি অনুশোচনা বা আত্ম-ধিক্কারে নিপীড়িতা হন না। তাছাড়া প্রতীক নির্বাচনে যেখানে বড় রকম কোন নৈতিক অনুশাসন বা গুরুতর কোন সামাজিক সংস্কার লঙ্ঘন করতে হয় না, সেখানে প্রকৃত পক্ষে কোন ভাব বিরোধের কারণও নেই। বরং যারা প্রত্যক্ষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে আপন সুযশ নষ্ট করে, তাদের উদ্দেশে কটূক্তিই করেন। একজন বলেছিলেন, মনে-মনে তিনি যাকেই ভাবুন, সে ত তা জানতে পারে না। একা-একা তিনি যা ই করুন, তাতে কারু ক্ষতিও হয় না। এই জিনিষটা ভালো, না অনাচার করা ভালো?

কিন্তু দীর্ঘ দিন মনোরমণে নিরত থাকার একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া আছে, প্রত্যেক মনোরতা নারীর জীবনেই একদিন তা আত্ম-প্রকাশ করে। সচরাচর সেটা দেখা দেয় যৌনাবসানের পর। কারু কারু ক্ষেত্রে আগেও। তখনি তাঁদের কলহ প্রবণতা, শুচিবায়, ব্যাধি বাতিক, নানা বিকার দেখা দেয়। কেউ-কেউ একটু ছিটগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়স্কা এক মহিলার খবর জানি, যিনি কিশোরী বা সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত তরুণীদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হতে পারে, তাদের সঙ্গে এমন সমস্ত অনুচিত প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেন।

আর একটি চল্লিশের সীমান্তবর্তিনী মহিলা ছাদে উঠে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোন বালক বা যুবকের সামনে আপন দেহ অনাবৃত করে দেখাতেন, তারপর এক-দৌড়ে নীচে নেমে যেতেন। তাঁর এই বাতিক এমন সুবিদিত ছিল যে কোন-কোন মন্দ লোক আশ-পাশের বাড়ী থেকে তিনি ছাদে উঠলে, সুবিধা-জনক স্থানে এসে দাঁড়াত এবং অনুরূপ প্রত্যুত্তরে তাঁকে সম্বর্ধিত করত। এই

সব লোককে তিনি যা-তা বলে গালাগালি দিতেন। কিন্তু নিজের আচরণের বিসদৃশতা তাঁর চোখে ধরা পড়ত না। সমৃদ্ধ ও সুবিদিত পরিবারের গৃহিণী এবং অনেক গুলি পুত্র-কন্যার জননী আর এক মহিলার বিবরণ পেয়েছি। একটি বেতনভুক দাসী প্রতিদিন দুপুরে ঘরে দুয়োর দিয়ে তাঁকে গল্প শোনাত। নানা অনুচিত বা সমাজ বিরুদ্ধ গল্প সবিস্তারে তাঁকে শোনাতে হত। দাসীটিকে এজন্যে ভৎর্সনা করা হলে, সে বলেছিল, ঠাকরুণ শুনতে চাইলে আমি কি করব?

আগেই বলেছি যে পুরুষের জীবনে অবদমন বা অতৃপ্তির অবকাশ নারীর চেয়ে কম। তাছাড়া পুরুষের জীবন প্রধানত বহির্মুখী, তাই এই ধরণের বিকৃতি সচরাচর পুরুষে দেখা যায় না। তবে ভাবপ্রবণ পুরুষের অভাব নেই। বিকৃতাসক্তি পরায়ণ পুরুষও তাই দুর্লভ নয়। বহু যুবক এবং মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির জবান বন্দীতে দেখেছি, একটা-না-একট জায়গায় স্বাভাবিক কামনা প্রতিহত হওয়ায়, তাঁদের স্বভাবে এক-রকম না এক-রকম বিকৃতি বাসা বেঁধেছে। হয়ত স্ত্রীর সঙ্গে তাঁরা অনেকে অব্যাহত ধারায় জীবন যাপন করে যাচ্ছেন। কিন্তু তারি আড়ালে রকমারি দুষ্ট কামনা তাঁরা অন্তরে লালন করে চলেছেন, যার চরিতার্থতার জন্যে অন্যায়-অনাচারও করেছেন বা করে থাকেন সময়-সময়।

এক শিক্ষিত ও রুচি সম্পন্ন যুবক সুন্দরী ও সদগুণ সম্পন্না স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বারো-তেরো বছর বয়স্ক কুৎসিত কদাকার পথের মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘুরতেন। খাদ্যদ্রব্য, পয়সা ইত্যাদির দ্বারা প্রলুব্ধ করে, তাদের তিনি কোন সুবিধা জনক স্থানে নিয়ে যেতেন। সাধারণত এই মেয়েদের হাতে দুটো-একটা টাকা গুঁজে দিয়ে চম্পট দিতেন তিনি। একদা ধরা পড়ে তিনি সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন। ঘটনা তাঁর স্ত্রীর কান পর্যন্ত পৌছলে, ধিক্কারে তিনি আত্ম-হত্যা করেন। তবু এ অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি তিনি। জেরার মুখে তিনি স্বীকার করেন যে একদা হাঁড়িয়া পানে অচৈতন্য এক সাঁওতাল বালিকাকে তিনি কোন স্থানে পড়ে থাকতে দেখেন এবং তার পর থেকেই তিনি সেই বালিকাকে অনুরূপ বয়সের কদাকার মেয়েদের মধ্যে দিয়ে খুঁজে চলেছেন। আর একটি বিবাহিত এবং দায়িত্বশীল কর্মে নিয়োজিত ভদ্রলোক কোন স্কুল-বাড়ীর অভ্যন্তরে এক ভিখারী বালককে নিয়ে যাওয়ার ফলে ধৃত হন। প্রহারাদির পরে তিনি স্বীকার করেন যে বাল্যকালে এক সহপাঠী তাঁকে প্রথম এই পাপে দীক্ষিত করে এবং দীর্ঘকাল পরেও, অর্থাৎ বিবাহিত এবং পুত্র-কন্যার

পিতৃত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, এ অভ্যাস তাঁর থেকে গেছে। হয়ত এ দিককার অবদমন জনিত অতৃপ্তি তাঁর স্বভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

স্বজন-গমনের প্রবৃত্তি এবং তাকে অবদমিত করার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াও পুরুষের মধ্যে প্রকট হতে দেখা যায় এক-এক সময়। তবে পুরুষের মনন শক্তির বলিষ্ঠতা ও সমাজ-কর্তৃত্বের দম্ভ স্বভাবতই সজাগ বলে, চিত্তবৃত্তি তার অপেক্ষাকৃত সহজেই অনুচিত পাত্র থেকে স্খলিত হয়ে বাইরের নারীতে ব্যাপ্ত হতে পারে, কুল-নারীর মতো অন্তশ্চেতনায় তা আবর্ত রচনা করে পাক খায় না। তবে ক্ষেত্রবিশেষে সে রকমও হতে দেখা যায়।

পরিণত বয়সে মাতাকে নূতন করে একটি সন্তান প্রসব করতে দেখে, এক ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীর ছাত্র অকস্মাৎ বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। দীর্ঘ দিন পাগলের মতো পথে-পথে ঘোরার পর যখন সে পরীক্ষকের হাতে আসে, তখন তার বাহ্যজ্ঞান প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সতর্ক চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় তার সম্বিৎ পুনরুদ্ধার করা যখন সম্ভব হল, তখন জানা গেল, সন্তান জন্মের সূত্র ধরে পিতার প্রতি অসূয়া ও মাতার প্রতি অশ্রদ্ধা একযোগে বুদ্ধি-বিকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েই তাকে অপ্রকৃতিস্থতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আর একজন পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত ভদ্রলোক তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনীকে অতিশয় ভালোবাসতেন। বিশেষ কষ্ট করে তিনি তাকে লেখা-পড়া ও গান-বাজনা শিখিয়েছিলেন। সে অবিবাহিতা থেকে সারা জীবন শিক্ষা-দান ও শিল্প-চর্চায় নিরত থাকবে, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভগিনীর এক অধ্যাপকের সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল।

এর পর থেকেই আস্তে আস্তে ভদ্রলোক কেমন যেন হয়ে গেলেন। কথা-বার্তা কম বলতেন, নারী-জাতির ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতা ও অবিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তীব্র মতামত প্রকাশ করতেন। তারপর ঘটনা-চক্রে ভগিনী স্বামী কর্তৃক বিতাড়িতা হল এবং বলাই বাহুল্য, নিরুপায় হয়ে পিত্রালয়ে ফিরে এল। দাদা তাঁর ইতিমধ্যে ঘোর উন্মাদ হয়ে গেছেন। হিতাহিত জ্ঞান ও স্থান-কাল-পাত্র বোধ হারিয়ে তিনি যখন-তখন চীৎকার ও অশিষ্ট অঙ্গ-ভঙ্গী করেন। এক বৎসর হাঁসপাতালে থাকার পর তিনি বাড়ী এসেছিলেন। কিন্তু আগের স্বাভাবিকতায় আর ফেরেন নি।

কিন্তু এতখানি চরমাবস্থায় উপনীত হতে পুরুষ মানুষকে বড়-একটা দেখা যায় না। তবে সতর্ক অনুসন্ধানে এমন ঘটনাও পেয়েছি, যেখানে দাদার

মৃত্যুতে ছোট ভাই সুগভীর বেদনার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন একটা তৃপ্তি লাভ করেছে, দিদিকে একা ট্রেনে করে শ্বশুরবাড়ী পৌছে দিতে যাবার, বা তরুণী ভাই-ঝিকে সঙ্গে নিয়ে চক্ষু-চিকিৎসকের ভার্ক-চেম্বারে বসে থাকার কল্পনায় পুলক অনুভব করেছে, কিংবা মাতার প্রতি অনুষ্ঠিত পিতার কোন অসঙ্গত আচরণের প্রতিবাদে যুবক পুত্র পিতাকে কড়া করে দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছে এবং মাতাকে 'আমি থাকতে তোমার ভয় কি' বলে আশ্বাস দিয়ে আত্ম-তৃপ্তি অনুভব করেছে, এমন ঘটনা বোধকরি সকলেই প্রত্যক্ষ করেছেন। এগুলো সবই যে স্বজন-কেন্দ্রিক কামনার উর্ধ্বায়িত অভিব্যক্তি, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এর বীজ প্রধানত মানুষের নির্জ্ঞান মনে নিহিত।

একটা বিশেষ বয়সে নারীর মতো পুরুষের কোন সুস্পষ্ট দৈহিক নিঃস্বতা না এলেও, একটা বয়সে পৌছলে পুরুষেরও যৌন-শিথিলতা আসে। তখন মনোবৃত্তি বল্গা-বিচ্যুত হয়ে পড়ে বলে, পুরুষের মধ্যেও অনেক সময় অনাচার ও কদাচারের আসক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। সময়-সময় ন্যাক্কারজনক বিকৃতির পথেও অনেক বৃদ্ধকে পা বাড়াতে দেখা যায়। এক বৃদ্ধ জমিদার অল্পবয়স্ক বালক এবং বালিকাদের সুলভে আহরণ করার উপায় হিসাবে বহু ব্যয়ে একটা অনাথাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। আর এক প্রবীণ উকিল তাঁর যুবক খানসামাকে সঙ্গে নিয়ে পতিতালয়ে যেতেন এবং নিজ সমক্ষে তাকে উক্ত রমণীর সঙ্গে কদাচারে প্রবৃত্ত করে সে-দৃশ্য বসে দেখতেন। দাদামশায়ী রসিকতার দোহাইয়ে কিশোরী ও যুবতীদের প্রতি লুব্ধতা প্রকাশে অভ্যস্ত বৃদ্ধ আশা করি সবাই দেখেছেন। এই রকম এক দাদামশায় এক দরিদ্রের দ্বাদশী কন্যাকে কাছে পাওয়ার আকুলতায় তার পিতাকে কয়েক হাজার টাকা আয়ের কারবার দান করেছিলেন।

পুরুষের মতো নারীকে বার্ধক্যে এই রকম দশান্তরে উপনীত হতে কদাচিৎ দেখা যায়, অবশ্য কামবায় গ্রস্তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বয়ঃসন্ধির ঠিক আগে ও পরে, অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বা অবস্থা বিশেষে পঞ্চাশের ভেতর, এই রাজ্যে নারীর যে-রকম সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, কোন বয়সেই পুরুষে তার দশ ভাগের এক ভাগও পাওয়া যায় না। এর কারণও সুস্পষ্ট। ভদ্র নারীর জীবনে যেটা অবদমন, সেটা পুরোপুরি অবদমনই। তার ব্যতিক্রম তাঁর কাছে এত বড় ভয়ের বস্তু যে তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে তাঁকে সারা জীবন সংগ্রাম করতে হয়। তাই যৌনাবসানের মুখোমুখি পৌছে তাঁর যখন মনে

হয়, আর সময় নেই, তখন সহসা তাঁর চিন্তায় ও আচরণে এমন সব ভাবান্তর উপস্থিত হয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে রীতিমতো বিসদৃশ। কিন্তু পঞ্চাশের পর থেকে ষাটের মধ্যে এ ভাবটা তাঁর কেটে যায় এবং তাঁর আচার-ব্যবহার ও চিন্তা চেষ্টায় আবার প্রকৃতিস্থতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও শালীনতা ফিরে আসে। তখন অনেকেরই হয় প্রবল ধর্মানুরাগ।

পুরুষের দিক থেকে সমস্যাটা একটু অন্য রকম। অবশ্য সামর্থ্য যখন অপচিত হয়, তখন আর সুযোগ না হবার বেদনাদায়ক চিন্তা অনেক পুরুষকেও বেশ উদভ্রান্ত করে তোলে। সংযম ও বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে কেউ-কেউ তখন রকমারি কদাচারে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন। এছাড়া আকস্মিক শিরঃপীড়া, প্রস্টেট গ্রন্থির অতি-স্ফীতি, উন্মাদ রোগ ইত্যাদির জন্যেও বিলম্বিত ও বিকৃত কামবায় পুরুষকে আক্রমণ করতে পারে। একান্ত ভাবে আদর্শবাদী এবং আজীবন মনোবমণে অভ্যস্ত পুরুষের জীবনেও অনেক সময় বার্ধক্যে যৌন-বৈলক্ষণ্য দেখা দিতে পারে। কিন্তু সচরাচর এ-সব কম হয়। প্রসন্ন বার্ধক্যই বেশীর ভাগ পুরুষের জীবনে দেখা দেয়।

তখনো তাঁর আচার-আচরণে কামের প্রচ্ছন্ন পদ-সঞ্চার লক্ষ্য করা যায় হয়ত। কিন্তু সেই সঙ্গেই তাতে ফুটে ওঠে একটা সংহত শ্রী, একটা মমতাময় শালীনতা, যা নিন্দার পরিবর্তে প্রশংসারই বস্তু। এক প্রবীণ অধ্যাপক তাঁর একটি কন্যাকে এত বেশী ভালোবাসতেন যে তাঁকে কাছে-কাছে রাখার জন্যে জামাতাকে বাড়ীর পাশে একটা বাড়ী করিয়ে দিয়েছিলেন। এই কন্যাটি কাছে এসে না বসলে, তাঁর খেয়ে সুখ হত না, শুয়ে ঘুম হত না। কন্যাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে, বিশেষ সম্মানের সুযোগ উপেক্ষা করেও একবার তিনি বিদেশ যাওয়া বাতিল করেছিলেন। কন্যাটি একদা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি এমন বিমর্ষ হয়েছিলেন যে বেশ কয়েকদিন দাড়ি কামান নি, ভালো করে খান নি। আরো অনেকগুলি শিক্ষিত এবং সদগুণসম্পন্ন পুত্র-কন্যা থাকা সত্ত্বেও, একটি কন্যার ওপর তাঁর এই অত্যধিক আকর্ষণ লক্ষ্য করার মতো ছিল।

আর এক যশস্বী প্রবীণ সাহিত্যিক প্রতিবেশী এক যুবকের সুন্দরী পত্নীকে দূর থেকে দেখেই আনন্দ লাভ করতেন। প্রতিদিন তরুণীটি দোতলার বারান্দায় চুল শুকাতেন, সেলাই-ফোঁড়াই ও বোনাবুনি করতেন, ভদ্রলোক বৈঠকখানা থেকে তাই দেখতেন এবং দেখে আনন্দ পেতেন। হঠাৎ মেয়েটি অদর্শন হতে, তিনি এমনি বিচলিত হলেন যে লজ্জা খুইয়ে একদিন ঐ বাড়ীর

ভৃত্যকে বধূটির সংবাদ জিজ্ঞাসা করে ফেললেন। যখন শুনলেন তিনি পিতৃগৃহে গেছেন, তখন নিতান্ত মুষড়ে পড়লেন। একটা উপন্যাস ধরেছিলেন, তা আর শেষ করা হল না। এ-সবও মনোরমণ সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষ কামনা তার রক্ত-মাংসের স্থূলতা অতিক্রম করে এমনি একটা দিব্যভাবে উন্নীত হয়েছে যে একে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। অতি সাধারণ নর-নারীর জীবনেও উর্ধ্বায়নের এই প্রসন্ন রূপ দেখেছি।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য আপাতত এখানেই শেষ হল। শুধু আর একটা কথা বলার আছে। বাস্তব সংসারে যখনি ব্যভিচার হয়, তখনি বুঝতে হবে কোন-না-কোন গুরুতর বাস্তব কারণে সেটা সম্ভব করেছে। পূর্ণবয়স্ক দুটি নর-নারীর মধ্যে অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ থাকলে এবং সেই মেলা-মেশার পথে সংযম ও আত্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনিবার্য না হলে, কোন এক পক্ষের দুষ্ট লালসা বা অনুচিত চেষ্টা অন্য পক্ষকে আকর্ষণ করে। অথবা কোন এক পক্ষ দীর্ঘ উপবাস বা অতৃপ্তির মধ্যে দিনাতিপাত করতে থাকলে, তার তাড়নায় সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েও অপর পক্ষের মতিভ্রম ঘটায়। এ অবস্থায় কুমারী, বিধবা, বিবাহিতা, সকল শ্রেণীর নারীই এবং অবিবাহিত, বিবাহিত, বিপত্নীক, সকল শ্রেণীর পুরুষই হঠাৎ পদস্খলিত হতে পারে। আবার মেলা-মেশার বা চলা-ফেরার গতি নিজের সংযম এবং অন্যের সতর্কতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে, পদস্খলন না-ও হতে পারে। কাজেই প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যভিচার ঘটা না-ঘটা অনেকটাই নির্ভর করে, সুযোগ পাওয়া না-পাওয়ার এবং আত্ম-সংযম থাকা না-থাকার ওপর।

তবে ইদানীন্তন সমাজ-জীবনে নর নারীর বিলম্বিত কৌমার্য, নারীর অকাল-বৈধব্য, পুরুষের বাধ্যতা মূলক প্রবাসবাস ইত্যাদি সুবিদিত কারণ, সেই সঙ্গে সামাজিক রীতি পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রচলন ইত্যাদি কারণ যে-রকম দিনের পর দিন প্রবল হয়ে চলেছে, তাতে সুযোগও যেমন বেড়েছে, সংযমও তেমনি আপনা থেকে শিথিল হয়ে আসছে। কাজেই সতর্ক না হলে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা এখন যে আগের চেয়ে বেড়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সুযোগ না জুটলেও এবং উপবাস ও অতৃপ্তির সুস্পষ্ট কোন কারণ না থাকলেও, নর-নারী যে অন্তরের নিভৃতে সময়-সময় ব্যভিচার-স্পৃহা অনুভব করেন এবং তার নিঃশব্দ তাড়না যে তাঁদের সামাজিক

ও মানসিক জীবনে যথেষ্ট ওলট-পালটও ঘটাতে পারে, এটা মনে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে বাইরের সংসারে নৈতিক সংস্কার ও সামাজিক বিধি-নিষেধ যত কঠোর হক, মনোরাজ্য কারু গোচরীভূত নয় বলে, এ মুল্লুকে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে বিরুদ্ধ-সম্পর্ক ও নিষিদ্ধ-সম্পর্কের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হতে পারে।

এই মনোরমণের কামনা পুরুষের ক্ষেত্রে সাধারণত পর-নারীতে এবং নারীর ক্ষেত্রে সাধারণত আত্মীয় গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তিতে আরোপিত হয়। এর কারণ, নারীর জগৎ পনেরো-আনা অন্তঃপুরে নিবদ্ধ বলে, তার মনন শক্তি বড় একটা বাইরে প্রসারিত হতে পারে না, আর পুরুষের জগৎ বেশীর ভাগ বাইরে ব্যাপ্ত বলে, অন্তঃপুরের কোন প্রতীক সচরাচর তার মনে স্থিরবদ্ধ হয় না। তবে ব্যতিক্রম দু-ক্ষেত্রেই হয় এবং ব্যতিক্রম বলেই তা উল্লেখযোগ্য নয়।

মোটের ওপব মনের রাজ্যে নারী ও পুরুষ যে কে কাকে চায়, কে যে কাকে দেহ-মনের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করে, তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এর পরিসর অত্যন্ত বড। এত বড যে প্রায় সার্বভৌম বললে চলে এবং এর ভেতর এমন কোন সম্পর্ক নেই, যার কোন-না-কোন সময় স্থান না হয়। সাধারণ ভাবে নর-নারী একে দমন করেই চলেন। সামাজিক স্থিতি ও শালীনতার দিক থেকে তা চলা বাঞ্ছনীয়ও। কিন্তু মনের পদা সরিয়ে ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, ব্যাপারটা অনায়াসে পাশ কাটানোর মতো নয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে নর এবং নারী উভয়ের মনোবৃত্তিই স্বভাব-ধর্মে বহু-নিষ্ঠতার অনুগামী। ওখানে কোন মৌলিক বিভেদ নেই।